ব্রহ্মগীতা।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

"যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥"
[ভাগবত]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মকর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা;
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া-প্রেসে"
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রেমোপহার।

পরম প্রীতিভাজন—

ব্রহ্মবাদী এবং ব্রহ্মবাদিনীগণ!

বর্ত্তমান যুগে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞানের সহিত ভগবদ্ভক্তির যে সমন্বয়স্রোত ব্যক্ত কিম্বা প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় মানবসমাজ-দেহের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিতেছে, "ব্রহ্মগীতা" তাহারই একটী ক্ষুদ্র প্রবাহ। নিগম-আধারের যদিও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু যাহা সত্য তাহা সমবেত শক্তিপ্রসূত সাধারণ সম্পত্তি; প্রত্যেক সত্যানুরাগী সরল হৃদয় তাহার প্রমাণ স্থল। সুতরাং সে বিষয়ে "তোমার" কি "আমার" বলিবার কাহারো অধিকার নাই। এই গ্রন্থে বিবৃত মতামত, বিশ্বাস ভাব চিন্তা, বিচার যুক্তি সিদ্ধান্ত, সাধ্য সাধন এবং সিদ্ধি সংক্রান্ত যে কিছু সত্য আছে তাহাই কেবল ভগবদোক্তি; প্রকাশ-প্রক্রিয়ার ভিতর পাত্রের দোষে জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে মানবসুলভ ভ্রান্তি অজ্ঞানতার সহিত তাহা মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা; কারণ, অনির্ব্বচনীয় পরম তত্ত্বের ভাষা এবং অক্ষর কখন অভ্রান্ত হইতে পারে না। বিবিধ বিষয়ে শত শত ব্রহ্মমুখবাণী ইহাতে লিপিবদ্ধ রহিল, প্রকৃতিস্থ বিমলাত্মাদিগের সত্যজ্ঞান-নিকষোপলে তাহার বাস্তবিকতা সপ্রমাণীত হইবে। সত্যতত্ত্ব যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই আবার স্বয়ং জীবের ভিতর সত্যজ্ঞানরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্ হরিভক্ত সাধকগণের হৃদয়তন্ত্রীতে এই "ব্রহ্মগীতা" যদি প্রতিধ্বনিত হইবার আশা বিশ্বাস আমার না থাকিত, তাহা হইলে ইহা জনসমাজে প্রচার করিতে আমি সাহসী হইতাম না। অতএব হে পরম পিতার প্রিয় অনুগত সন্তানবৃন্দ, বিধাতার নিগূঢ় নিয়মে দেশকালাতীত যে নিত্যতত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

পূর্ব্বাচার্য্যগণের এবং আমাদের পরস্পর সাহায্যবিনিময়ে উৎসারিত হইয়া এই "উপহার" রচনা করিয়াছে, তাহাকে তোমরা পরলোকগমনোন্মুখ বৃদ্ধ চিরঞ্জীবের যৎকিঞ্চিৎ ঋণশোধ স্বরূপে গ্রহণ কর। তোমাদের ধন তোমাদিগকে দিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

বড় ইচ্ছা ছিল, "কর্ম্মযোগ" "জ্ঞানযোগ" এবং "ভক্তিযোগ" তিন খণ্ড এক সঙ্গে বাঁধাইয়া সহৃদয় বন্ধুগণের হস্তে অর্পণ করিব। কিন্তু "জ্ঞানযোগ" শেষ করিতেই গ্রন্থ এত বড় হইয়া গিয়াছে যে ব্যয়বাহুল্যভয়ে অবশিষ্টাংশ আপাততঃ প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইহা পাঠে পাঠকগণের যদি অনুরাগ হয়, "ভক্তিযোগ" শীঘ্রই মুদ্রিত করিবার বাসনা রহিল।

চিরানুগত—

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা

জয় শ্রীসচ্চিদানন্দ !

ব্রহ্মগীতা

প্রথম খণ্ড।

সূচনা।

একদা কলিযুগের অবসানে নববিধান কল্পারম্ভে প্রাচীন আর্য্যভূমি ভারতক্ষেত্রে চিরপ্রবাহিনী লীলাবতী নদীতটস্থিত বিজন ভবারণ্যে তপস্যা কুটীরে পরম তপস্বী ব্রহ্মবিদ্ শ্রীমৎ সদানন্দ গোস্বামী নিত্যধামের সৌন্দর্য্য-রস পানে বিভোর হইয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ নাম জপ করিতেছেন, ইত্যবসরে তদীয় একমাত্র তনয় শ্রীমান চিদানন্দ প্রণামপূর্ব্বক তথায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্ষণকাল পরে স্বামীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ! ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত সংসারক্ষেত্রে আমাকে একাকী রাখিয়া আপনি বনবাসে চলিয়া আসিলেন, আমি এই বিষম শত্রুপুরী-মধ্যে কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি? আমাকেও সংসারভার বহনে অব্যাহতি দিয়া আপনার আশ্রমপাদে একটু স্থান দান করুন। কারণ, এই দুর্জ্জয় সমরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার আমার কিছুমাত্র বল সম্বল নাই। প্রতি পদেই আমি আমাকে নিতান্ত দুর্ব্বল অসহায় দেখিয়া ভীত হইতেছি। অরাতিকুলের ভীষণ আক্রমণে আমার হৃদয় মন জর্জ্জরিত, দেহ প্রাণ ক্ষত বিক্ষত; আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া পুত্র অস্ফুট স্বরে রোদন করিতে লাগিল।

স্বামী মধুর গম্ভীর বচনে বলিলেন, "বৎস, স্থির হও, শান্তি অবলম্বন কর। এই যে সংসার, ইহা চিরদিনই সমর ক্ষেত্র; এখানে সংগ্রাম করিবার জন্যই জীবের আগমন। বিশ্বোন্নতি এবং তাহার পরিরক্ষণের মূলে অমিত শক্তি

সংগ্রামবীজ নিহিত রহিয়াছে, ইহাই সৃষ্টির প্রথম এবং প্রধান নিয়ম, কেহই ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। এই জন্য চির সৈনিকের ব্রত লইয়া তুমি আমি সকলেই নরদেহ ধারণ করিয়াছি। যে পর্য্যন্ত ভৌতিক প্রকৃতির উপর জয় স্থাপনপূর্ব্বক দ্বিজত্ব প্রাপ্তি না হইতেছে ততদিন যুদ্ধবেশে নিরন্তর প্রতি জনকে সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বর্গের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত রিপুকুল প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। নিদ্রা আলস্য বিশ্রামের জন্য জীবন নহে, কর্ত্তব্যসাধনরূপ সংগ্রামের নিমিত্ত মনুষ্যের জীবন ধারণ। দেহের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু তাহাতে অর্পণ করিয়া, পরিশেষে উপযুক্ত পুত্র তুমি, তোমাকে সংসারের ভার দিয়া আমি বনবাসী হইয়াছি। কিন্তু আমিও আমার জীবন-সংগ্রাম হইতে এখনও নিষ্কৃতি পাই নাই। অতএব হে তাত! বিধিনিয়োজিত এই নিয়তির পথ ছাড়িয়া আর তুমি কোথায় যাইবে বল, আরত অন্য পন্থা নাই? জীবনের মহাব্রত পালন করিতে করিতে আমার দেহে এখন জরা বার্দ্ধক্য উপনীত হইয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে এবং শত্রুর বাণে আমারও আত্মা ক্ষতবিক্ষত জর্জ্জরিত। যদি চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখাইবার হইত, দেখাইয়া দিতাম। কেন তবে তুমি এজন্য এত ভীত হইতেছ? সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কাপুরুষের কার্য্য। অমূল্য জীবনরাজ্য অধিকার করিবার জন্য এই ধর্ম্মযুদ্ধ; জ্ঞাতি কিম্বা শত্রুবধের জন্য নহে; নরশোণিতে ধরাকে সিক্ত করিয়া নিষ্কণ্টকে পার্থিব রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ অথবা দৈহিক শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক লোকপ্রশংসা কিম্বা স্বর্গাপবর্গাদি লাভের জন্যও নহে। মানবের পশুত্ব এবং আসুরী প্রকৃতি বিনাশানন্তর দেবত্ব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বয়ং প্রজাপতি বিধাতা এ যুদ্ধে সেনাপতির পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনিই তোমাকে আমাকে এবং যাবতীয় নরনারীকে এই অমর সমরে আহ্বান করিতেছেন। অতঃপর হে প্রাণাধিক পুত্র, তুমি পুরুষকার সহকারে এই ধর্ম্মযুদ্ধে নিয়ত প্রবৃত্ত থাক। সুখাভিলাষী অলস নিষ্কর্ম্মা হইয়া নিরাপদে জীবন ধারণে কিছুই শ্রেয়ঃ দেখি না; বরং ঈদৃশ সংগ্রামে মরণও মঙ্গল। বীরের ন্যায় সকল সহ্য কর; সহিষ্ণুতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতেই পরিণামে চির শান্তি, পরম নির্ব্বৃতি এবং নিত্য স্বর্গ লাভ হইবে।”

পুত্র বলিলেন, “সে কথা সত্য, কিন্তু আমি যে পারিতেছি না। এই ভয়ানক সংগ্রামস্থলে একদিকে দেহদুর্গস্থিত বীরপ্রধান ষড়রিপু এবং তাহাদের

সেনাপতি মন; অন্তরে বিষয়বুদ্ধি বাসনা পিপাসা, বাহিরে রূপরসগন্ধাদির আধার রাশি রাশি প্রলোভন; সর্ব্বোপরি রোগ শোক মোহ বেদনা নৈরাশ্য এবং বিপদ পরীক্ষা। কেবল তাহাই নহে; পরিবার স্বজনবর্গ, এমন কি, সমস্ত পৃথিবীই যেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয়। এতাধিক শত্রুর সহিত দুর্ব্বল একাকী সহায়হীন আমি, কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারি? যদি তেমন ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা আশা থাকিত, তাহা হইলে পুরুষকার বলে বীর পরাক্রমে এই দুর্জ্জয় প্রতিবন্ধক সকল পদদলিত করিতাম, এবং চির উৎসাহ অনুরাগের সহিত সংসার-সমর-প্রাঙ্গনে আনন্দে বিচরণ করিতে সক্ষম হইতাম। তাহাত হইল না; বার বার পতন, বার বার অনুতাপ এবং উত্থান, ইহাতে বড়ই লজ্জা এবং আত্ম-গ্লানি বোধ হয়। পৃথিবীর কলুষ কর্দ্দমে কত বারই না অবলুন্ঠিত এবং লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত হইতেছি! হায় কেবলই সংগ্রাম, এক দিনের জন্যও বিশ্রাম আরাম নাই! পরিণামে তবে আমার গতি কি হইবে!"

"আর এক কথা এই, ইহাদের বিরুদ্ধে চিরদিন সংগ্রাম করিয়াই আমার ফল কি? সমস্তই ত অবিদ্যার খেলা দেখিতেছি। যাহা অসার [illegible], তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া কেন আমি শান্তিহীন হইয়া থাকিব? আমি অসঙ্গ অপার্থিব অমরাত্মা, আমার সঙ্গে এ সকলের কোন নিত্য সম্বন্ধ কিছু দেখি না। তবে কেন এই মায়ার সংসারে আপনি আমাকে নিযুক্ত থাকিতে বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে আমি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ সাধন-পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ভাবে, শান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে পরমাত্মাতে স্থিতি করিতে পারি তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ দান করুন। যাহার আদি অন্ত মিথ্যা প্রপঞ্চ, পরিণাম ফল কেবল আসক্তি আর কর্ম্মবন্ধন, যাহাদের দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণে এবং চিন্তা কল্পনায় আত্মচৈতন্য বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তব্য বোধে নিষ্কাম অন্তরে প্রবৃত্ত হইলেও যাহারা আমার আত্মাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, তাহাদের জন্য কেন আমি এত সংগ্রাম করিব? স্বার্থ প্রলোভন মোহ আসক্তি জয়াশা এবং পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য লোকে সচরাচর সংগ্রাম করে, এবং তদ্দ্বারা তাহারা সবংশে পরিশেষে রক্তমাংসলোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ও রূপরসাদিতে বিমুগ্ধ প্রবৃত্তি নিচয়ের ক্রীতদাস হয়; আমার তাহাতে স্পৃহাও নাই, প্রয়োজনও নাই।"

ব্রহ্মর্ষি সদানন্দ স্বামী পুত্রের তাদৃশ নির্ব্বেদযুক্ত সারবান্ বাক্যপরম্পরা

শ্রবণানন্তর কিয়ৎক্ষণ নীরবে তূষ্ণীম্ভাবে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তদনন্তর স্নেহ সম্বোধন পুরঃসর মৃদু মধুর ভাষে বলিতে লাগিলেন, "বৎস, তোমার সার-গর্ভ বিবেকযুক্ত বৈরাগ্য বচনে আমার চিত্তবৃত্তি অতিমাত্র পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। যাহা কিছু তুমি বলিলে, সকলই সত্য কথা। পুরাতন যুগপ্রলয়ের অব্যবহিত পরে, নবযুগধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে পরম পুরুষ ভূভারহারী শ্রীমান ভগবানচন্দ্র মহামতি শ্রীজীবকে পরম ধর্ম্মের যে চরম সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন, ব্রহ্মগীতোক্ত সেই নবযোগ বৃত্তান্ত এক্ষণে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এবং মানবনিয়তির অপরিহার্য্য সাধারণ ধর্ম্ম যে সংসারসংগ্রাম তাহাতে নিঃসংশয় চিত্ত হও।"

কর্ম্মযোগ—প্রথম অধ্যায়।

শ্রীজীবের নির্ব্বেদ।

অনন্তর চিদানন্দ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কোথায় কোন্ সময়, কি উপলক্ষে ভগবান শ্রীহরি "ব্রহ্মগীতা" কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে সবিস্তারে বলিতে আজ্ঞা হউক। আমি অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন পুরাণ ও গীতা শাস্ত্র আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এই নবীন গীতা শাস্ত্র কখন শুনি নাই। অতএব তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনাইয়া আমার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করুন।"

পিতা সদানন্দ বলিলেন, "তোমার ন্যায় মার্জ্জিত বুদ্ধি সুশিক্ষিত মুমুক্ষু যুবকবৃন্দের জন্যই লীলাময় হরি এই নবগীতা প্রচার করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ অধ্যয়ন অধ্যাপনে সর্ব্ববিধ অজ্ঞানতা সংশয় নিরাকৃত হইবে। কোথায় কিরূপে কোন্ অবস্থা উপলক্ষে ইহার অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"কলির শেষ শতাব্দীতে ভারতের প্রাচীন আর্য্যবংশ যৎকালে বৈদেশিক রাজশাসন এবং সামাজিক নীতির সংস্পর্শে এককালে অবস্থান্তর এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইল, তখন পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস, কর্ম্মকাণ্ড ব্রতবিধি, শমদমাদি

সাধন, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ ক্রমে ক্রমে সমস্তই প্রায় উঠিয়া গেল। আহার নিদ্রা সন্তান-পালন ইত্যাদি নৈসর্গিক কর্ম্ম ব্যতীত নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় পরমপুরুষার্থ লাভের জন্য কোন কার্য্যই আর করিতে চাহিত না। আধুনিক ধনাঢ্য, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত গতানুগতিকেরা যাহা কিছু করিত তাহা ভক্তিনিষ্ঠাবিহীন রাজসিক এবং তামসিক ক্রিয়া। সমাজপতি সুবিজ্ঞ জ্ঞানী সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ভূরি ভোজন এবং ভূরি দক্ষিণা প্রদান করিতেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ফলবাদী সকামকর্ম্মী ছিলেন। যদিও তাঁহারা এ সকল কার্য্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করিতেন, কিন্তু লোকরঞ্জন, সামাজিক স্বার্থরক্ষার্থ প্রচলিত দেশাচারের অন্ধানুসরণ এবং তদানুষঙ্গিক পান ভোজন আমোদ সম্ভোগ তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।”

“এরূপ ঘটিবার এক প্রবল কারণ এই যে, প্রাচীন সমাজ সহসা একবারে পরবর্ত্তী যুগের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে না। পুরাতন বদ্ধমূল সংস্কারের অধীন নানা শ্রেণীর বহুলোক লইয়া তাহাকে চলিতে হয়, এই জন্য তাহার গতি অতি মন্থর। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের সামাজিক এবং পারিবারিক রীতি নীতি এবং রাজকীয় শাসনবিধি সমুদয়ই ধর্ম্মমূলক, তৎসঙ্গে পৈতৃক বিষয় বিত্তের উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব, পুত্রকন্যাগণের উদ্বাহাদি ক্রিয়ার বিশেষ যোগ; সুতরাং আধুনিক কৃতবিদ্য দল সামাজিক, পারিবারিক এবং বৈষয়িক শান্তি এবং ঐহিক সুখ সুবিধার অনুরোধে বিশুদ্ধ মার্জ্জিত জ্ঞান এবং আন্তরিক বিশ্বাস অনুযায়ী কোন অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হইত না। কোন রূপ একটা সংস্কার আরম্ভ করিতে গেলে প্রথমে আপাততঃ তাহাতে অল্লাধিক ত্যাগ-স্বীকার আবশ্যক হয়; এই কারণে আপনাদিগকে চিরদিন রক্ষণশীল বলিয়া তাহারা প্রচার করিত। এক দিকে বিশুদ্ধ নীতি ও জ্ঞান সংস্কার বিবেক বুদ্ধি, অপর দিকে বহুকালের প্রাচীন প্রথা ও সাংসারিক স্বার্থরক্ষা, এই উভয় সঙ্কটের অবস্থায় পড়িয়া তৎকালে অধিকাংশের এইটী বিশেষ চেষ্টা ছিল যে যুগপৎ দুই দিক্ কেমনে রক্ষা করা যায়। কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? পরিশেষে পার্থিব কল্যাণের অনুরোধে এই হইল যে পারমার্থিক ধর্ম্মভয়, দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস টুকু চলিয়া গেল। “সংযম নিয়ম, প্রার্থনা উপাসনা ধ্যান ইত্যাদির

কোন ফলবত্তা নাই, যাহাতে সব দিক (অর্থাৎ সংসারটী) ষোল আনা বজায় থাকে, প্রচলিত শাস্ত্র, মহাজনপ্রবচন, এবং বিদ্যা বুদ্ধি যুক্তি ও চাতুরী কৌশলের সাহায্যে তাহাই করিতে হইবে।” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুর্ব্বলতা সমর্থনের জন্য তাহারা এই ধূয়া ধরিল, যে মহাজনগণের পথ, শাস্ত্রকারদিগের মতই অবলম্বনীয়। সুতরাং যেমন অভিপ্রায় সঙ্কল্প, চরিত্রও তেমনি হইল। কালবশে এই আত্মবঞ্চনা, বিবেকান্ধতা শাঠ্যকে সারল্যে, অতিবুদ্ধি অজ্ঞানান্ধে, এবং অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করিয়া তুলিল। তদবস্থায় চিত্তশুদ্ধিকর নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা জ্ঞান ভক্তি উপার্জ্জনের আবশ্যকতা এবং অভাব কেহ আর অনুভব করিতে পারিত না। অজ্ঞান মূঢ় নিকৃষ্টাধিকারীদিগের অনুষ্ঠিত যে ভৌতিক উপাসনা, উপধর্ম্ম এবং নৈসর্গিক সকাম কর্ম্ম তাহাতেই কেবল শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা আবদ্ধ থাকিতেন। অথচ শাস্ত্রীয় বিচারের সময় মুখে বেদবেদান্ত ষড়দর্শনের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। জ্ঞানপূর্ব্বক বাক্-কৌশলে মিথ্যা কল্পনা ভ্রমকে বিজ্ঞান যুক্তির সাহায্যে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করা ইদানীন্তন তাঁহাদের একটী বিশেষ প্রবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এ প্রকার লোকের সংখ্যাও অতি কম বলিতে হইবে; অধিকাংশ ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ড-বিহীন স্বেচ্ছাচারী নাস্তিকবৎ কাল যাপন করিত।”

“প্রাচীন আর্য্যকুলের ধ্বংসাবশেষ বংশ যৎকালে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং কলির কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, সেই সময় ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে সত্যবেদীয় দ্বিজরাজ নামা বিপ্রকুলোদ্ভব কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মার পুত্র শ্রীজীবানন্দ যথা-রীতি শিক্ষা এবং দীক্ষার পর সমাবর্ত্তনান্তে স্নাতক ব্রত গ্রহণ করেন। শ্রীজীবের বয়ঃক্রম তখন একবিংশতি বর্ষ। তাঁহার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় এবং মনের বাসনা বৃত্তি সকল মুকুলিত এবং বিকাশোন্মুখ, বাহিরে তাহার উপভোগ্য বিষয়রাজীও সম্মুখীন। জীবনসংগ্রামের যাবতীয় উপকরণ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে, অচিরে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে, ইহা সন্দর্শন করিয়া শ্রীজীব পূজার মন্দিরে গৃহবেদিকার সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভক্তিরসবিগলিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্ট দেবতাকে বলিলেন, “হে অনন্ত লীলাময় প্রভু, আমি সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্নাতক ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়া চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতেছি। যখন আমি নির্জ্জনে একাকী পূজা

ধ্যান প্রার্থনা এবং নাম গান করিতাম তখন মনে হইত, গৃহধর্ম্ম কি আর এত কঠিন? একটু পরিশ্রম আর একটু ত্যাগস্বীকার বইত নয়। কিন্তু এক্ষণে একদিকে ভয়, অপর দিকে নির্ব্বেদ আমাকে দুর্ব্বল এবং শিথিল করিয়া ফেলিতেছে। তোমার পূজা ধ্যান আমার বড় ভাল লাগে, কিন্তু এ সকল সংসারব্যাপার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; এবং এ গুরুতর ব্রত আমি বহন করিতে পারিব কিনা তদ্বিষয়ে গভীর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অধিকন্তু আমি অন্তরের ভাব অনুরাগ আদর্শবিশ্বাস এবং উচ্চ আশার সহিত এ সকল বৈষয়িক এবং গৃহকার্য্যের সামঞ্জস্য দেখিতেছি না। সুনীতির আদর্শ, বিশ্বাসের শাস্ত্র এখানে প্রচলিত বৈষয়িক অবস্থা এবং সামাজিক রীতির সহিত মিশিয়া দিন দিন যেন আর এক নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে। আমি হে দেব, তোমায় যেরূপ জানি, তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় যাহা কিছু বুঝিয়াছি, সংসারের কাজের সঙ্গে সে জ্ঞানকে কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছি না। সকলেই বলে নীতির আদর্শ কমাও, বিশ্বাসের কতকাংশ বাদ দাও, নতুবা সংসারের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। অনেক সুবিজ্ঞ ধর্ম্মাচার্য্যও প্রকারান্তরে এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাই বার বার বলেন। কাজ নাই আমার গৃহধর্ম্মে, বিষয়কর্ম্মে, আমি বিশ্বাস এবং নীতি ষোল আনা চাই। সংসারভয়ে, বিষয়কার্য্যের অনুরোধে তাহার এক আনা যদি আমি ছাড়ি, তাহা হইলে তোমাকে আর আমি পাইব না। হায়! তাহা হইলে আমার কি গতি হইবে। অতএব আমি সংসারকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মানস হইব। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব হইয়া থাক। আমার প্রাণ তোমাকে উৎসর্গ করিয়া রাখিলাম।”

জীবের কথা শুনিয়া আচার্য্য অনন্ত বলিলেন, “পুত্র, তোমার চিন্তা, তোমার সিদ্ধান্ত, তোমার কার্য্যপ্রণালী আমার মত নয়। সংসার লইয়াই আমার ভগবৎসত্তা পূর্ণ, তাহাকে ছাড়াও যা, আমার অভিব্যক্তাংশ বাদ দেওয়াও তাই। তবে তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিতে পারিলে কৈ? কেবল কি তাহা কল্পনা এবং চিন্তায়? ষোল আনা বিশ্বাস ও নীতির তুমি পক্ষপাতী তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সংসার ক্ষেত্র ব্যতীত তোমার সে বিশ্বাস এবং নীতির শিক্ষা সাধন পরীক্ষা এবং সিদ্ধি কোথায়? একবারে কেহই পূর্ণকাম হইতে পারে না। আমাকে জীবন উৎসর্গ যদি কর, তবে দেহ মন আত্মার

যাবতীয় শক্তি বৃত্তি কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আমার সামগ্রী আমাকে উৎসর্গ করার কোন অর্থ নাই। আমার প্রতি যে বিশ্বাস ভক্তির কথা তুমি বলিতেছ, কার্য্যতঃ তাহার প্রমাণ প্রদর্শন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমি তোমাকে সংসার দিয়া তাহা পরীক্ষা করিব। অতএব জীবনপথে যেমন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে, তৎসঙ্গে বিবিধ অবস্থার ভিতর কার্য্যতঃ আমার "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই সপ্ত স্বরূপের প্রকৃত আরাধনা করিবে। সংসারে দৈনিক জীবনে কর্ত্তব্যের সহিত যে ব্রহ্মারাধনা, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম-যোগ। এই আরাধনা সাধন জন্য কর্ম্মক্ষেত্র চাই। এই জন্যই আমি গৃহধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। অতএব তুমি এই পথে এখন ক্রমে পদ সঞ্চালন কর, যখন যে বিষয়ে জ্ঞান এবং শক্তিসাহায্য চাহিবে আমি তাহা প্রদান করিব। নিরুদ্যম হইও না, আশা বিশ্বাসে একান্ত নির্ভর কর।"

জীব। কর্ম্মেতে বড় রজঃ গুণ বৃদ্ধি হয়; তাহাতে সফলকাম হইলে স্বার্থ আসক্তি মায়া জন্মে এবং লোকপ্রশংসা শ্রবণে চিত্ত অহঙ্কারী হইয়া উঠে; আবার কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাই বোধ হয় শাস্ত্রে আছে, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া জ্ঞানী হইবে। বস্তুতঃ বাহ্য কার্য্য সকল তো প্রকৃতির নিয়মে আপনি হয় এবং তাহা অজ্ঞানে যান্ত্রিক নিয়মেও হইতে পারে। তাহাতে আর ফলিতার্থতা কি আছে? কার্য্যচক্রে ঘুরিয়া যদি আমি তোমায় হারাইয়া ফেলি, সজ্ঞানে তোমায় উপলব্ধি করিতে না পারি, এবং তাহাতে যদি চিত্তের গতি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার জীবনের উদ্দেশ্যই যে বিফল হইয়া গেল?

ব্রহ্ম। যখন আমি কর্ম্মযোগকে আমার আরাধনা বলিতেছি তখন যন্ত্রবৎ কার্য্য আমার উপদেশের অভিপ্রায় নয়। আমার প্রতি তোমার লক্ষ্য স্থিরীকৃত এবং চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা সাধিত হইবার পক্ষে কর্ম্ম অবলম্বন স্বরূপ। সুতরাং এস্থলে তোমার উদ্দেশ্য বিফল হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

কর্ম্মযোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মসংশয় ছেদন।

শ্রীজীব বিস্মিত অন্তরে বলিলেন, "কেন, আমি আরাধনাত প্রতিদিন উপাসনার সময় করিয়া থাকি। দীক্ষা সংস্কার গ্রহণাবধি কুলগুরুর উপদেশানুসারে আমি তোমার নিত্য আরাধনা করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার যথেষ্ট আনন্দ সম্ভোগ হয়। তবে সে জন্ম আমাকে সংসারে ব্রতী করিবার এত প্রয়োজন কি? আমি অন্তরে অন্তরে গভীর যোগে তোমার আরাধনা করিয়া বড় শান্তি পাই। জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগে তোমার স্বরূপ সকলের সাধনপূর্ব্বক তোমার বিশুদ্ধ সত্তাতে লীন হওয়াই যখন চরম উদ্দেশ্য হইল, তখন অসার সংসারের মায়াময় কর্ম্মযোগে কেন তুমি উপদেশ করিতেছ? আমি তোমায় বিশ্বাস ভক্তি সহকারে হৃদয়ের মধ্যে পূজা আরাধনা করিব, কর্ম্মযোগ, বিষয়সঙ্গ আমি চাই না; তাহাতে চিত্ত বারম্বার বহির্ম্মুখী ও বিকারগ্রস্ত হয়। দুই দিন পরে যাহার সহিত সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে, তাহার জন্য এ বিপুল সংগ্রামের প্রয়োজনই বা কি? তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং চিত্তসংযম পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে যোগের গভীর স্থানে উপনীত হইয়া আমি কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি সেই বিষয়ে বরং তৎপর হই। বৃথা সময় নষ্ট করিলে আমার কি হইবে?"

জীবানন্দের অপক্ক চঞ্চল বিশ্বাস এবং তরল ভক্তির কথা শুনিয়া পরম গুরু অনন্তাচার্য্য বলিলেন, "বৎস, কর্ম্মযোগরূপ সাধনসোপান আরোহণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তশুদ্ধির কোন উপায় নাই; তাহার অবলম্বন বিনা জ্ঞান এবং ভক্তিমার্গে কেহ উত্থান করিতে পারে না। আমার প্রেরিত কৃপাসিদ্ধ পুরুষ যাঁহারা, আমার বিশেষ লীলা সাধনজন্য তাঁহারাই কেবল প্রত্যাদিষ্ট দিব্যজ্ঞান এবং অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তথাপি মৎকৃপালব্ধ সেই দিব্যজ্ঞান ও অহৈতুকী ভক্তির চরম পরিপাক জন্য এবং লোকশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকেও আমি নিষ্কাম কর্ম্মে নিযুক্ত করি। তাঁহারাও আহ্লাদ সহকারে ফলাফলে নিরক্ষেপ হইয়া মানবমণ্ডলীর শিক্ষার্থ বিবিধ ব্রত নিয়ম

সময়ে সময়ে আচরণ করিয়া থাকেন। তুমি যে তোমার বিশ্বাস ভক্তি ভজন কীর্ত্তন আরাধনা ইত্যাদির প্রতি পক্ষপাতিতা দেখাইতেছ উহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য ঘটনা নহে; ভাবপ্রবণতা বা নবানুরাগ বশতঃ কেবল আপাততঃ ঐরূপ মনে হইতেছে। অতএব কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ হইতেই পারে না; এবং কর্ম্মক্ষেত্র এই সংসার ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্য ক্ষেত্রও নাই। জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যে নৈতিক শাসনাধীনে তোমার ভক্তি মার্জ্জিত ঘনীভূত হইবে, এবং বিশ্বাসের সারবত্তা পরীক্ষিত এবং দৃঢ়ীভূত হইবে। সংসারসংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিলে ধর্ম্মশিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষা সকলই নিষ্ফল জানিও। বিদ্যালয়ে গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞানশিক্ষা, তপোবনে ধর্ম্ম সাধন, এবং সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ তাহা অবশ্য জান।"

জীব। তবে কি আমার পূজা আরাধনাজনিত যে আধ্যাত্মিক শান্তি আনন্দ সে সমস্ত মিথ্যা?

ব্রহ্ম। সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়,; কিন্তু উহা ভাবপ্রধান, তরল এবং নবানুরাগ-জনিত সাময়িক উচ্ছ্বাস। দৈনিক কার্য্যের নীতির সহিত যদি উহার যোগ না থাকে, কর্ম্মগুলি যদি অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম হয়, তবে সে ভাব অনুরাগ ক্রমে শুকাইয়া যাইবে, চরিত্রগত ভক্তি জন্মিবে না।

জীব। বিষয়কার্য্যের সহিত পূজা প্রার্থনা আরাধনার সামঞ্জস্য কিরূপ তাহাত আমি শিক্ষা করি নাই।

ব্রহ্ম। সেই জন্যইত বলিতেছি, এখন সেই শিক্ষা আরম্ভ কর। আমার যে সত্য, জ্ঞান, প্রেম পুণ্য ইত্যাদি স্বরূপের আরাধনা করিবে, তাহার উপলব্ধি হইবে কিরূপে যদি প্রতিদিনের কার্য্যে তাহার আবির্ভাব না দেখ? এই যে স্বরূপগুলি, ইহা মুখস্থ বা বুদ্ধিগত মতামতের অধীন নহে, হৃদয়ের সাময়িক ভাবান্ধতাও নহে, ইহা কার্য্যে উপলব্ধ দেবশক্তি; আমার ইচ্ছা পালনের সঙ্গে ইহার নিগূঢ় যোগ আছে। যদি কর্ম্মক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ না হও, তবে আমাকে কেবল জ্ঞান কিম্বা ভাবে সত্যস্বরূপ বলিয়া ধরিতে পারিবে না। যদি আমার জ্ঞানালোক অন্বেষণ না করিয়া নিজের বিষয়বুদ্ধিতে চল, কিম্বা অভ্যাস বা প্রবৃত্তির স্রোতে নীয়মান হও, জ্ঞান স্বরূপের প্রকৃত

আরাধনা হইবে না। এইরূপ সমস্ত। এই কর্ম্মযজ্ঞ জ্ঞান ও ধর্ম্মযজ্ঞের অবলম্বন। ইহাই মুক্তির সোপান।

অন্তর্য্যামী আচার্য্যের অন্তরভেদী কথা শুনিয়া জীব তখন নিতান্ত ভগ্নো-দ্যম হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, সংসারের কাজ এবং ব্রতবিধি পালন দ্বারা আবার যদি আমায় পরীক্ষা দিয়া বিশ্বাসী হইতে হয়, তবেত বড়ই কঠিন সমস্যা দেখিতেছি। ভাবিয়াছিলাম, একেবারেই চরমধর্ম্ম ভক্তিযোগ লাভ করিব। আবার সেই সংসারের কাজগুল লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইবে! তার সঙ্গে আবার বাহ্য ধর্ম্মের ক্রিয়া অনুষ্ঠান! এখন আর ও সব আমার আদবেই ভাল লাগে না। দৈহিক অভাবগুলি যে কোন প্রকারে হউক, দুঃখে সুখে একরূপ মোচন হইয়া যাইবে, আমি নিশ্চিন্ত মনে সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে লইয়াই থাকিব, এরূপ আশা আমার দেখিতেছি তবে বিফল হইয়া গেল। ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক!

ব্রহ্ম। তুমি ও সব কি ভাবিতেছ? ওরূপ বিরক্ত চিত্তে কর্ম্মযোগ সাধন হয় না। দিব্যজ্ঞান এবং ভক্তি লাভের উপায় জানিয়া প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। বিধিবদ্ধ প্রণালী ও উপায় গুলি অনেক সময় কঠোর নীরস হইলেও পরিণামে তাহা ফলেতে মিষ্ট। আমার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিলে ভক্তি বিশ্বাসের গুণে অনুষ্ঠান প্রণালীও ক্রমে সরস বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। কারণ, তাহার মধ্যে আমি আছি। বস্তুতঃ সমস্ত কর্ম্মই যে কঠোর তাহা নহে, তোমার সামর্থ্য এবং প্রকৃতির পক্ষে যাহা কিছু উপযোগী তাহাই মৎপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মযোগ। যখন জীবন লাভ করিয়া জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন কর্ম্ম তোমাকে করিতেই হইবে। জীবন আছে, অথচ কর্ম্ম নাই, ইহা হইতেই পারে না। ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ নহে; ক্ষুদ্র শিশু যেমন শুইয়া শুইয়া হস্ত পদ সঞ্চালন করে, মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্ম তেমনি স্বাভাবিক। ঐশিকশক্তির প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা তাঁহার ইঙ্গিত-ক্রমে জীবনের নৈসর্গিক ও পারমার্থিক ক্রিয়া গুলিকে সত্যেতে নিয়মিত করাই কর্ম্মযোগের চরম লক্ষ্য। এই কর্ম্ম প্রথমে স্বাভাবিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়। এবং তাহার অবলম্বনে সাধক ক্রমশঃ কর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিযোগে আরোহণ করে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এই চারিটী ব্রহ্মলোক

গমনের সোপানরূপে পরস্পরের সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে। একটী হইতে অপরটীকে পৃথক্ করা যায় না। যুবক বালক মূঢ় অন্ধ জড়বুদ্ধি নিকৃষ্টা-ধিকারী নরনারীকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে কতকগুলি নিত্য নৈমি-ত্তিক ধর্ম্মকার্য্য এবং মন্ত্র, তন্ত্র, স্তুতি, বন্দনা, গাথা অবলম্বনরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বালক যেমন ব্যাকরণ বিজ্ঞান গণিত সাহিত্য শিক্ষার পূর্ব্বে কতক-গুলি শব্দ এবং সূত্র অজ্ঞানে কণ্ঠস্থ করে, প্রথমে সকলের বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর অজ্ঞ জনের পক্ষে তেমনি কর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। যাহারা অপেক্ষাকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ধীমান্ তাহারা কর্ম্মযোগের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান ও ভক্তির সোপানে আরূঢ় হয়। কাজের অভ্যাসের সঙ্গে তাহার উদ্দেশ্য তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিতে পারে। ভগবৎকৃপায় কিছু কিছু জ্ঞানানন্দ এবং প্রেমানন্দও তখন তাহাদের সম্ভোগ হয়। অবশ্য যে কর্ম্মেতে ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ এবং যাহা নিম্ন অধিকারীর পক্ষে প্রথম অবলম্বনীয়, তাহাকে ঠিক কর্ম্মযোগ বলা যায় না। যথার্থ কর্ম্মযোগ জনক যাজ্ঞবল্ক্য অম্বরীষ, নানক চৈতন্য ঈশা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির ন্যায় সিদ্ধাত্মা মহাপুরুষদিগের অনুষ্ঠেয় চরম ধর্ম্ম। প্রকৃতি, শিক্ষোন্নতি এবং অবস্থানুসারে প্রতি জনের কার্য্যের শ্রেণী বিভাগ আছে।

কর্ম্মযোগ—তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মানুগত কর্ম্ম।

শ্রীজীব যখন বুঝিলেন, জীবনই কর্ম্ম এবং জীবনই ধর্ম্ম, নিশ্চিন্ত চিত্তে ভগবদ্ধ্যান, যোগসম্ভোগ কি ভক্তি সাধন এ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের চরম ফলস্বরূপ; কর্ম্মহীন যোগ ধ্যান ভক্তি কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং ভাব মাত্র, তাহাতে আনুষ্ঠানিক জীবন নাই; কর্ম্ম সকল জ্ঞান এবং ভক্তির আধার; শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া ছাড়িয়া ইহলোকে ধর্ম্ম সাধন হয় না; যত দিন শরীর আছে তত দিন বাহ্য কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী;—দেবালোকে যখন তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন, তখন আচার্য্য অনন্তদেবের নিকট কর্ম্মযোগতত্ত্ব বিস্তারিতরূপে শিক্ষা করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন।

ভগবান বলিলেন, "কর্ম্ম ত্রিবিধ। (১) দৈহিক (২) মানসিক (৩) আধ্যাত্মিক। ইহলোকবাসী দেহধারী মানবগণ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম আমার ইচ্ছানুসারে সাধন করিবে। দৈহিক এবং মানসিক কর্ম্ম আধ্যাত্মিক দিব্যজ্ঞান-যোগের অধীন, তদ্ব্যতীত দেহ মনের কার্য্য যান্ত্রিক, অভ্যাসগত এবং ফলকামী। অতএব তুমি সর্ব্বাগ্রে নিষ্কাম অধ্যাত্ম যোগে বিবেকশক্তি দ্বারা আমার ইচ্ছা বুঝিবে, তদনন্তর সেই আলোকে প্রজ্ঞাযোগে দেশ কাল পাত্র বিচারপূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য কার্য্য সাধন করিবে। তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার মধ্যে কেবল আমারই ইচ্ছার স্রোত অবিভক্তরূপে প্রবাহিত দেখিতে পাইবে।"

জীব। সকল প্রকার কার্য্যের জন্য কি সকলে দায়ী? না প্রতি জনের নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট বিশেষ কোন কার্য্য আছে?

অনন্ত। অবশ্য প্রকৃতি, নিয়তি, অবস্থা এবং ক্ষমতানুসারে কার্য্যের বিভাগ আছে। তদনুসারে বিশেষ দায়িত্বের সীমা বুঝিয়া লইতে হইবে। সকল কার্য্যই আমার বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ কার্য্য; তজ্জন্য সে আমার নিকট বিশেষ রূপে দায়ী। নিজের সেই বিশেষ দায়িত্ব ষোল আনা সম্পাদন করিয়া আমার ভক্তেরা অতিরিক্ত সাধারণ কার্য্যও করিবে; কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার আদেশ লইতে হইবে। আমি সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ন্তা এবং নিয়ামক।

জীব। জীবনের কার্য্যের কথা মনে হইলে আমি তাহার কূল কিনারা দেখিতে পাই না। যাহা কিছু করিব তোমার ইচ্ছানুসারে তাহা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পন্থা প্রণালী কিরূপ? অনেক কাজ অভ্যাস বশতঃ করিয়া থাকি; কত সময় প্রবৃত্তিবিশেষের উত্তেজনায় অবশভাবে, কখন বা স্বার্থের অনুরোধে করি; সে গুলি তোমার ইচ্ছা, জ্ঞান, শক্তি অনুভবের সহিত তোমার কার্য্যজ্ঞানে নিষ্কাম ভাবে এখন কিরূপে করিব তাহাই আমাকে বলিয়া দাও।

ব্রহ্ম। একবারে সমস্ত বিভাগের কার্য্য কর্ম্মযোগে পরিণত করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। মানবের বন্য অনুৎকর্ষিত স্বভাব প্রথমে আপনাপনি আমার ইঙ্গিতে, ভৌতিক প্রকৃতির নৈসর্গিক নিয়মে, কিয়ৎ পরিমাণে অন্ধশক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সাধন এবং কর্ষণ দ্বারা উহাকে ক্রমে আমার আদিষ্ট

পথে ধর্ম্ম নীতির শাসনাধীনে আনিতে হইবে। তন্নিমিত্ত প্রথম হইতেই ধর্ম্মবুদ্ধি অর্থাৎ বিবেকের সাহায্য চাই। এই জন্য প্রতিজনের কার্য্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে মিশিবার এবং আমার অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, আর এক পরোক্ষ বিষয়-ব্যবহারিক কার্য্য। ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতি শিক্ষা দ্বারা প্রথমতঃ আমার স্বভাব প্রকৃতি অভিপ্রায় জানিতে হইবে। তৎসঙ্গে এবং তদনুসারে বিষয় কার্য্যগুলি ক্রমশঃ নিয়মিত হইতে থাকিবে। যদিও জীবনের তাবৎ কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য, এবং জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, তৎসঙ্গে দেহেন্দ্রিয় এক সময়ে এক সঙ্গে মিলিয়াই কার্য্য করে, তথাপি সাধনের সুবিধার জন্য উহাকে আমি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি।

জীব। তবে কেন আমাকে যোগ ধ্যান জপ তপ সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতে নিষেধ করিলে? সর্ব্বাগ্রেই তাহারত প্রয়োজন।

ব্রহ্ম। একবারে নিষেধ করি নাই। তোমার তদ্বিষয়ে যে পক্ষপাতিতা, একদেশদর্শিতা এবং ভ্রান্তি ছিল তাহারই নিরসন করিতে বলিয়াছি। উভয় বিভাগের কার্য্যই সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

জীব। সাধন ভজন যোগ তপস্যায় একটু বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়া তার পরে ত কার্য্যক্ষেত্রে যাইব? তুমি যে আমাকে তাহার অবসরই দিতে চাও না।

ব্রহ্ম। স্নাতক ব্রত গ্রহণের অগ্রে অনেক অবসর দিয়াছি। অন্য কোন কার্য্যও যদি তুমি না কর, দেহযাত্রা নির্ব্বাহজন্য স্নান ভোজন নিদ্রা শৌচ আচমন এ সব আরত ছাড়িতে পারিবে না? এই অপরিহার্য্য দেহযাত্রা নির্ব্বাহক পান ভোজনের সঙ্গেই কর্ম্ম গ্রথিত রহিয়াছে।

জীব। জীবিকা সংগ্রহ কিম্বা নির্ব্বাহ মানুষত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করে, তাহার জন্য আবার সাধন তপস্যার আবশ্যকতা কি?

ব্রহ্ম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করে বটে, কারণ, আত্মপোষণ জন্য সংগ্রাম একটী বিশ্বের আদি মূল নিয়ম; কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে নিয়মিত করা প্রয়োজন, নতুবা তাহা পশ্বাচার এবং স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। অতএব ধর্ম্মহীন কর্ম্ম যেমন স্বেচ্ছাচার, কর্ম্মহীন ধর্ম্মও তেমনি কেবল মত এবং ভাবে আবদ্ধ। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞানশক্তি বিকসিত হয় না।

জীব। বিষয় কার্য্যের জন্য অগ্রে ধর্ম্মজ্ঞান, নৈতিক নিয়মনিষ্ঠা চাই, আবার ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলে বিষয়কার্য্য ভাল লাগে না; দুই কার্য্য এক সঙ্গে কিরূপে করিব আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ব্রহ্ম। মনে কর, (যেমন যন্ত্র পরিচালনের জন্য বাষ্পশক্তি সংগ্রহ; সেই উদ্দেশ্যে যদি তাহা না কর, ক্রমাগত বাষ্প সংগ্রহ করিলে কি হইবে? তাহা থাকিবেই বা কেন?) তেমনি কিয়ৎ পরিমাণে প্রাত্যহিক ভজন সাধন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য, আর কিয়দংশ আমাকে আত্মস্থ করিবার জন্য। যে পরিমাণে তুমি আমাকে আত্মস্থ অনুভব করিবে সেই পরিমাণে তোমার বাহ্য ব্যবহার কার্য্যানুষ্ঠান সকল বিশুদ্ধ হইবে। আবার সেই অনুষ্ঠান তোমার আত্মাকে পোষণ করিবে। পরিশ্রমে যেমন ক্ষুধা ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধিতে যেমন ক্ষুধা ও শ্রমসামর্থ্য বাড়ে, তেমনি পূজা ও সেবা উভয় উভয়ের পরিপোষক।

জীব। একেবারে মুক্তি লাভের জন্য কি উপাসনা নয়? কেবল কাজ করিবার জন্য?

অনন্ত। আপাততঃ তাহাই বটে। পরে ইহার উচ্চতম গভীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে মর্ত্ত্যজীবনের দৈনিক কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ অগ্রে নৈতিক নিয়মনিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। প্রথমে কর্ম্ম-সাধনের জন্যই ধর্ম্মসাধন। বাহিরের বিষয়কর্ম্ম এবং পূজানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাদির ভিতরে আমার ইঙ্গিত এবং প্রেরণা অন্বেষণ করিলে বিবিধ কর্ম্মের উপলক্ষে আমাকে বিধাতা নিয়ন্তা কর্ম্মকর্ত্তারূপে দেখিতে পাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জীবব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

জীব বলিলেন, "কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং বৈষয়িক কার্য্য করিলে সমস্ত জীবন কর্ম্মযোগসিদ্ধ ধর্ম্মেতে পরিণত হয়, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও। তৎসম্বন্ধে বাহ্যাবলম্বন এবং কার্য্যপ্রণালীই বা কিরূপ?"

লোকগুরু অনন্তদেব তদুত্তরে কহিলেন, "অগ্রে বিশেষ সময়ে, বিশেষ ধর্ম্মসাধন প্রয়োজন; তদনন্তর তাহার ফলস্বরূপ জীবনের প্রত্যেক চিন্তা ভাব

ইচ্ছা ও কার্য্যে ধর্ম্মসংস্কার বিস্তার হইয়া পড়িবে। প্রথমে স্থূল, শেষে সূক্ষ্ম; অগ্রে বিশেষ, তার পর সাধারণ। মহাজনগণের অবলম্বিত এই পন্থা।

জীব। আমি যদি বিষয় চিন্তা এবং বিষয় কার্য্যগুলি বিবেক বুদ্ধি অনুসারে প্রতি দিন সম্পন্ন করি, তাহা হইলে বিশেষ সময়ে আবদ্ধ কোন প্রণালীগত উপাসনানুষ্ঠান নাই বা করিলাম তাহাতে ক্ষতি কি? কার্য্যগুলি তোমার অনুমোদিত বিশুদ্ধ হওয়াইত প্রকৃত ধর্ম্ম? তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

আচার্য্য। কেবল কতকগুলি বাহ্যকার্য্য সম্পাদনই যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এ কথা বলিতে পারিতে; আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবনের সমস্ত কার্য্য কেবল বিবেক বুদ্ধি কিম্বা নৈতিক সংস্কারে বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আমার নিত্যপূজার প্রসাদ এবং আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আমার নিত্য বর্ত্তমানতার উপলব্ধি এ জন্য বিশেষ প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন কর্ম্মযোগানুরাগ, তৎসংক্রান্ত ত্যাগস্বীকার, নিস্পৃহতা, সহিষ্ণুতা কোথা হইতে আসিবে? বিবেকালোকই বা কে জাগাইয়া দিবে?

শিষ্য। অনেকে ত্রিসন্ধ্যা পূজা আহ্নিক সাধন ভজন করিয়াও কার্য্য ব্যবহারে নীতি পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না; পূজা, আহ্নিক, জপ, তপ, ব্রত, উপবাসের সঙ্গে রাগ, লোভ, দুর্নীতি তাহাদের যেমন তেমনি থাকে, একটুও কমে না, বরং ধর্ম্মাভিমান বশতঃ তাহারা নির্ভয়ে পাপাচরণ করে। আবার এমন সচ্চরিত্র সত্যবাদী নীতিপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের পূজা আহ্নিকের তেমন কোন আড়ম্বর নাই, অথচ ব্যবহার আচরণ নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ।

আচার্য্য। চিত্তশুদ্ধি, এবং জ্ঞান ভক্তি নীতি উপার্জ্জনের জন্য যে উপাসনা সাধন অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা করা না করা সমান। আর ভক্তিহীন নৈতিক কর্ত্তব্য যাহা দেখিতে পাও তাহাও একপ্রকার অন্ধশক্তির অভ্যস্ত কার্য্য। কোন কোন বিষয়ে স্বাভাবিক অনুকূলতা বশতঃ কিম্বা শিক্ষাগুণে নীতিবাদীদিগের বিবেক নির্ম্মল থাকে, কিন্তু সমস্ত জীবন তাহা নয়। তাঁহাদের সে বিবেক একদেশদর্শী একাক্ষী এবং বদ্ধভাবাপন্ন; তাহাতে দৈববলের তেজস্বিতা নাই, কেবল নৈতিক নিয়মের লৌকিক ভদ্রতা এবং বাহ্যিক আনুগত্য আছে। সেরূপ নৈতিক কর্ত্তব্যের ভিতর আমার সর্ব্বতোমুখী কর্ত্তৃত্ব এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনেক অভাব থাকে।

দৈবনির্ভর ও ভক্তিবিহীন বিবেক অহঙ্কারে অন্ধ, সুতরাং তাহা পরীক্ষা বিপদে রক্ষা পায় না।

শিষ্য। তোমার আবির্ভাবের নৈকট্য আত্মস্থ করিবার জন্য যে প্রাত্যহিক পূজানুষ্ঠান স্মরণ মনন ধ্যান ধারণা তদ্বিষয়ে বাহ্যসাহায্যের কিছু আবশ্যকতা আছে কি না?

আচার্য্য। অবশ্য আছে। মানবের যত কিছু কার্য্য তাহার সঙ্গে দেহের যোগ, সুতরাং বাহিরের অবলম্বন বিনা দেহধারী জীব কোন কার্য্যই করিতে পারে না। অভীষ্ট দেবের প্রতি ভাব ভক্তি উদ্দীপনার্থ এবং চিন্ময় পদার্থের উপলব্ধি এবং ধারণার জন্য বাহ্য সাহায্য সর্ব্ব প্রথমেই আবশ্যক। কিন্তু তাহা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ অপরিহার্য্য এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ধ্যান চিন্তা পূজা আহ্নিকের নিমিত্ত মন্ত্রাদি পাঠ, নাম জপ, বাহ্য প্রণালী অবলম্বন কর্ম্মযোগেরই অন্তর্গত বিষয়।

শিষ্য। ধর্ম্ম সাধনের জন্য কোন্ কোন্ বাহ্য বিষয় আমাকে অবলম্বন করিতে হইবে?

আচার্য্য। যে সকল তন্ত্র মন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত স্তব স্তোত্র আরাধনা বন্দনা, সংযম নিয়ম ইতঃপূর্ব্বে অবলম্বন করিয়াছ তাহাই সর্ব্ব প্রধান; তদ্ব্যতীত আমার ভক্তগণের চরিত্র ধ্যান, মহাজনপ্রবচন, সাধুচরিত্রকাহিনী শ্রবণ অধ্যয়ন, যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনা, সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ, ব্রত উপবাস, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রাধ্যয়ন ইত্যাদি এ সমস্তই বাহ্য সাহায্য। ইহা ব্যতীত উপাসনার স্থান মার্জ্জন, পুষ্প পত্র পতাকা দ্বারা তাহা সজ্জিত করন, তথায় ধূপ ধূনা ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্যের বিস্তার, আসন এবং গৈরিক, শঙ্খ, একতন্ত্রী মৃদঙ্গ কর্ত্তাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, সর্ব্ব ধর্ম্মের সারসত্যসংগ্রহ গ্রন্থ, পারিবারিক এবং সামাজিক উৎসব পর্ব্বাদি; অবলম্বনের অভাব কি? সময়ে সময়ে নদী সমুদ্র পর্ব্বত প্রান্তর অরণ্যে ভ্রমণ; বর্ষাকালে দামিনীশোভিত ঘনঘোর মেঘমালা এবং অনন্ত নীলাম্বরে রবি শশী অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র দর্শন। সর্ব্বোপরি সাধু ভক্তের সেবা পরিচর্য্যা এবং তাঁহাদের লীলাস্থান ভ্রমণ। এই সকলের ভিতর দিয়া প্রথমে আমাকে সহজে স্থূলভাবে ধরিবে; তদনন্তর নির্জ্জনবাস, চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা নিরবলম্ব জ্ঞানযোগে যোগী হইবে।

শিষ্য। এই সকল অবলম্ব্য পদার্থ এবং ব্যক্তির গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং পবিত্রতার আকর্ষণ অনেক। তৎসমুদয়ের প্রতি আসক্তি বা ভক্তিবশতঃ চিত্ত তাহাতেই শেষ মুগ্ধ হইয়া পড়ে, পরে তাহা ছাড়িয়া তোমাকে ধরিবার জন্য সে আর কোন অভাব অনুভব করে না, ইহার উপায় কি ?

আচার্য্য। আমার অনুরোধেইত সে সকলের এত মাহাত্ম্য ; তবে আমাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার আকর্ষণ কতক্ষণ থাকিবে ?

শিষ্য। তা থাকে। তোমার নামগন্ধ যাহাতে আছে,—বিশেষতঃ ভক্ত-জীবন,—সাধনানুরাগী ব্যক্তি তাহাতেই পরমানন্দ লাভ করে। কেননা, তুমি অব্যক্ত, অনন্ত দুর্নিরীক্ষ্য নির্ব্বিশেষ, তোমার পূজা ধ্যানে সহসা একবারে জীবের অধিকার এবং তৃপ্তি হয় না। সীমাবিশিষ্ট অপূর্ণ জীব সাধারণের উদ্ধা-রের জন্যই তো মূর্ত্তিমান আকারে ভক্তজীবনে তোমার অবতরণ ? মানুষ যাহা কিছু বুঝিতে পারে মানবীয় প্রকাশ দ্বারা তাহা আগে বুঝে, তাই মহাপুরুষ-দিগকে ছাড়িয়া কেহ তোমার নির্গুণ অব্যক্ত সত্তার দিকে যাইতে বড় ভাল-বাসে না, পারেও না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোক এইজন্য অবতার পূজা করিয়া থাকে। অবশ্য ইহাকে হরিভক্তিরই লক্ষণ বলিতে হইবে।

আচার্য্য। যদি বাস্তবিক প্রকৃত ভক্তি কাহারো আমার প্রতি থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে কোন রূপ ব্যবধানে চিরদিন আবদ্ধ রাখিব কেন ? একবারে অব্যবধানে আমার স্বরূপের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া লইব। কে কি চায় আমি তাহা জানি। কেন না, আমি অন্তর্য্যামী।

এই মহান্ অর্থযুক্ত ভগবদ্বাক্যে শ্রীজীবের অন্তরাত্মা দিব্যজ্ঞানামৃতে পরি-ষিক্ত হইল। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া তখন ইহার গূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধির জন্য তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

কর্ম্মযোগ—পঞ্চম অধ্যায়।

সাকার নিরাকার তত্ত্ব।

শ্রীভগবান সদ্‌গুরুর সারগর্ভ বচনাবলী শ্রবণানন্তর তদ্বিষয়ে ক্ষণকাল গভীর চিন্তা এবং নিদিধ্যাসনের পর শিষ্য জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো ! আপনি যে যে বাহ্যাবলম্বনের কথা বলিলেন, তাহা আমি বহু দিন হইতে

ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সে সমস্ত আমার বেশ আয়ত্তীকৃত এবং অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার অনুষ্ঠান আমার প্রীতিকরও বটে; কিন্তু এই সঙ্গে যদি আপনার কোন একটী সুসজ্জিত সুন্দর ছবি বা মূর্ত্তি সম্মুখে রাখি, তাহা হইলে আপনার নৈকট্য এবং উজ্জ্বলতা আরো ঘনতররূপে স্পর্শনীয় হয়, তদভাবে অন্তরাত্মা কেমন যেন শূন্য শূন্য বোধ করি। সাধু ভক্ত কিম্বা দেব দেবীর মূর্ত্তি যাঁহারা পূজা করেন তাঁহাদের ভাবের বেশ একটা জমাট দেখিতে পাই।"

আচার্য্য। জমাটের ভিতর আপাততঃ যদিও আমোদ, উত্তেজনা ও তৃপ্তি বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে অনেক ভ্রান্তি কল্পনা মিথ্যা দৃষ্টি থাকে। সময়ে বাহ্যোপকরণের অভাব উপস্থিত হইলে মদ্যপের মত্ততার ন্যায় তাহা অন্তর্হিত হয় এবং সাধককে ঘোর মরুভূমির মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ মাত্রেই স্থান কালে আবদ্ধ ও ক্ষণধ্বংসী। ইন্দ্রিয় বিকল হইলে তদ্দ্বারা কোনই উপকার নাই।

শিষ্য। কিন্তু তাহাতে ঘোরালো রসালো ভাবে চিত্তকে সহজে বেশ বিমুগ্ধ এবং আমোদিত করে। বস্তুতঃ তোমার ত কোন নামও নাই, রূপও নাই, তথাপি তোমার ভক্তেরা ভাবের জমাটের জন্য তোমাকে পিতা মাতা সখা এবং প্রাণপতিরূপে সম্বোধন করেন, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মানবীয় সম্বন্ধ ব্যবহারের কল্পনা করিয়া থাকেন। তোমাকে ঘনতর সুমিষ্ট এবং উজ্জ্বলতররূপে উপলব্ধি করাই তো তাহার উদ্দেশ্য? চিত্র বিচিত্র সুসজ্জিত মূর্ত্তি কি সে উদ্দেশ্যকে আরও সহজে সংসিদ্ধ করিতে পারে না।

আচার্য্য। কখনই না। উহা দর্শনযোগের আবরণ স্বরূপ। চিত্ত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যদি বাহ্য জড় মূর্ত্তিবিশেষের চাকচিক্যে বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে আত্মা অন্তর্মুখে যাইতেই পারে না। জ্ঞানী সাধকেরা এইজন্য চক্ষুর্দ্বার বন্ধ এবং মনোবুদ্ধিকে সংযত করিয়া আমার আরাধনা ধ্যানে নিযুক্ত হন তাহাত দেখিয়াছ? জ্ঞানী ভক্তেরা যে ভক্তির আবেশে আমার নাম রূপ ও মানবীয় সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দাদি ব্যবহার করেন তাহা কেবল আন্তরিক মধুর এবং কোমল ভাবের প্রকাশ মাত্র, কোন বাহ্য কল্পিত রূপ দর্শনের জন্য নহে; যদিও তাহার ভাষা প্রাকৃত, কিন্তু ভাবোপলব্ধি বা ধারণা অপ্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক। ফলতঃ

তদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান ও ভাবগত গভীর পার্থক্য আছে। অতএব মূর্ত্তি সকল মদীয় সাক্ষাৎ দর্শনের অন্তরায় জানিবে। তবে আমার ভক্তগণের জীবন্ত দেহ কিম্বা প্রতিমূর্ত্তি দর্শনের অন্যবিধ ফল আছে। তদ্দ্বারা আমার প্রতি প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য পবিত্রতার উদ্দীপন হইতে পারে। কিন্তু আমার পরিবর্ত্তে উপাস্য রূপে তাহাকে গ্রহণ করা যায় না।

শিষ্য। সুগন্ধ দ্রব্য, যথা পুষ্প চন্দনাদি এবং শ্রবণমধুর সঙ্গীতের স্বর-লহরী, বাদ্যনিনাদ এ সকলও তো তবে তোমার দর্শনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ? তবে চক্ষুই একা কেন বঞ্চিত থাকিবে?

আচার্য্য। অবশ্য এ কথা বলিতে পার। কিন্তু নিরবলম্ব যোগ দ্বারা অব্যবধানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার দর্শনই লক্ষ্য; শ্রবণ কীর্ত্তন কেবল সহায় ও উপায় মাত্র। সৌন্দর্য্য দর্শনও ইহার মধ্যে একটী বটে। কিন্তু কথা এই যে, কোন মূর্ত্তিতো আমি নই, সুতরাং তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরিলে কি হইবে? শ্রবণ কীর্ত্তন কিম্বা কবিত্বপূর্ণ রূপক ভাষা আমার স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে ব্যবধান হয় না, তাহারা বিশুদ্ধ উপায় এবং আমার অনন্ত গুণবাচক, কদাপি পরিমিত নহে।

শিষ্য। মূর্ত্তিটা ধরিবার ছুঁইবার পক্ষে যেন বড় সহজ মনে হয়। তাহাতে অন্তর্দ্দৃষ্টি এক স্থানে দাঁড়াইবার জায়গা পায়। তদ্ব্যতীত ইহার দর্শন স্পর্শনে তোমারই মহিমা গুণ সকল মনে আসে।

ব্রহ্ম। ঐ খানেই ভয়ানক ভ্রম নিহিত আছে। জড়বুদ্ধি স্থূলদর্শী অজ্ঞান নরনারী কেবল রূপ রং দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চায়, আধ্যাত্মিক সারবত্তা এবং জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি অদৃশ্য অরূপ গুণরাশি অনুভব করিতে পারে না; সেই জন্য যাহা দেখিলে শুনিলে মন সহসা ভীত বিস্মিত উল্লসিত কিম্বা ভাববিগলিত হয় তাহাকেই উপাস্য বোধে তাহারা পূজা আরাধনা করে। কিন্তু একটু বিচার শক্তির উন্মেষ হইলে সহজজ্ঞানেই বুঝিতে পারে, ঐ সকলের অন্ত-র্নিহিত নিরাকার শক্তি এবং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান পদার্থ ভিন্ন আমি অন্য কিছু নহি। দারু মৃত্তিকা পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তি কিম্বা চিত্রিত ছবি কি কি উপাদানে মানুষ নিজেই নির্ম্মাণ করে তাহা সে বিলক্ষণ জানে। এ সকল অচেতন জড় পদার্থ আমার কোন্ গুণবাচক? সবগুলিই তমোগুণাক্রান্ত। আমার জ্ঞান

প্রেম ইচ্ছা, মঙ্গল ভাব ও পবিত্রতার বিন্দু মাত্রও উহা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে, বরং তাহা আবৃত করিয়া রাখে। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর, কুম্ভকার, বা চিত্রকরের কৃত দৃশ্যমান ছবি বা মূর্ত্তি মানবীয় শৌর্য্য বীর্য্য এবং বিনয় প্রেম পবিত্রতাদি গুণের উদ্দীপক হইলেও এক চেতন গুণের অভাবেই উহাদের যাবতীয় শক্তি ক্ষমতা বৃথা হইয়া যায়; তৎপ্রতি কাহারো কখনও বিশ্বাস জন্মে না। এবং কোন দৃশ্য পদার্থ অধ্যাত্ম দৃষ্টির অন্তর্মুখ গতি সাধনের সহায়ও নহে।

জীব। দৃশ্যমান সগুণ দেবমূর্ত্তির দর্শন স্পর্শন সেবা পরিচর্য্যা করিতে করিতে অদৃশ্য নির্গুণ অতীন্দ্রিয় চিদানন্দঘন যে তুমি তোমার পরমতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, এই জন্য জ্ঞানী ভক্তেরাও মূর্ত্তিপূজাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং লোকশিক্ষা দেওয়াও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য বটে। যে কোন বাহ্যাবলম্বনে তোমার জ্ঞান প্রেম পুণ্য মহিমা শক্তি এবং অতীন্দ্রিয় দেবগুণ সকল হৃদয়ঙ্গম হয় তাহাকেই ভজনের পরম সহায় বলিতে হইবে। কিন্তু মূর্ত্তি এবং ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ যে কেবল উপলক্ষ মাত্র তাহা জ্ঞানী মাত্রেই অবগত আছেন। নিরাকারবাদীর সহিত সাকারবাদীর সাধনপ্রণালী স্বতন্ত্র হইলেও শেষ এক অবস্থাতেই উভয়ের সিদ্ধি ও পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ রূপ বিনা চিন্ময়গুণের ধারণা অসম্ভব।

ব্রহ্ম। কার্য্যতঃ উভয়ের উদ্দেশ্য এবং ভগবদ্ধারণা সম্বন্ধে চিরদিন প্রভেদ লক্ষিত হয়। রূপ ভিন্ন মানবগুণের পরিচয় হয় না, কিন্তু আমার গুণের অনুরূপ রূপ কোথায়? রূপ মাত্রেই দেশকালে আবদ্ধ, সুতরাং আমার কোন একটী বিশেষ আকার বা রূপ হইতে পারে না। অনন্তের যদি বাহ্যরূপ থাকিত, তাহা হইলে এই নিখিল বিশ্বে একটী সামান্য পিপীলিকা কিম্বা কীটাণুও বাসস্থান পাইত না।

জীব। বিশ্বাসী ভক্তেরা কোন দেবমূর্ত্তিকে জড় অচেতন মনে করেন না, অপ্রাকৃত জাগ্রত জীবন্ত রূপে তাহা দর্শন করেন। তদ্ব্যতীত সমস্ত বিশ্বই তোমার রূপ; ইহা দেখিয়াইত আমরা তোমার গুণের পরিচয় পাইয়াছি।

ব্রহ্ম। জড়কে চেতন কল্পনা করিলে তোমার জ্ঞান বুদ্ধি তাহাতে কি সায় দিবে? কখনই না। আর এই অখণ্ড মহাবিশ্ব যদি আমার গুণের অনুরূপ রূপ

হয়, তবে খণ্ডাকৃতি ক্ষুদ্র এক একটী মৃত পুত্তলিকায় আমার কি গুণ দেখিতে পাইবে? তাহা কেবল অচেতন তমোগুণের আধার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যে রূপে আমার গুণের ধারণা করিবে তাহা যদি চলিতে বলিতে, দেখিতে শুনিতে না পারে এবং তন্মধ্যে যদি জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা না থাকে, তাহা হইলে তদবলম্বনে ফলিতার্থতা কি? জড়রূপে কোন অধ্যাত্ম চেতন গুণ নাই, ইহা ধ্রুব সত্য স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। তাই আমি প্রতি জীবনে জীবনে প্রাণের প্রাণ জ্ঞানের জ্ঞান, হইয়া ওতপ্রোত ভাবে স্থিতি করিতেছি। সাগরজলে যেমন লবণ, দুগ্ধে যেমন ঘৃত, তিলে যেমন তৈল, এবং কাষ্ঠে অগ্নি, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের সংযোগ এবং দুশ্ছেদ্য মিলন। মানুষ প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে, তথাপি আমাকে ত্যাগ করিতে পারে না। কারণ, জীবাত্মা আমার প্রতিবিম্ব; আমি পদার্থ সে ছায়া, আমি নিত্য সত্য, সে কেবল চিদাভাস। সে আমাতে উৎপন্ন হইয়া আমাতেই জীবিত রহিয়াছে। এই জন্য সে অব্যবধানে সত্যেতে ও ভাবেতে আমার পূজা করিবে। চিদ্বস্তুর পূজা কেবল চিচ্ছক্তিযোগে সম্পন্ন হয়। সত্যহীন অবিদ্যাসম্ভূত ভাব কল্পনা স্বপ্নলব্ধ বস্তুর ন্যায় অলীক। তাহাতে তোমার হৃদয় চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু যখনই জ্ঞানের উদয় হইবে তখনই বুঝিবে যে উহা প্রপঞ্চ সদৃশ অসার। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে, "সত্যহীনা বৃথা পূজা।"

জীব। এ কথা যদিও সত্য, তথাপি সাকার পূজা চিত্তকে এত আকর্ষণ করে কেন? সর্ব্বদেশীয় স্ত্রী পুরুষ দেখি প্রথমে রূপেতেই মুগ্ধ হয়, তাহার পর গুণবিচার করে। ফলতঃ ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রূপের দর্শন ভিন্ন গুণের অনুভূতি হয় না। মানুষকে আমরা রূপ দেখিয়াই চিনিতে কিম্বা স্মরণ করিতে পারি, তাহার অভাবে সকলই শূন্য নিরাকার।

ব্রহ্ম। সে সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপার; আমার সম্বন্ধে তাহা খাটে না। তোমরা সুন্দর সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া যখন তাহাদের গুণের পরিচয় পাও এবং দেখ যে তাহারা চূণকামকরা কবরস্থান বিশেষ, তখন কি প্রতারিত হও না? মানুষ সম্বন্ধে যেমন, উপাস্য দেবতা সম্বন্ধেও তেমনি জানিবে। ধ্যানের মন্ত্রে ললিত মধুর ছন্দে বর্ণিত আছে, ঠাকুরের মাথায় শিখিপুচ্ছের চূড়া, গলে বনমালা, কটিতে কিঙ্কিণী, পরিধান পীতবসন, পদে স্বর্ণ-নূপুর, কর্ণে

কুণ্ডল, নাসায় তিলক; নবনীরদের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, দুইটী বাঁকা নয়ন, মুখে মোহন বাঁশী, বক্ষে কৌস্তুভ মণি; তাঁহার বামেও তেমনি হেমকান্তি নীলাম্বরা পীনোন্নতপয়োধরা সুলোচনা রমণী মূর্ত্তি। ইহা দেখিলে শুনিলে ভাবিলে অন্তরে কবিত্বরস উৎসারিত হয়, বর্ণনা অতীব মনোহর এবং শ্রুতিমধুরও বটে, কিন্তু তোমার আত্মার উপভোগ্য প্রেম পুণ্য জ্ঞান ইহাতে কৈ? তাহা যদি না থাকে, তবে ইষ্টপূজা দ্বারা উপাস্যদেবের কি স্বরূপ তুমি প্রাপ্ত হইবে? তোমার দেহ অবশ্য ঐ রূপ লাবণ্যবিশিষ্ট সালঙ্কৃত হইবার আশা করিতে পার না। উপাস্য দেবতার দেবগুণ সকল যাহাতে উপাসকে সংক্রামিত হয়, তাহারই জন্য উপাসনা; কিন্তু তাহার কোন ব্যবস্থা ধ্যানমন্ত্রে নাই। আমার প্রকৃত দর্শন জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসগন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্রের অতীত অবস্থায়।

আর সগুণ প্রতিমার সেবা পূজা দর্শন স্পর্শনে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে কথা বলিতেছ তাহাও শূন্যবাদ। তাহার সাধন এবং সিদ্ধি উভয়ই অনাত্মক। সগুণ বলিলেই আকার বুঝায় না। নিরাকার সগুণ চিদানন্দঘন যে আমার অপ্রাকৃত রূপ—অর্থাৎ জ্ঞান প্রেম পবিত্রতাদির যে সক্রিয় গুণ, নিত্য উপাসনা দ্বারা সেই গুণময়রূপ যাহাতে উপাসকের অধ্যাত্ম জীবনে উদ্ভাসিত হয় তাহার জন্য উপাসনা ভজন সাধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেহ অথবা রূপের অঙ্গভঙ্গী এবং অশ্রু কম্প পুলক, স্বর-বৈচিত্র্য, শব্দ বিন্যাস, দণ্ডাবনতি, হাস্য আলিঙ্গন ইত্যাদি গুণপ্রকাশক রূপক্রিয়া যদি না থাকে, সকলই নির্গুণ হইয়া যায় সত্য; এই মানবীয় রূপসাহায্যে মানবগুণের অস্তিত্ব মনুষ্যসন্তানেরা বুঝিতে পারে, কিন্তু এ সকল কেবল আমারই অনন্ত গুণাভাস মাত্র, কোন রূপকল্পনায় তাহার পরিমাণ বা পর্য্যবসান হয় না। পরিমিত দ্বারা অপরিমিত যে আমি আমার তুলনাও অসম্ভব। তদ্দ্বারা কেবল আভাসমাত্র পাওয়া যায়। জড় পুত্তলিকাতে তাহা আদৌ নাই, বরং মানবে কথঞ্চিৎ আছে। অতএব কোন প্রকার রূপের ভিতর আমার মহত্তত্ত্ব উপলব্ধি হইবার নহে। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বা শূন্য অনাত্মবাদের চিন্তাতেও উপাসনা সিদ্ধ হয় না। জড় হইতে আরম্ভ করিয়া শূন্য নির্গুণ নির্ব্বিশেষ সত্তায় উপনীত হওয়াও প্রকৃত উপাসনার উদ্দেশ্য নহে, ইহা স্বভাবের বিরোধী। তুমি কর্ম্মযোগাবলম্বনপূর্ব্বক

যদি জ্ঞানযোগে আরোহণের চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে এখন বাহ্য পূজার্থ জড় মূর্ত্তির প্রতি এত দিন পরে আর আকৃষ্ট হইতে না; মৌখিক অভ্যস্ত মন্ত্রাদি এবং শারীরিক বাহ্য সাধনের যে বহির্ম্মুখ ফল তাহাই তোমার ঘটিয়াছে। ইন্দ্রিয়গোচর দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি যত দিন প্রবল থাকে, তত দিন মানুষ দৈহিক মোহে অন্ধ হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য ইষ্ট দেবতাকেও নর কিম্বা জড়াকারে দেখিতে চায়। কিন্তু এত উচ্চ জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষার পর তোমার মুখে এখন এ প্রশ্ন শোভা পায় না।

শিষ্য। কেন তাহাতে দোষ কি? যদ্দ্বারা তোমার প্রতি আমার ভক্তি ভাব ঘনীভূত হয়, বিশেষতঃ তুমিত সর্ব্বব্যাপী, মূর্ত্তির উপলক্ষে যদি তোমাকে ধরিতে এবং খুব নিকটে দেখিতে পাই, তাহাতে ভাল বই মন্দত কিছুই দেখি না। সৃষ্টিকাল হইতে, সমস্ত দেশের সমস্ত জ্ঞানী মূর্খ সভ্য অসভ্য নরনারী প্রাকৃতিক দৃশ্য পদার্থ এবং নানাবিধ মূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন নিরবলম্বে মানুষ কি দেখিবে? কি ভাবিবে? কেবল শূন্য অন্ধকার ধ্যান করিলে কি হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়? একটী জীবন্ত ব্যক্তির মত স্পর্শনীয় কিছু চাই, যাঁহার নিকট প্রাণের সব কথা বলিতে পারি এবং আশা ভরসা পাই।

আচার্য্য। সে ব্যক্তি দেহ নহে, চিন্ময় মূর্ত্তি পুরুষ। প্রকৃত জ্ঞানীরা মূর্ত্তির আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। বরং এব্রাহিম দাউদ মুশা ঈশা মহোম্মদ এবং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শৌনক কবীর দাদু, জনক নানক যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস প্রভৃতি ভারতের বৈদিক আর্য্য ঋষিরা এবং পৌরাণিক ভক্তগণ ইহার প্রতিবাদই করিয়া গিয়াছেন। কয়টা মূর্ত্তি আমার তুমি গড়িবে? দুই একটা কিম্বা পাঁচটা দশটা মূর্ত্তি কি আমার সমস্ত জ্ঞান শক্তির মূর্ত্তিমান আকার হইতে পারে? মূর্ত্তি করিতে গেলে অনন্ত মূর্ত্তি গড়িতে হয়। আর ঠাকুরঘরে একটী মূর্ত্তি রাখিলে কার্য্যক্ষেত্রে বিদেশে পথে রোগ এবং মৃত্যুশয্যায় তোমার দশায় কি হইবে? সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি গলায় বাঁধিয়া কি ফিরিবে? কোথায় আমি জ্ঞান-স্বরূপ, ইচ্ছাময়, আনন্দময়, প্রাণের প্রাণ, জীবনী শক্তি, আর কোথায় খড় দড়ি কাঠ পাথর মৃত্তিকার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণবিশিষ্ট স্থানকালে-বদ্ধ এক চিত্রিত প্রতিমা! জ্ঞান এবং মৃত জড় দুই যে সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ! উভয়ের

স্বরূপত্বে যে প্রকৃতিগত গভীর প্রভেদ! দেহধারী মানবের সহিত ব্যবহারে যে জীবন্ত প্রত্যক্ষ সত্য লক্ষিত হয় তাহাও এখানে নাই।

শিষ্য। প্রতিমা মৃত জড় তাহা মানি এবং জানি, কিন্তু তুমিত সর্ব্বব্যাপী পরম চৈতন্য তাহাতে আছ। আমার এই দেহওত জড়, তুমি এ দেহমন্দিরে কি বিরাজ করিতেছ না? আমরা তোমাকে প্রাণরূপে তেমনি জড় মূর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিলাম, এবং প্রস্তর মৃত্তিকা দারু মূর্ত্তির দৃশ্যমান আধার উপলক্ষে তোমাকে সহজে এক জন ব্যক্তিরূপে সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, বেশত স্থবিধা। তুমি ত কল্পনারও অতীত, অথচ তোমার সংক্রান্ত যত কিছু জ্ঞান ভাব সমুদয়ই উপমা এবং কল্পনা-সাহায্য-সম্ভূত।

আচার্য্য। সর্ব্বত্র চিরপ্রতিষ্ঠিত যিনি কল্পনায় তাঁহাকে পদার্থ বিশেষে প্রতিষ্ঠিত করার কোন অর্থ হয় না। যে প্রাণকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করিলে, অবশ্য তাহা জড় মূর্ত্তিতে ছিল না, মৃত জড়ে প্রাণ সঞ্চার করিবার ক্ষমতা আমা ভিন্ন আর কাহারো নাই; এ স্থলে তোমার বিশ্বাস বা কল্পনা হইতে তাহার উৎপত্তি। প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিশ্বাসবলে সেই প্রাণকে তুমি আপনাতে আরো স্পষ্টরূপে নৈকট্য ভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত দেখ না কেন? আমি প্রাণময়রূপে তোমার প্রাণ পোষণ করিতেছি, সেই জন্য তুমি প্রাণী; জড়ে তাহা কল্পনাবলে আরোপ না করিয়া ইহার পূর্ব্বেই আমি যে তোমাতে চির-প্রতিষ্ঠিত মূলাধার এবং প্রাণরূপে বর্ত্তমান আছি তাহাই উপলব্ধি কর। মৃত জড় চেতনাবিহীন একটী বিশেষ বাহ্য মূর্ত্তি তাহার জন্য কি প্রয়োজন? মনে মনে ত জান, সে যেমন জড় তেমনই আছে। তাহাকে দেখা কিম্বা পাওয়া মানে আমাকে দেখা অথবা পাওয়া নয়। তোমার চক্ষু দ্বারা তাহার চিত্র বিচিত্র দৃষ্টিহীন অন্ধ চক্ষু, বাক্যহীন মুখ ও বলহীন গতিশক্তিবিহীন হস্ত পদ জিহ্বা দেখিলে এবং নিজ হস্ত দ্বারা তাহার জড়দেহ স্পর্শ করিলে, তাই কি আমাকে দেখা হইল? প্রতিমার মুখ হইতে কি কোন আশীর্ব্বচন শুনিতে পাও? এই জন্যই বলিতেছিলাম, জীবের যত দিন দেহাদিতে আত্মবোধ, সে পর্য্যন্ত আমাকে দেহরূপেই তাহারা দেখিতে চায়।

শিষ্য। বাহ্যাবলম্বন আবশ্যক, ইহাত তুমি বলিয়াছ।

আচার্য্য। বলিয়াছি সত্য, কিন্তু কোনরূপ বাহ্য বিষয়ে বদ্ধ থাকিতে কিম্বা

সৃষ্টকে স্রষ্টা, মৃতকে চৈতন্য, উপায়কে উদ্দেশ্য জ্ঞান করিতে বলি নাই। যাহা কিছু কর, এইটী জানিও ; আমার জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাবের সহিত তোমার জ্ঞান ইচ্ছা ভাবকে মিলাইতে মিশাইতে হইবে ; উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ চতুর রাজনৈতিক্‌দিগের বৈষয়িক সম্বন্ধ নহে। কুটুম্বিতার সম্পর্কও নহে। উপাসক যে অপূর্ণ দুর্ব্বল মলিন কলঙ্কিত চিরকাল সে তাই রহিয়া গেল, অথচ আমি পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক স্বতন্ত্র ভাবে দূরে রহিলাম, সেরূপ পূজা উপাসনায় ফল কি? উপাস্য দেবের দেবগুণে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করাই উপাসনার একমাত্র উদ্দেশ্য জানিবে। আমি একটী অনন্ত মঙ্গলময় অভিপ্রায় ; অনন্ত বলশালিনী মহা শক্তি এবং অনন্ত গভীর জ্ঞান, এবং পূর্ণ পবিত্র পুরুষ বা ব্যক্তি ; খড় দড়ি মৃত্তিকা প্রস্তর দারু প্রভৃতি মৃত পদার্থের সাহায্যে এ সকলের ধারণা হয় না ; জীবের জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা দ্বারা আমার জ্ঞান প্রেম ইচ্ছার ধারণা ও মিলন হয়। সেখানে কোন বাহ্য ব্যবধান সাহায্যরূপে থাকিতে পারে না।

শিষ্য। তবে কি প্রতিমা পূজা, গুরুপূজা, কিম্বা অবতারদিগের বাহ্যৈশ্বর্য্য বিভূতি দর্শনজন্য যে ভক্তির উদ্গম হয়, তাহা কবিত্ব কল্পনাজনিত সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র ?

আচার্য্য। অধিকাংশই তাই। উহা ভক্তিভাব উদ্দীপক বাহ্য পদার্থ মাত্র, তাহাতে কেবল ভাব চরিতার্থ হয় ; কিন্তু জ্ঞান এবং চরিত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য না হইলে কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। ইহা এক প্রকার নাট্যাভিনয় কিম্বা স্বপ্নদর্শন বিশেষ। যাবতীয় কর্ম্ম জ্ঞান এবং ভক্তি সিদ্ধির জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই জন্য কর্ম্মের পর জ্ঞান, তার পর ভক্তিসাধন। কর্ম্মযোগ অপরিহার্য্য হইলেও উহা প্রথমে উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নহে ; পরে উহা সিদ্ধ জীবনের নিদর্শন। যে সকল বাহ্যাবলম্বনে অন্তর্ম্মুখগতি এবং জ্ঞানযোগ বৃদ্ধি হয়, তাহাই তুমি নির্ব্বাচন করিয়া লও।

অবশ্য নির্গুণ ব্রহ্ম একটা শব্দ মাত্র। সত্তা ও স্বরূপে মিলিত অখণ্ড একটী ব্যক্তির উপর বিশ্বাস না জন্মিলে মানুষ পূজা করিতে পারে না। কিন্তু সে ব্যক্তি মানে কি একটা জড় অচেতন মূর্ত্তি, না ছবি ? আমার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাময় এক পুরুষ ; তুমি জীব, তুমিও ঐ সকল গুণময় এক ব্যক্তি ;

পরিমাণে কেবল ক্ষুদ্র। এই দুই নিরাকার চৈতন্যময় পুরুষের মধ্যে পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, সেব্য সেবক এবং আশ্রয় আশ্রিত ভাবে যে মিলন এবং মিশ্রণ ইহাই প্রকৃত উপাসনা।

শিষ্য। অনেক জ্ঞানী অধ্যাপক পণ্ডিতও দেখিতে পাই, প্রতিমাপূজাদি বাহ্যানুষ্ঠান করেন, এবং প্রাচীন শাস্ত্রবচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সাহায্যে আধুনিক কৃতবিদ্য সমাজ প্রচলিত উপধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করেন।

আচার্য্য। তাহার নিগূঢ় অভিপ্রায়ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের জীবিকার সহিত উহার যোগ আছে, জ্ঞানী যজমানদিগেরও সুবহু পার্থিব সুখ স্বার্থের সহিত উহা জড়িত। অন্ধভক্তি ও সরল বিশ্বাসের অধীন অজ্ঞান জনসাধারণ, স্ত্রী শূদ্র এইরূপ পূজা ভিন্ন আর কিছু জানে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত দল অধিকাংশ এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী এবং কপটাচারী। তাহারা ভিতরে এক, বাহিরে অন্য প্রকার। বরং সরলচিত্ত অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ নরনারীর এরূপ পূজানুষ্ঠানে একটা দৈবনির্ভর ধর্ম্মভয় থাকে এবং তাহা দ্বারা অপেক্ষাকৃত তাহাদের চরিত্র ভাল হয়; কিন্তু জ্ঞানপাপী অতিবুদ্ধিমন্ত বিদ্যাভিমানীর এই লোকরঞ্জন কপট ব্যবহার স্বাভাবিক ধর্ম্মভয়ের সাংঘাতিক শত্রু। দেবতার দৈববল ক্ষমতা কর্ত্তৃত্ব তাহাদের বিদ্যাবত্তা বহুদর্শিতার নিকট নিতান্ত যেন উপহাসের বিষয়, অথবা বৃদ্ধ পিতামহীর কথিত গল্প বিশেষ।

কর্ম্মযোগ—ষষ্ঠ অধ্যায়। বিরাটরূপ দর্শন।

নির্জ্জনবনবাসী জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বী সদানন্দের মুখে পূর্ব্বোক্ত অভিনব গভীর শাস্ত্রবচন শ্রবণে তদীয় পুত্র চিদানন্দ অতি মাত্র বিকসিতচিত্ত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে বলিলেন, "পিতঃ! নবযুগধর্ম্মের অনন্ত কল্যাণময় এই নবগীতার যে সকল নবীন ব্যাখ্যা আমি শ্রবণ করিলাম, তাহা অতিশয় অভূতপূর্ব্ব সন্দেহ নাই; কেন, না, তচ্ছ্রবণে আমার অন্তরাত্মার গূঢ় বিজ্ঞানময় কোষ সহজেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল; কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। ভগবান অনন্তদেব শ্রীজীবকে যে সাকার নিরাকার মীমাংসার কথা বলিলেন, তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের

সঙ্গত হইলেও তাহাতে আমি সম্যক্ চরিতার্থতা অনুভব করিতে পারিতেছি না।"

স্বামী পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন, "হে তাত! সাকার নিরাকার সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার ব্যাখ্যা বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"জীবানন্দ যখন স্বয়ং ভগবান অনন্তদেবের মুখে শুনিলেন, 'আমি আমার ভক্তকে অব্যবধানে আনিয়া আত্মস্থ করিব, কোনরূপ বাহ্যালম্বনে তাহাকে আবদ্ধ বা আসক্ত থাকিতে দিব না; যে আমাকে ভক্তি করে, সে নিশ্চয়ই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।' তখন তিনি অনন্ত চিদাকাশে চিদ্বিন্দুবৎ আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিলেন। এবং সহসা তাঁহার অন্তঃকরণে নিরবলম্ব যোগের আভাস প্রতিভাত হইল। ব্যক্তিত্ববিহীন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, নির্গুণ তুরীয় সত্তার অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে পড়িয়া জীব তখন বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যে দাঁড়াইবার আশ্রয় চাই! ধরিবার অবলম্বন চাই! আমি জননীর কোল চাই! প্রভুর পদারবিন্দ চাই!' এই বলিতে বলিতে তিনি মহাযোগনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর তাঁহার জ্ঞান এবং চর্ম্মচক্ষের পুরোভাগে হঠাৎ অনন্তের বিশ্বমূর্ত্তি প্রকটিত হইল।

"অনন্তর বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে প্রমত্তের ন্যায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি এ সব কি দেখিতেছি! প্রকৃতির বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া কাহার মহিমা গুণ সকল শতধা প্রকাশিত হইতেছে! হে বিশ্বদেব, এ সব কি তুমি নও? পূর্ব্বে তোমা ব্যতীত আর ত কিছুই ছিল না, কেবল অনন্ত অন্ধকারময় আকাশে একা তুমিই থাকিতে, তদনন্তর তোমার ইচ্ছায় তোমা হইতেই ঊর্ণনাভি যেমন ঊর্ণাজাল উদ্গীরণ করে, তদ্বৎ এই সাকার ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইল। তুমি কেবল নিমিত্তকারণ নহ; মূল কারণ, উপাদানকারণ; তবে তোমার সঙ্গে এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের প্রভেদ কি, এবং কোথায়? দৃশ্যমান জড়ই বা কি, আর অদৃশ্য চৈতন্যই বা কাহাকে বলি? অনন্ত ভাগে বিভাজ্য পরমাণুকে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মাংশে যতই বিভাগ করি ততই দেখি উহা অদৃশ্য নিরাকারে লয় হইয়া যায়; যদিচ শক্তির আধার এই পরমাণু, কিন্তু ইহার মূল দেশে অবতরণ করিলে এক অনন্ত চৈতন্যময়ী তোমার ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন আরত কিছুই দৃষ্ট হয় না। মৃত উপাদানের মিশ্রণে কিরূপে জীবনীশক্তি

উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে জ্ঞান বিবেক ইচ্ছাই বা কিরূপে জন্মিল, ইহা ভাবিয়া আমি বিপুল বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি, আমাকে উদ্ধার কর। জড় চৈতন্যে মিশ্রিত এই দৃশ্যমান বিশ্ব, হে বিশ্বাত্মা পরমপুরুষ, তোমারইত বিরাট দেহ! ইহার ভিতর আমি কি, জগৎ কি, তুমিই বা কি? একে তিন, তিনে এক; এক হইতে বহু, আবার বহু হইতে এক। হায়! তবে আমি স্বতন্ত্র কেবল নামমাত্র; মূলে সবইত দেখিতেছি তুমি। দেহ-যন্ত্রের তুমিই যন্ত্রী, আবার আত্মারথের তুমিই সারথি। কর্ম্ম এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তোমার অপরোক্ষ শক্তিতে নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করিতেছে; মনোবুদ্ধি বিবেক বিজ্ঞানেরও পরিচালক তুমি। দিব্যজ্ঞান, প্রেম ভক্তি, বিশ্বাস বৈরাগ্য যাহা কিছু, :ইহার কোনটীই তো আমার বলিয়া বোধ হয় না। আমি নিজেও আমার নই। তবে "আমি" "আমার" ইত্যাকার অহংজ্ঞান কি ভূত প্রেতের লীলা খেলা? হায়! সব একাকার নৈরাকার হইয়া গেল! সর্ব্বত্র কেবল এক তোমারই একত্বের আধিপত্য।

"জীবের জ্ঞান এবং ভাবের মহামত্ততা দেখিয়া পরমগুরু বিশ্বকর্ত্তা বলিলেন, "সহজজ্ঞানে যাহা কিছু তোমাতে অভ্যুদিত হইতেছে মূলতঃ তাহা মায়া কিম্বা অলীক নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার গভীর তাৎপর্য্য আছে। আমি আদিকারণ সর্ব্বমূলাধার হইলেও জীব, জগৎ, আমি এই তিনের কার্য্যবিভাগ, কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তিত্বের বিশেষ দায়িত্ব সীমা আছে, সৃষ্টির বিশেষ নিয়তি আছে; আবার যাবতীয় বিশ্বকার্য্যের মূলে আমার কর্তৃত্বও আছে; ইহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের অচ্ছেদ্য এবং নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমি সৃষ্টির অতীত এবং অন্তর্গত। অল্পে অল্পে এ সকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে।"

অনন্তর দেববাক্যের জ্বলন্ত প্রভাবে আলোকিত হইয়া শ্রীজীব এই রূপে বিশ্বমূর্ত্তির স্তব করিতে লাগিলেন;—"হে অদ্ভুতকর্ম্মা বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট পুরুষ, আমি তোমায় ধারণা করিতে না পারিয়া তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভিতরে লয় প্রাপ্ত হইতেছি। জড় চৈতন্য, সাকার নিরাকার সকলই যে একাকার হইয়া গেল, আমি তবে তোমায় এখন কি বলিয়া সম্বোধন করিব? দৃশ্যমান বিশ্বের অনন্ত বিচিত্রতার গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্যের অন্তরালে এক অখণ্ড মহাজ্ঞান মহাপ্রাণরূপে তুমি বিরাজ করিতেছ, তোমায় নমস্কার। ভূলোক

দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই তোমাতেই পরিপূর্ণ। হে পূর্ণ পরব্রহ্ম, আমি তোমায় দণ্ডবৎ প্রণিপাত করি। তুমি এ সকলের মধ্যে কি, এবং কি নও; তুমি এবং তোমার বিভূতির ভিতরে পার্থক্য কোথায়; ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতেছি, তুমি আমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান কর। হে অচ্যুত অখণ্ড, হে দুরারাধ্য, হে বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা, আমি সৃষ্ট হইতে স্রষ্টাকে স্বতন্ত্ররূপে বুঝিতে পারিতেছি না, আমাকে তুমি বুঝাইয়া দাও। হে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বাসুদেব, তুমি মহাতেজঃপুঞ্জ জ্বলদগ্নির ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ, তোমাতেই লোকসকল স্থিতি করিতেছে; দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের গতিশক্তি এবং রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের মধ্যে তুমি প্রাণরূপে এবং অদৃশ্য অন্তর্জগতে আত্মচৈতন্যের অভ্যন্তরে অনন্তচৈতন্য রূপে বিরাজ করিতেছ। হে মহাদেব, মহেশ্বর, আমার স্তুতিবাদ তুমি গ্রহণ কর। হায়! সকলি যদি হইলে তুমি, তবে আমি কে? কাহাকে আমি "আমি" বলিতেছি? তাহার কর্ত্তৃত্বের আরম্ভ এবং তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তৃত্বের শেষ এবং উভয়ের প্রভেদ রেখা কোথায়? আমার সীমাবদ্ধ কর্ত্তৃত্বের অন্তরালেও তোমাকেই আদি শক্তি পরম কারণরূপে দেখিতেছি। ফলে আমার আমিত্বও তুমি; তবে আমি কি কেবল উপাধিভেদ মাত্র? যদি তাই হয়, তবে আমিও তোমাতে লয় হইয়া যাই। সকলি তন্ময়! ব্রহ্মময়! আমার আমিত্ব এখন কেবল শিক্ষা সাধন এবং তোমার লীলাবিকাশ জন্য। ধন্য দেব! ধন্য তোমার লীলা খেলা!

কর্ম্মযোগ—সপ্তম অধ্যায়। ভগবদ্বন্দনা।

বিজ্ঞানপিপাসু সাধু যুবা চিদানন্দ বিশ্বমূর্ত্তির স্তব শুনিয়া প্রথমে রোমাঞ্চিত, পরে স্তম্ভিত হইলেন, তদনন্তর বলিয়া উঠিলেন, "এ যে সেই প্রাচীন অদ্বৈত-বাদের সোঽহংজ্ঞানের মত বোধ হইতেছে! ইহাই কি সাকার নিরাকারের মীমাংসা? সবই যদি একাকার অখণ্ড অদ্বৈত, তাহা হইলে মনুষ্যের ব্যক্তিত্বই বা কোথায় রৈল, এবং তাহার কর্ত্তব্য পালন ও ভজন সাধনেরই বা প্রয়োজন কি?"

পুত্রের তাদৃশ সংশয়যুক্ত প্রশ্ন শ্রবণানন্তর প্রশান্তাত্মা প্রাচীন তপস্বী সদানন্দ বলিলেন, "বৎস, যাহা সত্য তাহা প্রাচীন এবং চির নবীন। প্রাচীন মত বলিয়া সহসা উপেক্ষা করিও না। আপাততঃ আধ্যাত্মিক অভেদবাদ কিম্বা জড়াদ্বৈতবাদের মত যাহা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহার গভীর তাৎপর্য্য আছে; শক্তিতত্ত্ব এবং জড়তত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে এই গভীর রহস্যময় দুর্ব্বিগাহ্য অদ্বৈতবাদের ভিতরে তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে। শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া যাও, অধীর হইও না; চঞ্চলমতি, স্থূলদর্শী পল্লবগ্রাহী আধুনিকেরা কোন একটা প্রাচীন মত শুনিয়া চমকিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের বিচারের আদর্শ কি? নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিকেই তাহারা আদর্শ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং বিচারাদর্শে যদি ভুল থাকে, সকলই ভুল হইবে। অদ্য যাহা সত্যরূপে সিদ্ধান্ত করিল, কল্য তাহাকে তাহারা আবার ভ্রান্তি মনে করিবে। সত্যজ্ঞান ধারণেরও ক্ষমতা থাকা চাই। যিনি জ্ঞান তিনিই জ্ঞানী; এবং জ্ঞানদাতা শিক্ষাগুরু হইয়া আবার তিনিই বুঝাইয়া দেন এবং জীবোপাধির ভিতরে থাকিয়া বুঝেন। শিষ্য তাঁহারই প্রদত্ত জ্ঞানে তাঁহাকে বুঝিতে পারে। কেবল লীলা ভিন্ন এ আর অন্য কিছুই নয়।"

"অনন্তর প্রকৃতির পটে উদ্ভাসিত পরম পুরুষ অনন্তদেবের অখণ্ড জ্বলন্ত সত্তার জীবন্ত প্রভাবে অভিভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এবং ব্যক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব এবং উদ্দেশ্য অবলোকন করতঃ শ্রীজীব বলিতে লাগিলেন, "হে অনন্তমূর্ত্তে! কত রূপেই তুমি কত স্থানে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছ! তোমার গভীর অভিপ্রায়, মঙ্গল কৌশল, বিচিত্র সৌন্দর্য্য, নিগূঢ় নিয়ম, এবং অদ্ভুত জ্ঞানগরিমায় সমস্ত বিশ্ব যেন জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছে। ঐ যে হিমানীরঞ্জিত অভ্রভেদী মহোচ্চ বিশালবপু গিরিশৃঙ্গ সকল, হে বিশ্বম্ভর বিশ্বাধার! তোমার ভীম-স্কন্ধোপরি সংস্থাপিত ঐ অটল হিমাদ্রি কি সামন্য মৃত জড় পদার্থ? আর ঐ যে দিগন্তপরিব্যাপ্ত অসীম জলধির উত্তাল তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জন, উহা কি অর্থহীন বৃথা শব্দ মাত্র? নিশ্চয় তাহাদের ভিতরে থাকিয়া তুমি কি সব কথা বলিতেছ। হায়! আমি তোমার সুগম্ভীর মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না, আমাকে বুঝাইয়া দাও। বিশ্বের বিপুল সমারোহ দর্শন

এবং মহান কার্য্যকোলাহল শ্রবণে আমার চক্ষু অন্ধবৎ, কর্ণ বধির প্রায়, চিত্ত আন্দোলিত; যেন বিশালবক্ষ অনন্ত মহাসমুদ্রের বজ্রনাদী অবিশ্রান্ত তরঙ্গের আঘাত প্রতিঘাতে আমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছি, আমাকে তোমার মৃদু মধুর দৈববাণী শুনাইয়া সুপথে লইয়া চল। নিবিড় ঘন নীরদে সমাচ্ছন্ন অনন্ত নীলাম্বরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিজলীমালা ছুটি-তেছে এবং তৎসঙ্গে ভীম ভৈরব রবে যে অশনিনিনাদ দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে ইহার ভিতরে কি আমি তোমার শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমের পরিচয় পাইতেছি না? অহো! এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক ক্রিয়া সকলের কি জীবন্ত মাহাত্ম্য! মহাপ্রভঞ্জনের ভীম আস্ফালনে জলধিজল উদ্বেলিত হইয়া দিগ্বিদিক প্লাবিত করিতেছে, ভীষণ ভূকম্পনে বিশাল মেদিনী আন্দোলিত হইতেছে, দিগন্তব্যাপী ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি অবিরল ধারে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, মহাবনে দাবানল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে; জল-প্রপাতের গভীর নির্ঘোষ, উল্কা পিণ্ডের সমুজ্জ্বল আলোক, স্রোতস্বতীর দুর্জ্জয় প্রবাহ, আগ্নেয়গিরির অনলোচ্ছ্বাস, মরুভূমির জ্বলন্ত উত্তাপ, এবং তপনতাপিত হিমশিলার প্রভূত সংঘর্ষণে হে ভূতভাবন বিশ্বপতি তোমার মহিমা পরাক্রম, মহালীলা দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত, মন স্তম্ভিত হয়। নিশ্চয় এই সকল বৈদিক উপাস্য দেবতাগণ কেবল তোমারই অধিষ্ঠান প্রযুক্ত এত মহিমান্বিত এবং প্রভাবশালী।

আহা মরি মরি! আবার কুসুমিত নিকুঞ্জকাননে বসিয়া হে বনদেবতা, ফুলের হাসিতে কেমন তুমি তোমার মধুর হাসি লুকাইয়া রাখিয়াছ। উহার মধুর গন্ধে তোমার দেবগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে, এবং উহার হাসি এবং বিচিত্র বর্ণে তোমার হাসি এবং অপরূপ লাবণ্য ভাসিতেছে; তোমায় আমি নমস্কার করি। তটিনীতটবিহারী জলসিক্ত মৃদু সমীরণহিল্লোলে আমার প্রাণ কেন সহসা এমন উল্লসিত হইল! অস্ফুট স্বরে কানে কানে পরম সুহৃদের ন্যায় উহারা যেন কি কথা বলিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। এই স্নিগ্ধ সমীরণ তোমার পরিচারিকা, আমাদের মাতৃস্বরূপা; ইহা কোথা হইতে আসে, কোথায় যায় তাহা কেবল তুমিই জান। ঠিক যেন জননীর সুশীতল বক্ষের স্পর্শসুখ আমাকে ঘুম পাড়াইয়া দিতেছে। এই সুবিমল মারুতের স্নিগ্ধকর

স্নেহালিঙ্গনে আমার সকল সন্তাপ বিদূরিত হইল, প্রাণ জুড়াইল; দেবী, হে মহাদেবী, ইহা কি অক্সিজন্, হাইড্রোজন, নাইট্রোজন তিনটী পরমাণুর ক্রিয়া মাত্র? পরমাণুত্রয় পরামর্শ করিয়া কি এমন সুখকর বায়ুমণ্ডল রচনা করিয়া রাখিয়াছে? জল বায়ু অগ্নির মধ্যে আহা! কেমন সুন্দর মঙ্গল তোমার অভিপ্রায় সকল দেখিতে পাই। যদিও ইহারা মৃত জড় পরমাণুর সংযোগ ফল, কিন্তু তোমার জীবন্ত অনন্ত চৈতন্যের স্বচ্ছ আবরণ স্বরূপ,—আমাদের এক একটী মূর্ত্তিমান বন্ধু এবং সেবক। ভৌতিক পদার্থ নিচয়ের অভ্যন্তরে দয়াময়ী মা, তুমি নিশ্চয় বিচরণ করিতেছ, আমি তোমার শ্রীচরণে প্রেমভরে বারম্বার অবলুণ্ঠিত হই। অদূরে ঐ হরিদ্বর্ণ নয়নরঞ্জন বনভূমির কি শান্তিপ্রদ মনোহর শোভা! লতাজড়িত আশ্রয় পাদপরাজী সুরসাল সুপক্ক ফলে সজ্জিত হইয়া জীবদিগের জন্য উদার সদাব্রত উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহারা আপনাদের সুশীতল ছায়ায় এবং শাখায় আগন্তুক প্রাণীপুঞ্জকে আশ্রয় দান করতঃ সুমধুর সুপক্ক ফল দ্বারা কেমন যত্নে সেবা করে! প্রকৃতির এ অতিথিশালায় কি কেবলই উদ্ভিদের বসতি? এখানে কি আত্মা নাই? না ঠাকুর, ইহাও তোমারি লীলাধাম। বনে উপবনে, প্রান্তরে, গিরিকন্দরে, নদীতটে তুমি কতই জলসত্র অন্নসত্র স্থাপন করিয়া রাখিয়াছ! ধন্য দেব! তোমাকে ধন্যবাদ করি। হে পিতা, হে মাতা, গিরিপ্রস্রবণের শীতল জলে আমার পিপাসু কণ্ঠ, সন্তপ্ত দেহ তুমি সুস্নিগ্ধ করিলে, ফল শস্য দানে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলে, হে পরম তৃপ্তি, হে বিশ্বধাত্রী জননী, আমি তোমায় প্রণিপাত করি। আহা! এই রত্নগর্ভা স্বর্ণপ্রসূ পদদলিত ভূখণ্ডের কি অদ্ভুত মহিমা! কত দিন হইল উহা নীরবে মাতৃদেবীর ন্যায় স্নেহবক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক কেবলই রাশি রাশি উপাদেয় ফল শস্য বিতরণ করিতেছে, কিছুতেই বৃদ্ধা বা নিষ্ফলা হয় না। এই ধূলি কণার মূল্য কি সামান্য! কত কত ভূপতি, সম্রাট ইহার জন্য নরশোণিত পাত করিয়াছে, বহুল অত্যাচারে বসুন্ধরাকে তাহারা নরকবৎ করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি চির প্রসন্নবদনা ঐ ভূমিখণ্ড কাহারো প্রতি নিষ্ঠুর নহে। সম্রাটের বিপুল সম্পদে পূর্ণ বিচিত্র বিভূতিময় রাজপ্রাসাদ বল, আর তাঁহার অশ্ব গজ রথ এবং রত্নমণিখচিত বস্ত্রালঙ্কার ভোগ ঐশ্বর্য্যই বল, রাজা ও রাজপুরুষগণের মান সম্ভ্রম সুখ বিলাস সমস্তই ঐ ধূলিকণা হইতে প্রসূত। উহার অভ্যন্তরে আবার কত রত্নখনি,

কত সুশীতল নির্ম্মল জলের প্রস্রবণ, কত দাহ্যমান অঙ্গারের বিস্তৃত শয্যা! ঠাকুর তোমার কি সুন্দর সুব্যবস্থা! এই সুন্দর সুরসাল বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত ফুল ফল শস্যের বিবিধ রসাস্বাদে তোমার কি মাতৃস্নেহ এবং মধুর ভালবাসারই পরিচয় দিতেছে! নতুবা এত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? হে বিজ্ঞানাত্মা পরম পুরুষ, অনন্ত কৌশলময় এই জগৎ, তাহার অন্তর্গত জড়, ধাতু, উদ্ভিদ প্রাণী মনুষ্য-জাতি সৃষ্টিচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কত অদ্ভুত ভোজবাজীই দেখাইতেছে! জড় কিরূপে জীবনে, জীবন কিরূপে জ্ঞান চৈতন্যে, আর চৈতন্য কিরূপে বিবেক আত্মা, হৃদয়ে পরিণাম প্রাপ্ত হইল তদ্বিষয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ ভাবিয়া ভাবিয়া শ্রান্ত হইলেন, তথাপি উহাদের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের গ্রন্থি কোন্ স্থানে তাহা কেহ দেখিতে পাইলেন না। জড় পদার্থের বিচিত্র বিমিশ্রণে চক্ষের সম্মুখেই তুমি জীবন উৎপন্ন করিলে, অথচ কেন হইল, কিরূপে হইল তাহা তুমি বুঝিতে দিলে না। সেই জীবনের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে আবার আত্মচৈতন্য বিবেক বুদ্ধি মানবহৃদয় উৎপন্ন হইয়া তোমারই স্বরূপ লক্ষণ সকল প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু এ সমস্তই চর্ম্মচক্ষু ও জ্ঞানচক্ষের অগোচর। কি জীবন্ত তোমার লীলা! স্বয়ং এই বিশাল বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী হইয়া তুমি ইহাকে মহাবলে বিঘূর্ণিত করিতেছ, আর তাহা হইতে নানাবিধ অদ্ভুত কর্ম্মফল উৎপন্ন হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নীরবে হে অনির্ব্বচনীয় দেবতা, তোমাকে আমি বার বার প্রণিপাত করি।

নাথ, আকাশের ঊর্দ্ধদেশে হীরকখচিত মুক্তামালার ন্যায় ও সকল কি! আহা আমার বড় ইচ্ছা হয়, ঐখানে উড়িয়া যাই, গিয়া দেখি, তথায় তুমি কি লীলা করিতেছ। আকাশের উপর মহাকাশ, স্বর্গের উপর অনন্ত স্বর্গ, সৌর ব্রহ্মাণ্ডের উপর অযুত অগণ্য সৌর জগৎ, অহো! এ সব যে আমি আর ভাবিতে পারি না। কল্পনা যেন স্বীয় পক্ষপুটে আমাকে উড়াইয়া লইয়া কোথায় কোন্ উচ্চ গগনের দিকে টানিয়া তুলিতেছে। ওখানে যেন অগণ্য অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রকান্তি অমর মানবাত্মা সকল অতি অপূর্ব্ব দেবসভা সাজাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। উহারা কোন কালে আপনাদের কক্ষভ্রষ্ট হয় না; মহাবেগে নিরন্তর ঘুরিতেছে, অথচ ভুলিয়াও কাহারো গায়ে কেহ পড়ে না। অনন্ত শূন্যে কিসের আক-র্ষণে উহারা নিজ নিজ পথে স্থির রহিয়াছে? তুমি নিজেই ধরিয়া রাখিয়াছ,

আর কে রাখিবে? যেন বালকের ন্যায় কন্দুক ক্রীড়া করিতেছ। কিন্তু ইহাদের দ্বারা তুমি তোমার কত যে গূঢ় অভিপ্রায় সংসাধন করিয়া লইতেছ, তাহা কে বলিবে? এ সব আমি আর কিছু বুঝিতেও চাহি না, ভূমিষ্ঠ হইয়া নীরবে তোমায় কেবল বার বার প্রণাম করি। আকাশে মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ, তদূর্দ্ধে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা, ভূতলে দাবানল, অন্তরীক্ষে উল্কাপিণ্ড, ভূগর্ভে জ্বলন্ত দ্রব ধাতু, অতলস্পর্শ জলধিজলে বাড়বানল, প্রতি পরমাণুতে উত্তাপ, সমস্ত বিশ্ব যেন জ্যোতির্ম্ময়, অগ্নিময়; হে সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র, কৃতাঞ্জলিপুটে আমি তোমার পদে প্রণত হই।

করুণাময়, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের জীবন মরণের মধ্যে তোমার কত আশ্চর্য্য লীলাই প্রকাশ পাইতেছে! এমন চিত্র বিচিত্র সুন্দর করিয়া তুমি তাহাদিগকে কেন সাজাইয়াছ কিছুই বুঝিতে পারি না, কিন্তু দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হই। জড় ধাতু উদ্ভিদ ইতর প্রাণী ইহারা কেহ কথা কয় না, অথচ এমনি নিয়মে কাজ করিতেছে যে তাহার ভিতর তোমার জ্ঞান কৌশল মঙ্গল অভিপ্রায় অতি সুস্পষ্ট। লীলাময়, চর্ম্ম চক্ষের সম্মুখে তুমি কত লীলাই দেখাইতেছ! হায়! আমি অতি হীনমতি ক্ষুদ্রাশয়, অন্ধ বধির, তোমার গভীর অর্থ বুঝিবার আমার ক্ষমতা নাই। কেবল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ যেন কেমন পাগলের মত হইয়া উঠে।

পিতা, মানব পরিবারের ইতিহাসে কি অদ্ভুত উন্নতিই তুমি প্রদর্শন করিলে! সেই অরণ্যচারী গিরিগুহাবাসী বন্য পশুবৎ মানবের বংশে কি না শেষ দেবতার অভ্যুদয়! সহসা দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন কালবশে আপনাপনি এ সব হইয়া পড়িল। ধন্য দেব, তোমায় বলিহারী! কোথায় সেই কুজ্ঝটিকাবৎ উত্তপ্ত সূক্ষ্ম বাষ্পময় অনন্ত শূন্য, আর কোথায় এই বর্ত্তমান সুদৃশ্য প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড! সমস্তই তোমার ইচ্ছাশক্তির খেলা। প্রতি নিমেষে নিমেষে কত অগণ্য অসংখ্য পশু পক্ষী কীটাণু এবং নরশিশু জন্মিতেছে, আবার কত কোটী কোটী রাজা প্রজা দলে দলে মৃত্যুর করাল গ্রাসে প্রবেশ করিতেছে। হে বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ম্ভু সনাতন পুরুষ, কৈ আজও পর্য্যন্ত তোমার সৃষ্টিকার্য্যের ত একটুও বিরাম দেখিতেছি না! পুরাতন হইতে নূতন, মৃত্যু হইতে জীবন, ক্ষয় হইতে বৃদ্ধি, ভঙ্গ এবং গঠন নিরন্তরই চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেই পুরাতন মূল উপাদান কয়টীর

পুনরাবর্ত্তন ও যোগ বিয়োগ দ্বারা তুমি বিশ্বের চির নূতনত্ব এবং সজীবতা রক্ষা করিতেছ। রূপান্তর, ভাবান্তর, অবস্থান্তরে তাহারাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে এবং নিত্য নব নব বেশে অভিনয় প্রদর্শন করে। হে বিশ্বপ্রাণ, এ বিশাল বিশ্বযন্ত্রের তুমিই যন্ত্রী, তুমিই শক্তি, তুমিই অবলম্বন, তোমাকে নমস্কার। অতি অদ্ভুত তোমার লীলা! একদিকে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন, ভূকম্পন ঝটিকা ও যুদ্ধ বিবাদে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে; তাহাতে দেশ নগর পল্লী যেন রাক্ষস পিশাচ দৈত্য দানবের রঙ্গভূমির ন্যায় শ্মশান সমান; রোগ শোক দুঃখ কষ্টে পৃথিবীর কত শত ভূভাগ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; অপর দিকে ভবিষ্যতের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে কোটী কোটী জীব শূন্য ধরাধামকে সুখ সৌভাগ্য হাস্যামোদ এবং আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ করিতেছে। তোমার এই সমুদায় মহা কীর্ত্তি, হে অনন্ত কীর্ত্তে! দেখিলে রসনা অবাক হয়, মস্তক সহজেই তব পদতলে লুটাইয়া পড়ে।

আবার প্রতি মানবাত্মার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখি, ভিতরে যেন তোমার অনন্ত জ্ঞানের এক একটু স্ফুলিঙ্গ জ্বলিতেছে। যেন জীব চৈতন্যের কোটী কোটী দীপমালায় অন্তরাকাশ সর্ব্বদা সমুজ্জলিত। বাহিরে যেমন অনন্ত নীলাম্বরে জ্যোতিষ্কগণ নিজ নিজ কক্ষে তোমার উদ্দেশ্য সাধন করে, তেমনি অমরাত্মা মহাজনেরা চিত্তাকাশের এক একটী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। এই বিস্তীর্ণ মনুষ্যসমাজ অনন্ত অগণ্য ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ, তাহার মধ্যস্থলে তুমি পরম পুরুষ, যেন তারকাবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র; তোমায় নমস্কার। প্রত্যেক নর নারীর জীবনপটে হে জগজ্জীবন, তুমি নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছ এবং তাহাতে কতই তোমার বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বিজ্ঞান দর্শন রচিত হইতেছে!

এই যে অখণ্ড অবিভক্ত সমগ্র মনুষ্যত্ব, ইহা তোমার এক অদ্ভুত জীবন্ত শক্তির প্রকাশ। ইহার নিয়তিকে কোথা হইতে কোন্ দিকে কত জটিল অবস্থাচক্রের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতেছ তাহার কিছুই আমি অবধারণ করিতে পারি না। প্রতি ঘটে ঘটে তোমার বিচিত্র লীলা বিহার হইতেছে তথাপি হায়! আমি তোমায় ধরিতে পারিতেছি না; দয়াময়, আমায় একটী বার ধরা দেও। ধন্য তোমায় যে, তুমি আমাকেও তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের

অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছ। প্রত্যেক মানবাত্মার স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ক্রমে ক্রমে শেষে তোমার অনতিক্রমণীয় মহা ইচ্ছার অধীন হইতেছে; তাই আমরা পশু হইতে মনুষ্য, মনুষ্য হইতে দেবতার উৎপত্তি দেখিতে পাই। তোমার এই সকল অত্যাশ্চর্য্য লীলাকৌশল ক্রীড়া কৌতুক দর্শনে হাসি পায়, প্রাণ পুলকিত হয়।"

অতঃপর ব্রহ্মর্ষি সদানন্দ স্বামী পুত্র চিদানন্দকে বলিলেন, "প্রিয় তনয়, শ্রীজীব কর্ত্তৃক ভগবানের মহিমা গান, স্তুতি বন্দনা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর; এ ভাবে ইতিপূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে দেখেও নাই, পূজা অর্চ্চনাও করে নাই। অতি অপূর্ব্ব এই ভগবদ্বন্দনা, ইহা শুনিলে হৃদয়গ্রন্থি সকল খুলিয়া যায়।

তদনন্তর মহাত্মা জীবানন্দ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্বাত্মা পরম পুরুষের বিপুল বিভুতি অনুধ্যান করত বিমোহিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "হে বিশ্বদেব, তোমার অনন্ত কীর্ত্তি, অদ্ভুত লীলারহস্যের অভ্যন্তরে বিচিত্র বিজ্ঞান-কৌশল, গভীর মঙ্গলাভিপ্রায় দর্শনে আমি বড় বিস্মিত এবং আমোদিত হইতেছি। এখন কি বলিয়া তোমার গুণ কীর্ত্তন করিব তাহা জানি না। স্তম্ভিত হইয়া নীরবে বসিয়া কেবল ভাবিব, না তোমার যশোগীত গাইব? ইচ্ছা হয় সহস্র মুখে তোমার গুণ গান করি। কি সুন্দর তোমার কৌশল, কি দুর্জ্জেয় তোমার সঙ্কল্প এবং কি দুর্ব্বিগাহ্য তোমার ক্রিয়াপ্রণালী! এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্তমধ্যে তুমি ওতপ্রোত ভাবে এমনি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছ যে কিছুতেই উভয়ের প্রভেদ বুঝা যায় না। কিরূপে এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত কারণরূপে তোমাতে নিদ্রিত ছিল এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে অনন্ত ভূত কালে তুমি একাকী কি করিতে, ইহা ভাবিতে গিয়া আমি যেন অকূল পাথারে ভাসিয়া যাই। তোমাকে নির্ব্বিকার মায়াবিমুক্ত রাখিবার জন্য পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিরা মায়াকে সৃষ্টির এক স্বতন্ত্র কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উপাধিবিশিষ্ট বিচিত্র জগতের প্রসূতি সেই মায়া, এইজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরও মায়িক ঈশ্বর। তুমি কেবল সঙ্গরহিত কূটস্থ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চৈতন্য, তোমাতে কোন সৃষ্টিবিকার সম্ভবে না। কিন্তু হে দেব, আমি তোমার বিকার অবিকার বুঝি না, এই জানি যে তুমি সর্ব্বমূলাধার আদি শক্তি। পূর্ণ অনন্ত তুমি, তোমার আবার বিকার কি? যাহার ক্রোধ এবং দয়া, প্রেম এবং অপ্রেম, সুখ

দুঃখ আনন্দ অভাব এবং পূরণ আছে তাহার পক্ষেই বিকার সম্ভব। তোমার পূর্ণ দয়া, পূর্ণ ন্যায়পরতা, অনন্ত অক্ষয় প্রেম এবং নিষ্কলঙ্ক পুণ্যপ্রভা, অসীম জ্ঞান এবং অপরিমেয় শান্তি একত্র মিলিত হইয়া বিশ্বরাজ্য প্রতিপালন করিতেছে, যাহার যতটুকু প্রাপ্য সে তাহা পাইতেছে, অলঙ্ঘ্য নিয়মে তোমার চিরমঙ্গল অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হইতেছে, হে নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প পুরুষ, তোমায় নমস্কার। মায়ার আশ্রয়দেবতা যদি তুমি হইলে, তবে সেই বিকারপ্রসবিনী মায়াওত তোমারই। উপাধিময় মায়াসৃষ্ট এই জগৎ অনিত্য বটে, কিন্তু ইহার অবলম্বন বিনা নিরুপাধি যে তুমি, তোমাকে কে জানিতে পারে? তুমি নির্গুণ কূটস্থ তুরীয় মহান, তুমিই আবার লীলাময় বিশ্বপ্রসবিতা। তুমি নির্গুণ, তুমিই সগুণ, আমি তোমায় বার বার প্রণিপাত করি।

আবার বলি, হে মহাদেব বিচিত্রকর্ম্মা, প্রতি ঘটে ঘটে তোমার গভীর অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে, ইহার এক একটী অসীম জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। আহা কি মধুর তোমার স্নেহ মমতা! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতে মাতৃবক্ষে দুগ্ধের সঞ্চার এবং হৃদয়ে অপত্য স্নেহ উৎসারিত করিলে। রক্তের ভিতর দুধ, মরুভূমি ও প্রস্তরের মধ্যে শীতল জল, মলিন পঙ্কে পদ্মফুল, আল্‌কাতরার মধ্যে চিনি, অঙ্গারের ভিতর হীরক। ধন্য তোমার মহিমা!

মানবজীবনে তোমার কি এক জীবন্ত অভিব্যক্তি! একবিধ উপাদানে নির্ম্মিত প্রতি জনের দেহ মন আত্মা, অথচ প্রত্যেকের জ্ঞান ভাব, ইচ্ছা রুচি, প্রবৃত্তি অভ্যাস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; আবার তুমি এক সর্ব্ব ঘটেই সমান। ব্যক্তিত্বের এই স্বতন্ত্রতাটুকু না থাকিলে মনুষ্যজগৎ শূন্য অন্ধকার, এবং জড় পাষাণ অন্ধবৎ থাকিত। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব কি তোমার অনন্ত কর্ত্তৃত্বের আভাস নহে? নর নারীর আত্মায় আত্মায় তোমারই জ্ঞানালোকের প্রতিবিম্ব ক্ষীণ দীপশিখার ন্যায়—খদ্যোতিকার ন্যায় জ্বলিতেছে, তাহার অনুজ্জ্বল মলিন আলোকের সাহায্যে তাহারা অর্দ্ধ অন্ধের ন্যায় জীবনপথে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। এই ক্ষীণ মলিন আলোকের ভিতর দিয়া তোমারই জ্যোতির্ম্ময় আলোকচ্ছটা ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে, হে জ্বলন্ত জ্যোতি, তোমায় নমস্কার। নিরাকার এই চৈতন্যকণা স্বরূপতঃ অদৃশ্য, অথচ তাহার ভাব রস, ইচ্ছা জ্ঞান সমস্ত কেমন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে

উদ্ভাসিত হয়! জড় চৈতন্যের পরস্পর কি মিলন উপযোগিতা! ইহারা বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইয়াও কার্য্যকালে যেন অখণ্ড একপ্রাণ। উভয়ে এমনি জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, এবং তুমি নিজেও তাহার সঙ্গে এমনি অভেদরূপে মিশিয়া আছ, যে পার্থক্য ভাবা যায়, কিন্তু এক হইতে অপরকে পৃথক্ করা যায় না। ঠিক যেন এক আশ্চর্য্য ভেল্কী বাজী। বিচিত্রতার ভিতর একতা, আবার একতার মধ্যে বহুল বিচিত্রতা। যখন বিচিত্রতা দেখি, তখন বহুর মধ্যে বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলি। আবার যখন মুদ্রিত নয়নে সকলের মূলে কেবল এক দেখি, তখন বিশ্বের সহিত তোমার সহিত আমি একত্বে পরিণত হইয়া যাই। আমার এই আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়াই সমস্ত জ্ঞানের উপলব্ধি। আমি আবার তোমাতে পরিপূর্ণ। বিশ্বে তুমি, তোমাতে বিশ্ব; এবং আমি সমুদয় বিশ্বের সহিত তোমাতে জীবিত রহিয়াছি। হে অখণ্ড্য অভেদাত্মা বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভর, আমাকে তুমি তোমার সঙ্গে সজ্ঞানে মিলাইয়া লও। কুসুমের সৌন্দর্য্য ও আঘ্রাণে, শিশুর মধুর হাস্যে, দম্পতীর নবীন প্রেমে, জননীর অপত্য স্নেহে, বন্ধুর অকপট প্রণয়ে, রাজার প্রভুত্বে, ভক্তের পবিত্র চরিত্রে; জড় জীব তরু লতা, রবি শশী গ্রহ তারা, মেঘ বিদ্যুৎ, নদ নদী পর্ব্বত, সরিৎ সিন্ধু, অনন্ত হিমানী, দুস্তর মরুভূমি, বন উপবন, উর্দ্ধে নিম্নে পার্শ্বে বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বত্রে এক তোমার আবির্ভাব দেখিয়া আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ তোমার এক একটী ক্ষুদ্র প্রজা, জ্ঞানী পণ্ডিতেরা তোমার বালক ছাত্র, সাধু ভক্তেরা তোমার শিষ্য, অসীম সৌর ব্রহ্মাণ্ডের তুমি আদি সূর্য্য, হে রাজরাজেন্দ্র, পরম জ্ঞানী, জগৎগুরু প্রজাপতি, তোমার চরণে নমস্কার। হে অনন্ত মহিমান্বিত বিরাট পুরুষ, তুমি বিশ্বরূপী, তুমি বিশ্বব্যাপী, তুমি বিশ্বাতীত বিশ্বাত্মা বিশ্বপাতা, বিশ্বপ্রাণ, তোমার বিশাল বিস্তৃত অনন্ত বক্ষে এই বিপুল বিশ্বরাজ্য যেন ক্ষুদ্র এক কণা জল বুদ্‌বুদের ন্যায় স্থিতি করিতেছে। ইহার কোন একটীর সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না। তথাপি আমার প্রমত্ত হৃদয় বলে যে তুমি দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্রের ন্যায় সুগভীর এবং প্রশস্ত; মহা গগনভেদী হিমাদ্রি শিখরের ন্যায় মহোচ্চ। যত কিছু বিস্ময়কর বৃহৎ, মহৎ এবং রমণীয় চিত্তবিনোদন সুন্দর, সুমিষ্ট এবং উপকারী পদার্থ

আছে তাহাদের সঙ্গে তোমার উপমা দিতে ইচ্ছা হয়। পরিশেষে দেখি তাহাতেও হৃদয়ের ক্ষোভ মিটে না। তবে আর তোমায় আমি কি বলিয়া স্তব করিব? অনন্ত মহান সৌর ব্রহ্মাণ্ড, অতলস্পর্শ বিশাল মহোদধি, অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিমালা, সুদূর প্রসারিত মরুভূমি, চরাচর স্থাবর জঙ্গম অসীম জগৎ তোমার ভিতর। অযুত অগণ্য জীব জন্তু কীটাণু পশু পক্ষী পতঙ্গ তোমার ভিতর। ইহলোক পরলোকনিবাসী জ্ঞানী মহাজন ভক্ত এবং বদ্ধ ও মুক্তাত্মা, দুঃখী পাপী অজ্ঞান জনসাধারণ, অতীত অনাগত প্রজাপুঞ্জ সমস্তই তোমার ভিতর। হে ব্রহ্মাণ্ডোদরী অখিলমাতা, আমাকে তোমার ঐ অভয়.পদে স্থান দান কর।

যুগযুগান্তরে, দেশদেশান্তরে আমাদের উদ্ধারের জন্য আহা কত কত দেবাত্মা মহাপুরুষকেই তুমি পাঠাইয়াছিলে! ধন ধান্যে পরিপূর্ণা এই সসাগরা সদ্বীপা ধরা মাতার ন্যায় আমাদিগকে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছেন। আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহক এই সব সুব্যবস্থার জন্য তোমায় শত সহস্র ধন্যবাদ। বহু জনাকীর্ণ নগরের রাজপথে, জলে স্থলে ভূতলে, বাণিজ্যাগারে, এবং কর্ম্মক্ষেত্রের মহাব্যস্ততা ও পরিশ্রম উদ্যমের মধ্যে, ক্রয় বিক্রয়ের ভিতরে, কৃষিক্ষেত্রে শিল্পালয়ে, প্রতি পরিবারে তুমি বিশ্বকর্ম্মারূপে কার্য্য করিতেছ তোমায় নমস্কার। পাপে পরিশ্রান্ত দীনাত্মার অনুতাপাশ্রুতে, তত্ত্বানুসন্ধায়ী বিজ্ঞানীর জ্ঞানগবেষণালোকে, জনহিতৈষী বিশ্বসেবকের ক্লান্ত দেহের ঘর্ম্মবিন্দুমধ্যে, স্পন্দহীন নিমীলিত লোচন গভীরাত্মা যোগীর যোগ ধ্যানে, এবং প্রেমিক ভক্তের উন্মাদবৎ নৃত্য গীতে তুমি বিরাজমান, তোমাকে নমস্কার। আবার অমরধামে হে স্বর্গাধিপতি, দেবাত্মা অমর সন্তানগণকে লইয়া তুমি কেমন নিত্যানন্দে বিহার করিতেছ! অনন্ত কোটী পরলোকবাসী আত্মা তোমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে; কি নিয়মে কি ভাবে এখন তাহারা কালাতিপাত করে তাহা কেবল তুমিই জান। রাজরাজেশ্বর সর্ব্বভুবনের অধিপতি, সেই তুমি আমার আমিত্বের অন্তরালে! ইহা কি সত্য? না কবির কল্পনা? না জ্ঞানীর চিন্তাবিকার? এই যে তুমি দুগ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট ঘৃতের ন্যায়—শুষ্ক দারুনিহিত অগ্নির ন্যায়—তিলের অভ্যন্তরস্থ তৈলের ন্যায় আমার প্রাণমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ! আমি তোমার অংশ, তোমার বংশ, তোমাকে নমস্কার

করি। হে বিশ্বরাজ, এই একটী পৃথিবী, তাহাতে কত সাধু জ্ঞানী গুণী মহাজন কত স্থানে তোমার মহিমার পরিচয় দিতেছেন, কত প্রাকৃতিক মনোরম্য এবং সুগম্ভীর দৃশ্য চিত্তকে বিমোহিত করিতেছে; না জানি উর্দ্ধে ঐ অনন্ত গগনে তোমার কতই কীর্ত্তি! তুমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মাণ্ডস্বামী, তোমাকে নমস্কার। হে পরম প্রভু, তোমার এই সকল অনির্ব্বচনীয় মহিমা, অচিন্ত্য মহালীলা এবং বিচিত্র বিভূতির অন্তরালে তোমার অব্যক্ত মহাসত্তার গভীর অভ্যন্তরে তবে এখন আমি নীরবে অবতরণ করি। আমার রসনা শ্রান্ত, চিত্ত বিহ্বল, হৃদয় অবসন্ন হইল; এখন তোমার অনন্ত মহাসিন্ধুবক্ষে আমি বিলীন হইয়া যাই।”

কর্ম্মযোগ—অষ্টম অধ্যায়।

পুরুষকার।

শ্রীজীবের স্তব স্তুতি শ্রবণানন্তর আচার্য্য অন্তর্য্যামী অনন্তদেব বলিলেন, “বৎস! তুমি জগন্ময় আমার অবিচ্ছিন্ন আবির্ভাব যদি দেখিলে, তবে এখন সেই ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে থাক। তোমার আন্তরিক সাধু চিন্তা, সাত্ত্বিক বাসনাসকল বিষয়ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সাকার কার্য্যে যদি পরিণত না হয়, তাহা হইলে জীবন বিকসিত এবং গঠিত হইবে না। অতএব যে জন্য জ্ঞান এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বুদ্ধি বিবেক সকল পাইয়াছ তাহার সার্থকতা সাধন কর, পরিণামে কৃতার্থ হইতে পারিবে। কিন্তু বাহিরের কর্ম্মের সঙ্গে অন্তরের বিবেক দিব্যজ্ঞান, ভাব ভক্তি, মত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত যাবজ্জীবন তোমাকে সংসার এবং রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। যেমন সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়া যায়, তেমনি মত বিশ্বাস এবং কার্য্য তিনের সম্মিলন আবশ্যক। ইহা সহজ মনে করিও না; মানবের ঐহিক লীলার শেষ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সংগ্রামবিবরণে পরিপূর্ণ। কারণ, বাহিরের বৈষয়িক রীতি, ভৌতিক অন্ধশক্তি, সামাজিক অবস্থা এ পথের প্রধান প্রতিবন্ধক; তাহাদের দুরতিক্রমণীয় প্রভাবে নিজের অন্তঃকরণ অনেক সময় প্রতিকূল

হইয়া দাঁড়ায়। যে পুরুষ জ্ঞান এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মযোগ সাধন করিবে, সে যখন স্বার্থ প্রলোভনে পড়িয়া বিকারগ্রস্ত অন্ধ হয়, তখন তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও অন্ধ ভাবে বিপথে গমন করে। সুতরাং যে রাজা সেই যখন বিকৃত হইল, প্রজাবর্গ আর তখন কিরূপে প্রকৃতিস্থ থাকিবে? তাই বলিতেছি, আমার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সহজসাধ্য নয়। বাহিরের এই সমস্ত রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের দুর্জ্জয় প্রভাব জীবাত্মাকে অবস্থার দাস করিয়া ফেলে, এবং তাহাকে তাহারা তদ্রূপে গঠন করে। কেন না, অখণ্ড বহির্জ্জগৎ ও সমাজদেহের তুমি একটী দুশ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ; ভূত এবং বর্ত্তমানের লক্ষ লক্ষ নরনারী যেমন বহুল সুদৃষ্টান্তের সাহায্যে তোমাকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাইবে, তেমনি অগণ্য অসংখ্য জীবিত ও মৃত ব্যক্তি তোমার নিমিত্ত পাপ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। অর্দ্ধেক জীবন তোমার সেই পাপবিকৃত মনুষ্যসমাজের হাতে। একটী মানব জীবনের অনন্ত কার্য্য, অনন্ত অবস্থা; এ সমুদয় এক একটী করিয়া বুঝাইয়া দিলে মনে থাকে না; এজন্য আমি তোমার বিবেকের ভিতর দিয়া যখন যে অবস্থায় যেটী কর্ত্তব্য তাহা বলিয়া দিব, তুমি কেবল আমার পানে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। অন্তর্ দৃষ্টি ঠিক থাকিলে হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ অতি সূক্ষ্ম ক্ষুরধারের ন্যায় সত্যের পথ ধরিয়া আপনাপনি মুক্তিধামের দিকে অটল ভাবে চলিয়া যাইতে পারে। একদিকে যেমন প্রাকৃতিক, ভৌতিক, সামাজিক এবং বৈষয়িক প্রতিবন্ধকতার কথা বলিলাম, অন্য দিকে আবার মানসিক প্রভাব বা পুরুষকার শক্তি এমন আছে যে বাহিরের যাবতীয় অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া মানুষ নূতনবিধ অনুকূল অবস্থা গঠন করিয়া লইতে পারে। প্রভেদ এই, বাহ্যাবস্থা চেতনাবিহীন অন্ধ, সুতরাং তাহার নিজের কোন শুভাশুভ অভিপ্রায় নাই; আমি সর্ব্বনিয়ন্তা, আমার কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব শক্তিতে তাহার অনন্ত কার্য্যকারণের জটিলতার ভিতর দিয়া আমার চরম লক্ষ্য সাধিত হইতেছে। সে চরম উদ্দেশ্য অনন্ত মঙ্গল, বিশ্বাসনেত্রে কেবল তাহা দেখা যায়। কিন্তু ইহা আমি মানবের পুরুষকার শক্তির উপলক্ষে সচরাচর সম্পন্ন করিয়া থাকি। এই পুরুষকারবল আমার দৈববলের নামান্তর মাত্র জানিবে। ইহা বাহ্য প্রতিকূল অবস্থার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া নবযুগধর্ম্ম বা নূতন রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়। যেহেতু

ইহার ভিতর আমার অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছাবল প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই জন্ত পরিণামে ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী।”

সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য পরম পুরুষের মহাবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া জীব ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, স্বয়ং গুরুদেব যখন বলিতেছেন “ইহা সহজ নয়” তখন আমি কি সাহসে এ পথে অগ্রসর হইব? আমার পুরুষকারবল যদিও আছে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা আমি কি এই দুর্জ্জয় প্রতিবন্ধকরাশি অতিক্রম করিতে পারিব? বড় ভয় হয়। যাহারা সমরকুশল বীরপুরুষ তাহাদেরও বিশ্রাম এবং নিদ্রার সময় আছে। আমি সংসারসমরে সর্ব্বক্ষণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া কি সতর্ক থাকিতে পারিব? হায়! জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কত কত শত্রু আমার অন্তর্ এবং বহির্জ্জীবন আক্রমণ করিতেছে। কি কঠিন সাধন!

আচার্য্য। কিছু ভয় নাই। কষ্ট বহন, এমন কি মৃত্যুও তোমার অনন্ত শান্তির উৎস হইবে। যদিও মানব জীবন চিরসংগ্রামের জন্ত এবং সংসার নিত্য সমরক্ষেত্র, কিন্তু আমি তোমার বিশ্রাম লাভের নিরাপদ দুর্গ। যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত শ্রান্ত হইয়া আমার নিকট যাই একবার বসিবে, অমনি সকল দুঃখ জ্বালা ভুলিয়া যাইবে। রুগ্ন সন্তানকে মাতা যেমন বক্ষে রাখিয়া সান্ত্বনা দেয়, আমিও তোমাকে সেইরূপে সান্ত্বনা দান করিব।

কর্ম্মযোগ—নবম অধ্যায়।

কর্ম্মবন্ধন।

ভগবান সচ্চিদানন্দের অনুজ্ঞাক্রমে জীব কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে বিবাহিত হইলেন, তদনন্তর যথারীতি গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তিনি কর্ম্মচক্রের কুটিল বৃত্ত এবং গভীর কেন্দ্রের মধ্যে গিয়া পড়িলেন তখন আর তাঁহার গতিরোধ করিবার কেহ রহিল না। তিলার্দ্ধ কাল বিশ্রাম নাই। যখন কর্ম্ম সমাধা করিয়া বসিয়া থাকেন, তখনও মাথার মধ্যে কর্ম্মকল্পনা এবং কর্ম্মপিপাসা সকল ঘুরিয়া বেড়ায়। শয়ন করেন, তখনও কর্ম্মফল-আশা শয্যার সঙ্গিনী হয়। নিদ্রা যান যখন, তখনও অন্তরে

স্বপ্নচ্ছলে কর্ম্মচিন্তা স্রোতের ন্যায় বহিতে থাকে। ভয়ানক কার্য্যোদ্যমে তাঁহাকে দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত মহাবেগে ভ্রাম্যমাণ করিতে লাগিল। কার্য্য চিরদিন থাকে না, এক যায় এক আসে; কিন্তু যখন যেটা উপস্থিত হয় কিম্বা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহা যেন জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। এইরূপে কাজ করিতে করিতে কালবশে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল এবং শিথিল হইয়া আসিল। কিন্তু তথাপি কাজের শেষ হইল না। কর্ম্মের আশা কল্পনা বাসনা পিপাসাও মিটিল না। কাজও তিনি অনেক করিলেন। যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহাতেই ফললাভ করেন। বিষয়কার্য্যে, সংসার পালনে নিযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইলেন। আবার পরহিতব্রত, ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিয়াও সর্ব্বত্র অনুরাগ ও প্রশংসাভাজন হইলেন। কার্য্যের সফলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অনুরাগ উৎসাহও যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিল। তখন কাজ করিতে এতই ভাল লাগে যে তাহা ছাড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। নিত্য নব নব কার্য্যের সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান। একদিকে কার্য্যের বিস্তার, অপর দিকে বংশবৃদ্ধি, কুটুম্বভরণ, তৎসঙ্গে মোহ আসক্তির প্রগাঢ়তা, বিষয়ের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাসনার বৃদ্ধি; সহস্র সহস্র বন্ধনে ক্রমে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। এইরূপে বিপুল কার্য্যতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তিনি একবারে যৌবনের পর-পারে গিয়া উপনীত হইলেন। তদবস্থায় বহু দিন পর্য্যন্ত গুরুদেবের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ এক দিন কোন পারিবারিক বিপদ উপলক্ষে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? কৈ আগে আগে যেমন আমার নিকট বার বার দেখা করিতে আসিতে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে, এখন আর সেরূপ দেখি না কেন?"

শিষ্য। প্রভো! এখন আমি কাজে কর্ম্মে বড় ব্যস্ত থাকি। কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহা উদ্ধার না করিয়া আরত ক্ষান্ত থাকা যায় না, কাজেই সময় পাই না। তথাপি প্রতি দিন প্রাতে সন্ধ্যায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমি আপনার পূজা অর্চ্চনা করি। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সাধনেও আমার কিছু মাত্র শৈথিল্য নাই।

গুরু। কিন্তু কৈ আমার সঙ্গে দেখাত কর না, কেবল নিয়ম পালন করিয়া চলিয়া যাও।

শিষ্য। দেখা করিতে গেলে ওদিকে কাজের বড় ক্ষতি হয়। পূজার ঘরে যখন বসি, কাজগুল সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যেন ব্যস্ত করিয়া তোলে। পূজা ধ্যান এসবতো কালে বদ্ধ নয়, যখন ইচ্ছা তখনই করা যাইতে পারে, সেজন্য তোমারও কোন বিশেষ পীড়াপীড়ি নাই। কিন্তু কাজগুল যথা সময়ে না করিলে তাহাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটে, ক্ষতি হয়, সমস্ত বন্দোবস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তাই ভাবিয়াছিলাম একবারে সমস্ত কাজ নিঃশেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তোমার নিকট বসিব। আর এক কথা এই, পূর্ব্বে পূজা আহ্নিক ছাড়িয়া চক্ষু খুলিয়া হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিতে ইচ্ছাই হইত না; এখন ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। কেবল নানাবিধ কার্য্যে দৈহিক পরিশ্রম করিতে ভাল লাগে, চক্ষু বুজিয়া স্থির ভাবে এক স্থানে নীরবে বসিয়া থাকিতে পারি না। কাজ না হইলে এখন থাকাই যায় না। ধ্যান চিন্তা আরাধনা করিতে বসিলেও কাজের মূর্ত্তি, কাজের কথাই কেবল মনে আসে, মানস-চক্ষে কেবল কার্য্যক্ষেত্রই দর্শন করি। কর্ম্মেতে বেশ এক রকম আমোদ এবং মত্ততাও আছে দেখিতে পাই। যার কোন কাজ কর্ম্ম নাই সে বড় অসুখী। কাজে শরীর মন হৃদয় সুস্থ এবং প্রফুল্ল থাকে। কার্য্যফলও অতি উপাদেয়; ইহা দ্বারা সুবহু কল্যাণ সাধিত হয় এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। ইহাতে চরিত্রও ভাল থাকে, মনে পাপ প্রবেশ করিবার অব-সর পায় না। এই জন্যই তুমি আমায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ।

গুরু। তাই বলিয়া কি এতকাল ভুলিয়া থাকা উচিত? পাছে স্বার্থহানি হয়, এবং আমি তোমার কোন কাজের দোষ ত্রুটি ধরিয়া তাহার সমালোচনা করি, এই ভয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর না। আচ্ছা, কি কি কাজ করিয়াছ বল দেখি শুনি?

শিষ্য আহ্লাদিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "আপনার প্রসাদে অনেক কাজ করিয়াছি, তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি। সংসারে স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং স্বজনবর্গ যাহাতে পুরুষানুক্রমে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার উপায় সর্ব্বাগ্রেই করিয়াছি। তাহা ব্যতীত স্বদেশহিতব্রতে, ধর্ম্মকর্ম্মেও যথেষ্ট ফল পাইয়াছি। বিদ্যালয়, দাতব্যভাণ্ডার স্থাপন, পুস্তক পত্রিকা প্রণয়ন, সমাজের উন্নতি সাধন, ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ, সাধারণের জন্য প্রশস্ত

পথ, পান্থশালা এবং জলাশয়; গরীবের জন্য বিধবাশ্রম অনাথাশ্রম ইত্যাদি কার্য্য আপনার এ দাস অনেক সম্পন্ন করিয়াছে। পাপমুখে বলিতে নাই, যাগ যজ্ঞাদি প্রভৃত কর্ম্মকাণ্ডও অনেক করা হইয়াছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ সাধারণের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র আছে, যদি দেখিতে চাহেন তাহাও দেখাইতে পারি। পরের জন্য খাটিয়া এবং ভাবিয়া ভাবিয়া আমার মাথার ব্যারাম হইয়াছে, অধিক আর কি বলিব। কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ! এই সকল কার্য্যে আমার ধন মান পদ সম্ভ্রম বাড়িয়াছে কেবল তাহা নহে; লোকে এজন্য আমাকে সাধু ভক্ত নিঃস্বার্থ প্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিও যথেষ্ট করে। কর্ম্মযোগ সাধনের ফল আমি হাতে হাতে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। বাস্তবিক কার্য্যই যে ধর্ম্ম তাহা ঠিক। তাই তুমি জীবসাধারণকে বাল্যকাল হইতে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছ। জীবিকা সংগ্রহপূর্ব্বক জীবন পোষণের জন্য নানাবিধ পরিশ্রমের কার্য্যে তাই সকলে নিরন্তর চিন্তিত এবং ব্যস্ত রহিয়াছে। ক্ষুধার কি দুর্জ্জয় শাসন! তাহার শাসনাধীন হইয়া নরনারী যন্ত্রবৎ কার্য্য করে। বিনা পরিশ্রমে যদি আহার্য্য মিলিত, তাহা হইলে মানবসমাজে ধর্ম্ম নীতি, শান্তি কুশল কিছুই থাকিত না।”

গুরুদেব হাঁ কি না, কোন কথাই বলিলেন না। নীরবে গম্ভীর ভাবে জীবের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। এবং দেখিলেন যে, জীবের সে পূর্ব্বকার ভাব নাই, সমস্ত রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মবন্ধনে বন্দীভূত হইয়া তাহার এই দশা ঘটিয়াছিল সে তাহা জানিতে পারে নাই। কাজের মত্ততায় এবং সফলতায়, সর্ব্বোপরি লোকের অনুরাগ অভিনন্দনে তাহাকে একবারে গুরু-দেবের নিকট হইতে বহু দূরে লইয়া গিয়াছিল। কর্ত্তা যদি কার্য্য সাধনে এখন নিষেধ করেন, তথাপি সে তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। বরং কর্ত্তাকে ছাড়িতে পারে, কিন্তু কার্য্য ছাড়িতে পারে না। অতঃপর একটু দম্ভ এবং অভিমানের সহিত জীব বলিলেন, “দেব! আমার কাজে দেশশুদ্ধ লোক মোহিত হইয়া আমাকে সুখ্যাতি করিল, আর আপনি একটা উৎসাহের কথাও বলিলেন না, ইহার কারণ কি? খাটিয়া খাটিয়া আমার প্রাণ অন্ত হইল, তবু আপনার তাহাতে মন উঠিল না?”

গুরু তদুত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “না!”

"না" শব্দ শুনিয়া জীব কম্পিত কলেবরে কার্য্যক্ষেত্রে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে বড় আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভগবানের বিচার নির্ম্মম কঠোর বিচার, অথবা তাঁহার বড় অবিচার, ইহাই তাঁহার মনে লাগিল। কিন্তু ভিতরে তিনি একটা বড় ধাক্কা খাইলেন, কর্ম্মপথে বাধা পাইলেন। অতঃপর কোন বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে আর তাঁহার সাহস হইত না; লজ্জায় অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত এবং অনুতপ্ত হইত। শেষে নিজে বেশ বুঝিতে পারিলেন, সম্পদের কালে যাঁহাকে সারল্য বিশ্বস্ততা ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি নাই, বিপদের কালে কোন্ মুখে আর তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিব? শরণাগত ভিন্ন বিপদভঞ্জন নামের মাহাত্ম্য কেহ বুঝিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে ভগবানের উপর কোন দাবি দাওয়া খাটে না।

কর্ম্মযোগ—দশম অধ্যায়।

কর্ম্মাসক্তি নিরসন।

চিদানন্দ পিতৃদেব প্রমুখাৎ জীবের অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা এবং তৎপ্রতি ভগবান সদ্‌গুরুর উপেক্ষার কথা শুনিয়া নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! জীব কেন ভগবানের প্রসন্নতা এবং অনুমোদন প্রাপ্ত হইলেন না, আমাকে তৎসমুদয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। কার্য্যক্ষেত্রে যিনি এত সফলতা লাভ করিলেন, সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইলেন, তিনি কি জন্য কর্ম্মযোগের ফল পাইবেন না? কি তাঁহার অপরাধ হইয়াছিল? কার্য্য না করিলেও দোষের ভাগী হইতে হয়, করিলেও তাহাতে সহজে ভগবানের অনুমোদনরূপ পুরস্কার পাওয়া যায় না, এ অবস্থায় মানুষ যায় কোথা? করেই বা কি?

তদুত্তরে স্বামী সদানন্দ বলিলেন, "বৎস, কর্ম্মযোগের গূঢ় তাৎপর্য্য ইহা দ্বারা অবগত হও। তাহার পরের কথা বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

অনন্তর অপর এক দিবসে শ্রীজীব নিতান্ত অকৃতার্থের ন্যায় সংশয়ান্দোলিত মনে ভগবচ্চরণে মস্তক অবনত করতঃ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে

লাগিলেন,—আমি ত কার্য্য হইতে প্রথমেই অবসর চাহিয়াছিলাম। ঠাকুর বলিলেন, কার্য্যই মানবের প্রকৃতি, কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ কিছুই হয় না; এখন আবার দেখিতেছি কাজ করিয়াও তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা নিতান্ত দুরূহ। তবে এখন কি করি। হে প্রভো! আমায় দয়া করিয়া বল, এখন কোন্ পথে যাই। আমার বিশ্বাস যে, আমি বেশ কাজ করিয়াছি। যদি কার্য্যফল দেখিয়া, দশ জনের প্রশংসা এবং সাধারণের অনুমোদন শুনিয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে আমার কাজ সকল অপেক্ষাকৃত সৎকার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাঁহার মনের ভাব জানিয়া অন্তর্য্যামী গুরুদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহা সৎ কার্য্য বটে, তাহার ফলও মঙ্গলকর, কিন্তু তথাপি সে সমস্ত কর্ম্মযোগ নহে।"

শিষ্য। কেন? আমি তো তোমারই প্রীতিকামনায় সমস্ত কার্য্য সাধন করিয়াছি! স্বার্থানুরোধে বা আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়াত করি নাই।

আচার্য্য। আমার কার্য্য সাধারণ অর্থে সমস্তই বটে, কিন্তু যাহারা কর্ম্মযোগ সাধন করিতে চায় তাহাদিগকে আমার ইচ্ছা পরামর্শ সুবুদ্ধি, আমার প্রেরিত দেবশক্তি, সদুপায় এবং নিষ্কাম বাসনা লইয়া তাহা সম্পাদন করিতে হয়। দ্বৈতভাব ইহাতে কিছুই থাকিবে না।

শি। আমি সেই ভাবেই ত বোধ হয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। নতুবা ফললাভে কেমন করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম?

আ। "বোধ হয়" বলিলে চলিবে না। কেবল ফল দেখিয়াও বিচার হয় না। দুরভিপ্রায়ে গূঢ় স্বার্থের পরতন্ত্র হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে জগৎ সম্বন্ধে অনেক হিতকর সুফল ফলে।

শি। আমার কোথায় তবে দোষ ঘটিয়াছে, কি জন্য আমি অপরাধী হইলাম বুঝাইয়া দাও।

আ। তোমার ব্রত সৎ, উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইবার এবং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য তুমি মানবীয় বুদ্ধি কৌশল, ছল চাতুরী এবং ধর্ম্মভাণে অতি সূক্ষ্ম মিথ্যাপথ অবলম্বন করিয়া থাক কি না?—জ্ঞানপূর্ব্বক, অজ্ঞানে নয়?

এই গূঢ় অন্তর্ভেদী প্রশ্ন শুনিয়া জীবের মস্তক সহসা যেন ঘুরিতে লাগিল। আত্মার মূল দেশে দৃষ্টি পতিত হইল। সত্যপ্রিয়তা ও সরল ইচ্ছার সূক্ষ্ম স্নায়ুতে, ভাবের ঘরে এক বিষম আঘাত লাগিল।

অতঃপর তিনি প্রমুক্ত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "পৃথিবীর প্রচলিত কার্য্যরীতির মহামোহে আমি পড়িয়াছিলাম সত্য; কেবল কার্য্যোদ্ধার এবং আশু ফলের দিকেই ক্রমাগত চাহিয়া থাকিতাম, তোমার ইচ্ছার সূক্ষ্ম কাঁটার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারি নাই। অনেক সময় কার্য্যসাধনের উপায় গুলিও তোমার নিকট জানিয়া লই নাই; নিজের বুদ্ধি, সুবিধা এবং ফলাফল বিচার দ্বারা তাহা নির্ব্বাচন করিয়াছি। ভাবের ঘরে দোষ এই জন্য অনেক সময় ঘটিয়াছে।"

"অহো! কি গভীর সূক্ষ্ম তোমার দৃষ্টি! আমি সামাজিক জীব, প্রচলিত সামাজিক নীতি রীতিতে আমার ব্যবহারিক জীবন গঠিত হইয়াছে, সুতরাং অজ্ঞাতসারে আমি সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলাম, এখন আমাকে ফিরাও। এখন বুঝিলাম, স্ত্রী পুত্র পরিবারের মায়া মমতা, বিষয়াসক্তি সুখলালসা পরিহার বরং সহজ; কারণ, সে সকল ধর্ম্মসীমার বাহিরে বলিয়া চির দিন অবগত আছি; কিন্তু ধর্ম্মের মোহ, সৎকার্য্যে অন্ধাসক্তি, ধর্ম্মবঞ্চনা পরিত্যাগ বড় কঠিন। হায় উচ্চতম পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অভিমানসম্ভূত নীচ উপায় অবলম্বন করিয়া আমি ঘোর অপরাধী হইয়াছি! তোমার কাজ তুমি করিবে, ফলাফলও তোমার হাতে, আমি কেবল যন্ত্র বিশেষ; তবে কেন আমি তোমার উপকার করিতে গিয়াছিলাম!"

কর্ম্মযোগ—একাদশ অধ্যায়।

রাজসিক কর্ম্ম।

অতঃপর সদানন্দ পুত্রকে বলিলেন, "জীবের কর্ম্মবিষয়ক মানসিক স্বরূপাবস্থার বিবরণ কহিতেছি, এক্ষণে শ্রবণ কর। শ্রীভগবান্ মহাগুরু কর্ম্মযোগ, বিকর্ম্ম এবং কর্ম্মবন্ধনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'বৎস, নিরাশ হইও না, অধৈর্য্য হইও না; সামঞ্জস্য, পরিমিতাচারই কর্ম্মযোগের লক্ষ্য।

তৎপ্রতি দৃষ্টি অন্ধ হইলে যতই কার্য্য কর না কেন, তাহাতে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে না, চরিত্রেরও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইবে না।

কার্য্যের গতি অন্ধ গতি, একবার কোন একটী অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগৃহীত হইলে তাহা অবাধে চলিতে থাকে, তদ্দ্বারা সৎ এবং অসদভিপ্রায় উভয়ই সমান ভাবে চরিতার্থ হইতে পারে। অনেকানেক সাধু অনুষ্ঠান আছে যাহা দ্বারা বহু শত ধর্ম্মব্যবসায়ী পরোপকারীর নিগূঢ় স্বার্থ এবং সংসারযাত্রা অতি সহজে বিনা আয়াসে সংসিদ্ধ হয় অবশ্য তাহা জান। কার্য্যের মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব কর্ম্মকর্ত্তার অভিপ্রায়ে, ফলাফলে নয়; পরিমাণ ধরিয়াও তাহার বিচার হয় না। আমার অনুমোদন কেবল মাত্র তোমার পবিত্র নিষ্কাম অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। কেন না, প্রকৃতির নিয়তি কার্য্যের দিকে নিরন্তর প্রধাবিত হইতেছে, একটা সামান্য পরমাণু কণাও বসিয়া থাকে না, জন্ম মৃত্যু, উত্থান পতন, ভঙ্গ গঠন হ্রাস বৃদ্ধি রূপান্তর প্রকৃতির নিয়ম। মনুষ্য যখন ঘুমাইয়া থাকে, কিম্বা সে যখন জাগিয়াও কার্য্যের দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম গতি অবধারণ করিতে পারে না, স্বভাব তখন আপনার নিয়মে আপনি কার্য্য করে। অতি সুদূর ভবিষ্যতে যে কার্য্যফল লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইবে তাহা সংগোপনে বহুকাল পূর্ব্বে অদৃশ্য গতিতে আপনার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। অতএব এই অনন্ত কার্য্যকারণবিমিশ্র বিশ্বকার্য্যরূপ মহাসাগরের বিন্দু পরিমাণ যে তোমার কৃত কর্ম্ম তাহা যাহাতে আমার অভিপ্রায়ানুমোদিত হয় তদ্বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি চাই। কত লোক অসদুপায়ে, অন্যায়োপার্জ্জিত কিম্বা অন্যের উপার্জ্জিত অনায়াসলব্ধ ধনে সুবহু সৎকার্য্য সাধনপূর্ব্বক "আমি কর্ত্তা, আমি সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবান্ ব্যক্তি" ইত্যাদি বলিয়া আপনাকে ধর্ম্মাত্মা মনে করিতেছে। এবং জনসমাজের চাটুকারদিগের এবং কর্ত্তৃপক্ষের ধন্যবাদ প্রশংসা বাক্য সাধু কার্য্যের পুরস্কার মনে করিয়া অহঙ্কারে আরো স্ফীত হইতেছে। তাহাদের অনুষ্ঠানগুলি সৎ তাহাতে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর লোক তাহার ফলভোগে উপকৃতও যথেষ্ট হয়; কিন্তু নিষ্কাম সদভিপ্রায়ের অভাবে কর্ম্মকর্ত্তা দিন দিন অহঙ্কারে ডুবিয়া মরে। আমি যে কর্ম্মফলদাতা কর্ম্মকর্ত্তা সে কথাটা একবারেই সে ভুলিয়া যায়। এইরূপে লোকমুখে সাধুবাদ শুনিতে শুনিতে ধার্ম্মিকের উচ্চাসনে বসিয়া পরিশেষে ইহারা আমাকেও সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনারা

সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। সৎকার্য্যেও অনেক মোহ আছে; তদ্দ্বারা মানুষ ক্রমে আত্মাপহারী নরকগামী হয়।

যদি স্থির ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখ, আপনি বুঝিতে পারিবে, কোন্ কার্য্য তুমি স্বার্থ প্রবৃত্তি এবং লোকানুরাগপ্রিয়তা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া করিলে, আর কোন্‌টি বা ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া আমার প্রীতিকামনায় করিলে। কাজ তুমি প্রতিদিন অনেক করিয়া থাক তাহা জানি, তন্মধ্যে অনেক কাজ তোমার স্বার্থমূলক মায়াপ্রসূত হইলেও আমার সাধারণ মঙ্গল নিয়মের অনুগামী এবং জগতের কল্যাণকর, কিন্তু কর্ম্মযোগের হিসাবে তৎসমুদায় ধরিব না; কারণ, তুমি আমার যোগে যুক্ত হইয়া সজ্ঞানে তাহাত কর নাই। এইজন্য তাহাকে কর্ম্মযোগ বলা যায় না। অগ্রে আপনার স্বার্থ সুবিধার সঙ্গে মিলাইয়া, ফলাফল বিচারের মানদণ্ডে ওজন করিয়া তাহার পর যদি আমার সঙ্গে কোন কার্য্যের যোগ করিয়া লও সেটা আরো মহাপাপ। কিম্বা আমার উদ্দেশে কোন নিষ্কাম কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যদি তাহাকে আপনার নীচ স্বার্থ সাধনে নিযুক্ত কর, তাহাতেও তুমি অধোগামী হইবে। ঈদৃশ কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কার্য্যের ভিতর হইতে স্বার্থগন্ধ, আত্মাভিমান একবারে দূর হয় না সত্য, কিন্তু সাধন দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহা হয়। পরিণামে যখন আমার ইচ্ছার সহিত সাধকের ইচ্ছা এক হইয়া যায়, তখন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বাসনা প্রবৃত্তি সকল আপনা হইতে তাহার অনুগমন করে। অতএব বিনম্র ভাবে আত্মাভিমান-পরিশূন্য হইয়া সহজে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বাগ্রে আমার সম্পূর্ণ অধীন কর। ইচ্ছাই সকল কার্য্যের মূল। যে কোন কার্য্য কর তাহা আমার অনুমোদিত কি না বিবেক দ্বারা সর্ব্বাগ্রে তাহা স্থির করিয়া পরে তাহাতে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে। পবিত্র নিস্বার্থ উদ্দেশ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বিশুদ্ধ ইচ্ছার যোগে অর্থাৎ আমার যোগে তাহা সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় এবং প্রণালীও আমি বলিয়া দিব। আমার অনুমোদন প্রাপ্তিই কেবল যেন তোমার যাবতীয় কার্য্যের লক্ষ্য হয়।'

জীব। কর্ম্মজনিত যে অভ্যাস মনুষ্যস্বভাবে বদ্ধমূল হয়, তাহাই কি শুভাশুভ ফলের নিয়ন্তা? কর্ম্মফল কার্য্যকারণের ন্যায় এক সূত্রে গ্রথিত, তবে ফলদাতা কি তুমি নও?

ব্রহ্ম। কর্ম্মজনিত অভ্যাসে যে অবশ্যম্ভাবী ফল সচরাচর প্রসূত হয় তাহা অন্ধশক্তির কার্য্য; কিন্তু মানুষত অন্ধ শক্তির অধীন জড়যন্ত্র বিশেষ নহে, আমার প্রদত্ত জ্ঞানের ইঙ্গিতে সে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচনপূর্ব্বক প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ঃ পথে বিচরণ করিবে, এই তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়তি।

জীব। তবে মীমাংসাকার জৈমিনি কেন কর্ম্মকেই ফলাফলের একমাত্র কর্ত্তা বলিলেন?

ব্রহ্ম। বাদরায়ণকৃত বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তকে অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য অর্থাৎ আমাকে কর্ম্মবর্জ্জিত নির্লিপ্ত নিগুর্ণ সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য কর্ম্মকেই তিনি এবং কপিল সর্ব্বস্ব বলিয়া গিয়াছেন। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, ইহা একটী চিরপ্রবাদ বাক্যও বটে। বস্তুতঃ সহসা তাই মনে হয়। কিন্তু কারণরূপী ভাল মন্দ কর্ম্ম যদিও তাহার অনুরূপ ফল নৈসর্গিক নিয়মে সর্ব্বত্র প্রসব করে, এবং ইহা একটী বিশ্বজনীন নিয়ম; তথাপি জানিও, মনুষ্য স্বভাবে আমার আদিষ্ট কর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়া লইবার স্বাধীন বিবেক শক্তি আছে। তাহা না থাকিলে সে সংস্কারাধীন পশু সমান বা যন্ত্রবৎ হইয়া চিরদিন কেবল কর্ম্মফল অর্থাৎ অন্ধ অভ্যাসের দাসের ন্যায় কাল যাপন করিত। কর্ম্মফলের নিয়ম বিজ্ঞানসম্মত অভ্রান্ত হইলেও কর্ম্মগতি অর্থাৎ কারণরূপী কর্ম্মপ্রবাহ অবরোধপূর্ব্বক তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার শক্তি মানবের আছে। কারণ, আমি তাহার পরিচালক। সুতরাং মূলেতে আমিই কর্ম্মফলদাতা।

কর্ম্মযোগ—দ্বাদশ অধ্যায়।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

পরম গুরু আচার্য্য অনন্তদেবের নিকট কর্ম্মযোগের গূঢ় তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রীজীবানন্দ কিছু হতাশ হইয়া পড়িলেন। কারণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সৎ কর্ম্মের ভিতরেও যে ঘোরতর মোহ, আসক্তি এবং আত্মপ্রবঞ্চনা আছে, এবং তাহা হইতে সহজেই স্বার্থ অভিমান সমুৎপন্ন হইয়া যে মনুষ্যকে আত্মঘাতী অহঙ্কারী করিয়া তুলে, নিজের অভিজ্ঞতায় তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর ইতিকর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"দেব, কর্ম্মমাত্রেই কিছু না কিছু মোহ উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে; এই ভাবেই চিরদিন কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং অভ্যাসদোষে জ্ঞানে অজ্ঞানে আমাকে সেই দিকে লইয়া গিয়া ফেলে; এক্ষণে ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি?"

"যে কার্য্যের যে ফল, এবং ভাল মন্দ সুখ দুঃখ শীতোষ্ণবোধ, মিষ্ট তিক্ত ভেদরসাস্বাদ, ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। সুখকর বিষয়ে, সৌন্দর্য্য ও মিষ্টতার প্রতি সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। যে কোন বিষয়ে তৃপ্তি সুখ স্বাস্থ্য স্বার্থ সুবিধা আরাম অনুভব করি, তাহার দিকে সর্ব্বাগ্রে মন দৌড়িতে থাকে। এবং তদ্বিপ-রীত যাহা কিছু তাহার প্রতি বীতরাগ জন্মে। এ সব স্বভাবের ধর্ম্ম দেখিতেছি, ইহা হইতে আত্মাকে নির্লিপ্ত রাখা কি সম্ভব?"

আচার্য্য। যদি সম্ভব না হইবে, তবে তোমাকে দেবত্বের অধিকারী করিয়াছি কেন?

শিষ্য। অন্তরে ইন্দ্রিয়সুখভোগের অভ্যাস এবং প্রবৃত্তির লালসা, বাহিরে তাহার উপযোগী ভোগ্য বিষয় সম্মুখে, এস্থলে উভয়ের স্বাভাবিক কার্য্য কি বন্ধ থাকিবে?

আচার্য্য। বৈধ সীমামধ্যে অবশ্য থাকিবে। বিকারের কারণ যে প্রবৃত্তি-মূলক ইচ্ছা সে যদি বশীভূত হয়, তবে বাহিরের প্রলোভনে কিছুই করিতে পারে না। আমি কিরূপে নির্লিপ্ত আছি? আমার আদর্শই অনুকরণীয়।

শিষ্য। ঠাকুর, তুমি হইলে নিরাকার, তাহাতে আবার সর্ব্বশক্তিমান; আমি রক্তমাংসনির্ম্মিত দেহধারী দুর্ব্বল জীব, দেহসংক্রান্ত অনেক বিষয় আছে যাহাতে আমাকে সহজে পাপ পথে লইয়া গিয়া ফেলে। ক্ষুধা পিপাসা শীত গ্রীষ্ম রোগ বেদনায় আমাকে অস্থির করে। সুতরাং তোমার আদর্শে আমি চলিব কিরূপে? দৈহিক জীবের আদর্শের জন্য দেহধারী মানুষ চাই।

আচার্য্য। তোমার দৈহিক অভাব সকল বৈধরূপে যাহাতে পূরণ হয় তাহারত উপায় আমি অনেক করিয়া রাখিয়াছি, তবে আর সেজন্য এত ভয় কেন? আর যদি নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের মানবীয় আদর্শ ধরিতে চাও, তাহারই বা অভাব কি? যুগে যুগে দেশে দেশে আমার ভক্তগণ এই পৃথিবীতে সেরূপ দৃষ্টান্ত

কতই দেখাইয়া গিয়াছেন! এখনও সেরূপ ভক্ত কত রহিয়াছেন। তুমি নিজেই কেন সে আদর্শস্থল হও না?

শিষ্য। তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহারা সকলেই প্রায় গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহস্থ হইয়া পরিবার পুত্র কন্যা লইয়া বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া কেহই সংসার করেন নাই, কাজেই তাঁদের নিকট আমি গৃহী জীব এ বিষয়ে কি শিখিব?

আচার্য্য। কর্ম্মী বৈরাগী জ্ঞানী ভক্ত, অথচ গৃহস্থ, এমন সাধুও কি নাই? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, বিশেষরূপে নবযুগ ধর্ম্মে তাহা অনেক দেখিতে পাইবে। আর আমার যাঁহারা সন্ন্যাসী ভক্ত, তাঁহারা সামান্য গৃহীর ন্যায় সংসার না করুন, বড় বড় দেশ ও রাজ্যের ভার তাঁদের মাথায় ছিল। সে ভার তাঁহারা নির্লিপ্ত ভাবেই বহন করিতেন।

শিষ্য। হাঁ, এখন আমি সব বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু বিষয় ভোগ করিব, তাহার আস্বাদ লইব, তাহাতে চিত্ত তৃপ্ত হবে, অথচ আসক্ত হবে না; এ কিরূপ কথা? যাহাতে তৃপ্তি শান্তি তাহাতেই আসক্তি, বন্ধন; এইত সাধারণ নিয়ম।

আচার্য্য। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু উচ্চতর তৃপ্তি শান্তির যাহারা আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা পৃথিবীর বিবিধ প্রকার সুখসেব্য বস্তু সম্ভোগ করিয়াও তাহাতে কদাপি বিমুগ্ধ বা আসক্তচিত্ত হয় না। পার্থিব যে কোন বিষয়ে মনুষ্যের অতিমাত্র ভোগস্পৃহা থাকে তাহাতে কালে আবার অরুচি জন্মে। যতই কেন মানুষ সুখভোগের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করুক না, এমন দিন আসিবে যখন নৈসর্গিক নিয়মেই তাহার পার্থিব সুখবোধশক্তি আপনিই কমিয়া যাইবে। সেই একই বিষয়, অথচ তাহাতে পূর্ব্বের মত আর সুখ জন্মিবে না। ইহার কারণ এই যে, আমি এ সকলের একটি সীমা নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি, কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

আর এক কথা এই, কর্ম্মযোগ সাধনের যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বস্তুতঃ তাহা সর্ব্বথা নীরস কঠোর নহে। তদ্ব্যতীত আমার আশীর্ব্বাদ এবং সাধকের বিশ্বাস ভক্তি গুণে অনেক কঠোর কর্ত্তব্যও সরসরূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব কর্ত্তব্য কর্ম্মে যে আকর্ষণ প্রলোভন এক অর্থে তাহা দোষের নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলেই হইল। ফলের প্রতি অন্ধ আসক্তি স্বার্থ বোধ না জন্মে এইটাই কেবল দেখিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মে যে বিমলানন্দ, পরম

শান্তি সম্ভোগ হয়, ফলের প্রতি আসক্তি থাকিলে কথনই তাহা হয় না। এইজন্য ভক্ত এবং অভক্তের ফলভোগ ও সুখভোগের তারতম্য আছে। আমি স্বয়ং ভক্ত সাধকের পুরস্কার এবং সুখ শান্তি। আত্মপ্রসাদরূপে আমাকে পাইয়া এবং আমার প্রসন্নতা লাভ করিয়া সে একবারে পূর্ণকাম হইয়া যায়, লোকপ্রশংসা বা আবান্তরিক বাহ্যফলভোগ তাহার নিকট অতিশয় তুচ্ছ। যে মায়া কিম্বা আসক্তি তোমার এবং আমার মধ্যে ব্যবধান হইয়া দাঁড়ায়, যাবতীয় কার্য্যের ভিতর হইতে আমার আবির্ভাব এবং কর্তৃত্ব উড়াইয়া দেয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। কিন্তু কর্ত্তব্যকার্য্য সকল অতীব সুখকর, আত্ম-প্রসাদপ্রদায়ক; যেহেতু প্রিয়তমের আদিষ্ট প্রিয় কার্য্য সাধনে কোনই কষ্ট বোধ হয় না, বরং কষ্টে সুখানুভব হয়; তজ্জন্য কত প্রেমিক প্রাণ পর্য্যন্ত বিস-র্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। অতএব ঈদৃশ নিষ্কাম সুখ সম্ভোগের মধ্যে আমাকেই দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্যে দুঃখ বেদনাও অনেক সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার ভিতরেও আমি আশা সান্ত্বনারূপে বাস করি। আমি সুখের অন্তর্গত পরমসুখ, এবং দুঃখের অন্তর্গত সান্ত্বনা, সহিষ্ণুতা এবং কৃতার্থতা। মূল কথা এই, সুখ হউক, বা দুঃখই হউক, তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া যাবতীয় অবস্থার মধ্যে আমি নির্ব্বিকার নিত্যশান্তি, আমার সেই শান্তিস্বরূপে স্থিতি করতঃ দৈহিক আধ্যাত্মিক পারিবারিক বৈষয়িক সামাজিক এবং পারমার্থিক তাবৎ কার্য্য নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করিতে থাক।

ভগবদুক্তির সারবত্তা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তত্ত্বপিপাসু শ্রীজীব বলি-লেন, "দেব, তুমি যে সকল অকাট্য নীতির উপদেশ প্রদান কর, এবং যে ভাবে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে বল, তাহা শুনিতে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু পৃথিবীর কার্য্যচক্রের ভীষণ আবর্ত্তমধ্যে পড়িলে সে সকল সূক্ষ্ম সুনির্ম্মল জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখা যায় না। আমি বারংবার তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। মন অভ্যাসবশতঃ অজ্ঞাতসারে কার্য্যফল লাভের দিকে এমনি বেগে ধাবিত হয় এবং ক্রমে তাহাতে এমনি অধিকতর অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ আর থাকে না। তখন যেন আমিই কর্ম্মকর্ত্তা এবং আমিই ফল বিধাতা। তুমি বলিতেছ, ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া সমস্ত কার্য্য কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে সমাধা করিতে হইবে, কর্ত্তব্যই

একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু আমি দেখিতেছি, স্বার্থচরিতার্থ এবং ফলপ্রত্যাশাই কর্ত্তব্য কার্য্যের উত্তেজক শক্তি। যে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার কোন আশা নাই, তাহা সাধনে আদৌ ইচ্ছা হয় না; তাহাতে উৎসাহও জন্মে না। ফল লাভের আশায় কিম্বা হাতে হাতে ফল প্রাপ্ত হইলে উৎসাহের সহিত বেশ কার্য্য করিতে পারি। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে কোন রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে পারি। ভাবীবংশের আত্মীয় অন্তরঙ্গ জনের সুখ সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় কার্য্য করিতে পারি। লোকের প্রশংসা সুখ্যাতিও পরহিতানুষ্ঠানের এক প্রধান প্রবর্ত্তক, সুতরাং তাহা লাভের জন্য কার্য্য করিতে পারি। অনেক সময় কর্ম্মের নেশায় এবং অভ্যাস গুণে কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু পরিশ্রম সফল হইবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই, হয়তো নিশ্চয়ই কোন ফল পাইব না, এইরূপ চিন্তা এবং বিচার যখন মনে উদয় হয়, তখন কার্য্যে উদ্যমে স্ফূর্ত্তি কিছুই থাকে না। এমন কি, পরহিতাদি ধর্ম্মের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও এই ফলপ্রত্যাশার বিলক্ষণ প্রভাব দেখিতে পাই। বিশেষতঃ আত্মরক্ষা এবং পারিবারিক নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে তোমার অনুমোদনের পরিবর্ত্তে ফলপ্রত্যাশা যেন মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন কার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম করিয়া শেষ কোন কারণে যদি ফল না পাই, ক্ষোভ নিরাশায় তখন হৃদয় যেন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে; মনে হয় যেন মুখের গ্রাসটী কেহ কাড়িয়া লইল। সে অবস্থায় তোমার প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা শুকাইয়া যায়। এমন কি, তাহা হইতে ক্রমে মানুষ অবিশ্বাসী নাস্তিকবৎ হইয়া শেষ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলে।

আচার্য্য। অভিমান জাত সকাম কর্ম্মের কি বিষময় ফল তাহা ইহা দ্বারা বুঝিয়া লও।

শিষ্য। তাহাত বুঝিলাম, কিন্তু কিছু কিছু আশু ফল না পাইলে চলিবে কি প্রকারে? তাহাতে যে মন সর্ব্বসংশয়ী হইয়া উঠে? নিরাশ মনে কি কিছু করা যায়?

আচার্য্য। মানুষের সকল চেষ্টাই যে বিফল হয় তাহা নহে। আবার নৈরাশ্য বা নিষ্ফলতা এবং সফলতা উভয়ের মধ্যেই তামার গূঢ় অভিপ্রায় আছে। চরিত্র বিকাশ এবং গঠন তাহার উদ্দেশ্য। কেবল আদর, লোভ, সৌভাগ্য সুখে

মানুষ দেবতা হইতে পারে না। কি ফল তুমি চাও তাহাও অনেক সময় জান না। আপাত সুফলের বীজে ভবিষ্যতে আবার কত কুফলও ফলে। অর্থাৎ ফলের পরেও ফল আছে। শেষ ফল, চরম ফল কি তাহা তোমার জানা উচিত।

শিষ্য। সেত হইল অনন্ত কালের খেয়া, ততদিন ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া সংসার চালাইব কিসের বলে?—কি খাইয়া? সঙ্গে সঙ্গে কিছু নগদ চাই।

আচার্য্য। বিশ্বাস ভক্তির বলে, আশায় নির্ভর করিয়া কার্য্য কর, পরিণাম ভাল হইবে। নগদও আমি অনেক দিই, কত সময় আগামী দাদন করিয়াও রাখি। বিনা শ্রমেও কত লোক প্রচুর বেতন পায়।

শিষ্য। যাই হউক, হাতে হাতে ফল না পাইলে চলে না। কেবল আধ্যাত্মিক শান্তি প্রেম বৈরাগ্য ধ্যান জ্ঞান নহে, ইন্দ্রিয়গোচর আপাতরম্য পার্থিব ফল প্রাপ্তি বর্ত্তমান জীবনের সুবহু কার্য্যের প্রবর্ত্তক।

আচার্য্য। পৃথিবীর প্রচলিত কার্য্যরীতি এবং কার্য্যনীতি এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র। তুমি বাল্য কাল হইতে সেই শাস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই প্রণালীতে কার্য্য করিতে শিখিয়াছ, সেই জন্য আমার শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছ না। ফলের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া ফলবাদী মনুষ্যসমাজ যে সুবিধাজনক দুর্নীতি-মিশ্রিত স্বার্থপর নীতি এবং রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহার সঙ্গে আমার শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনৈক্য। কার্য্যফলের প্রতি যেন কখন তোমার আসক্তি না হয় ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু জেন, আমার আদিষ্ট কর্ত্তব্য কখন নিষ্ফল নহে। অথচ কোন্ কার্য্যের কি ফল তাহা তুমি বিষয়বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসা করিতে পারিবে না। কর্ম্মের গতি যেমন দুর্ব্বোধ্য, ফলের গতিও তেমনি অতি সূক্ষ্ম এবং দুর্ব্বোধ্য। অল্পবুদ্ধি মানব কেবল স্বার্থসাধক ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ আশু ফলের প্রতিই চাহিয়া থাকে, এবং তাহা দেখিতে না পাইলেই হতাশ হয়। কোন্ কার্য্যের কি ফল, কত দিনে, কোথায়, কত প্রকার প্রণালীর ভিতর দিয়া কি নিয়মে এবং কিরূপ আকারে পরিণত হইবে তাহা তুমি সীমাবিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে সহসা দেখিতে পাইবে ইহা সম্ভব নহে। তাহা কেবল আমিই জানি। এবং আমার যাহারা শরণাগত বিশ্বাসী ভক্ত তাহারা দিব্যজ্ঞানালোকে

ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে কতক জানিতে পারে। আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিষ্কাম-ভাবে আমার আদেশজ্ঞানে কার্য্য করিয়া যাও, ফল নিশ্চয় ফলিবে। সে ফল তোমার অথবা তোমার পরিবারস্থ পুত্র পৌত্র প্রভৃতি অব্যবহিত আত্মীয় জনের ভোগে না আসুক, বংশপরম্পর এই বিশাল মনুষ্যপরিবার তাহা ভোগ করিবে। ইহলোকে, তোমার জীবিত কালে, কিম্বা দুই পাঁচ বৎ-সরের মধ্যে কি কোন সাধু সঙ্কল্পের শেষ ফল তুমি দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পার? তাহা যদি কর, কি ফল তুমি চাও, তাই তুমি জান না। আপাত নিষ্ফ-লতা ভবিষ্যৎ সফলতার কারণ; এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা সুফলপ্রদ তাহাও অনেক সময় অনিষ্টের কারণ জানিবে। বস্তুতঃ প্রকৃত শুভ ফল এবং শেষ ফল আমার হাতে। তোমার কেবল কার্য্য করিবার অধিকার আছে, ফল আমি যথা-সময়ে প্রদান করিব। গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায়-পূর্ণ আমার শিক্ষা শাসনের দিকে প্রসন্ন হৃদয়ে আশাপূর্ণ মনে চাহিয়া কার্য্য করিয়া যাও, সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদরূপ ফল পাইবে। নৈরাশ্য ক্ষোভ বিষাদের অন্ধকার ভেদ করিয়া শান্তিফলপ্রদ কল্প-বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। যে ফলে নিত্য তৃপ্তি, পরম সন্তোষ লাভ হয়, আমার ভক্তেরা তাহাই প্রার্থনা করেন। আমার প্রসন্ন মুখ দরশন, অনুমোদন বাক্য শ্রবণই তাঁহাদের চরম পুরস্কার। তুমি কেবল আপনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা আপনার অনুগত আত্মীয় দশ পাঁচ জন সম্বন্ধে আশু ফলাফল বিচার করিয়া থাক। আমি নিত্য কালের জন্য সমুদায় অখণ্ড মানব জাতি সম্বন্ধে উহা দেখি। এই জন্য তোমার সঙ্গে আমার এত প্রভেদ উপস্থিত হয়। ফলা-ফলতত্ত্ব আজ এই পর্য্যন্ত বলিলাম।

শ্রীজীব ভগবানের শ্রীমুখাৎ এই সকল সারগর্ভ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কর্ত্তব্যকার্য্যের সহিত ফলাফলের নিগূঢ় সম্বন্ধ চিন্তা করিতে করিতে এক অনন্ত সুগভীর তত্ত্বরাজ্য স্তরে স্তরে তদীয় মানসনেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল।

কর্ম্মযোগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যোগযুক্ত কর্ম্ম।

পরম ধীমান চিদানন্দ এতাবন্মাত্র শ্রবণ করিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে

পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! শ্রীজীব যে দুরতিক্রমণীয় কর্ম্মবন্ধন বা কর্ম্মাসক্তির কথা বলিলেন, তদ্বিষয়ে শেষ এবং পরিষ্কার সিদ্ধান্ত কি? ইহাই জানিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন। কর্ম্মক্ষেত্রে থাকাই যদি মানবের নিয়তি হয়, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান ভক্তির উচ্চ সোপানে আরোহণ করাই যদি তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য, তবে কর্ম্মবন্ধন, বিষয়প্রলোভন, সংসারাসক্তি হইতে চিত্তকে নির্ব্বিকার রাখিবার উপায়ত জানা আবশ্যক।"

সদানন্দ বলিলেন, "পুত্র, কর্ম্মযোগ সাধনের চরম সিদ্ধির জন্য তুমি অতি সঙ্গত কথারই অবতারণা করিয়াছ। বস্তুতঃ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্যাগী সন্ন্যাসী পরগলগ্রহ হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ কিম্বা নিজে মহান্ত গোসাঞী হইয়া শিষ্য অনুচরগণের সাহায্যে বৈরাগ্য সাধুতা প্রদর্শন ইহা সহজ। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া চিরজীবন অভ্যস্ত কার্য্যের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ইহা আরো সহজ। একবার তাহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেই হইল, তার পর আর কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু পরীক্ষাপ্রলোভনপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা পরমপুরুষের ইচ্ছাতে তাঁহার অনুমোদিত কর্ত্তব্যগুলি নিষ্কামভাবে সাধনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি উপার্জ্জন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; অথচ ইহাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

চিদানন্দ। এ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা এবং কার্য্যকর উপায় কি তাহাই এখন আমাকে বুঝাইয়া দিন। যত দূর পর্য্যন্ত আমার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং শ্রীজীব মহাত্মাও যাহার কাঠিন্য অনুভব করিয়াছেন, আমিত দেখিতেছি, ইহা সম্ভবই মনে হয় না। কাজে ভাবে এক কি হইতে পারে? কাজ করিব, না ভাব রাখিব? দুই দিক এক সঙ্গে রক্ষা পায় না। বুদ্ধি বিবেচনা এবং উৎসাহের সহিত দৈহিক কার্য্য এবং শান্ত নির্ব্বিকার অন্তরে আধ্যাত্মিক যোগানুভব, এ দুয়ের মধ্যে কি সামঞ্জস্য থাকিতে পারে? যুগপৎ এক সঙ্গে দুই কাজ কিরূপে করিব বুঝিতে পারিতেছি না। ভোগত্যাগ যদিও প্রথমে কষ্টকর, কিন্তু একবার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা করিতে পারিলে ক্রমে তদ্বিষয়ে অন্তঃকরণ বশীভূত হয়। তখন ভোগ্য বিষয় সকল হইতে সাবধানে দূরে থাকিলে অনায়াসে নিরাপদে নির্ব্বিকার শান্ত চিত্তে কাল কর্ত্তন করা যাইতে পারে। কিন্তু কঠিন কথা এই যে গৃহী ব্যক্তি সংসার পরিবারের যাবতীয়

বিষয়সুখ সম্ভোগ করিবে, অথচ অনাসক্ত বৈরাগী থাকিবে। ভোগের সঙ্গে সঙ্গে আসক্তি জড়িত। তাহার ঠিক পরিমাণ বুঝিয়া তাহা রক্ষা করা অতীব দুরূহ কার্য্য। অথচ নিক্তির ওজনে তুমি পাপ পুণ্যের বিচার করিবে। একটু এদিক ওদিক হইলে তাহাকে দণ্ডার্হ অপরাধী বলিয়া ধরিবে। অতি বড় মহা সাধুও কি তোমার বিচারে নিরপরাধী থাকিতে পারেন? এ কথা ভাবিতেও যে ভয় হয়। এইজন্য অনুরাগী ধর্ম্মাত্মারা একবারে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া বনে চলিয়া যান। আসক্তি ও মোহ অন্তরের অতি সূক্ষ্মতম ভাব, কু-অভিপ্রায়ও তাই, অনেক সময় অলক্ষিত গতিতে তাহাদের উদয় হয়; এ সকলকে তোমার শাসনাধীনে রাখিতে গেলে অন্য দিকে মনই দেওয়া যায় না। বৈধ ভোগ এবং স্বাভাবিক অভাব পূরণ সময়ে ঠিক পরিমাণ বুঝিব কি প্রকারে? আপনি আমায় বড় বিপাকে ফেলিলেন দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষা বনগমন ভাল বোধ হয়। আপনার এ নবযোগ ধর্ম্মের কথা ভাবিলে আমার মাথার ভিতর যেন কেমন করে।

সদানন্দ স্মিত মুখে বলিলেন, "ইহা কঠিন সাধন বটে, কিন্তু ইহার সিদ্ধিও আছে, এবং তাহা প্রকৃতির অনুগামী স্বাভাবিক। তুমি আগে থাকিতে এত ভীত হও কেন? চঞ্চলতা প্রকাশ করিও না, স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি নিজ জীবনেও ইহার পরীক্ষা করিয়া ফল পাইয়াছি। ঠিক এই বিষয়েই শ্রীজীব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে "দেব, এক দিকে বাহ্য জগৎ এবং শরীর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, অপর দিকে তুমি চিদানন্দ স্বরূপ এবং আত্মার ধ্যান জ্ঞান যোগ এবং বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি, উভয়ের কার্য্যতঃ সামঞ্জস্য কিরূপ আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।" প্রশ্ন শুনিয়া আচার্য্য পরমগুরু অনন্তদেব বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তুমি কিরূপ চেষ্টা করিয়া থাক, এবং তাহার ফলাফলই বা কত দূর জানিতে সক্ষম হইয়াছ?"

শ্রীজীব। বাহিরের কাজে কর্ম্মে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল বাহ্য বিষয়ের সহিত যখন মিলিত হয় তখন ভিতরে যোগের জমাট আর রাখিতে পারি না। এমন কি, অনেক সময় বিষয় কার্য্যই ভাল লাগে, উপাসনা ভজন সাধনে রুচি জন্মে না। তখন বিষয়বুদ্ধি বলে, "চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই কি উপাসনা হয়? কাজই উপাসনা।" বিশেষতঃ যে যে বিষয় এবং কার্য্যের সহিত

ইন্দ্রিয়সুখভোগাসক্তি এবং পার্থিব স্বার্থসম্বন্ধ জড়িত আছে তাহার দর্শন স্পর্শনে চিত্ত একবারে বিভ্রান্ত বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠে। তখন অধ্যাত্ম বিষয়ে ধারণা শক্তি একেবারে যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাহ্য জগতের রূপরসগন্ধই সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; আত্মা পরমাত্মার যোগ যেন কল্পনা মনে হয়। আত্মার উপর বাহ্য পদার্থের কি ভয়ানক প্রভাব! ইন্দ্রিয়গোচর দৃশ্য স্পৃশ্য বিষয়ের সংযোগে অতীন্দ্রিয় চিন্ময় আত্মা কেন নিমেষ মধ্যে তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া উঠে? ফলতঃ কার্য্যকালে কার্য্যপ্রণালী, কার্য্যচিন্তা এবং কার্য্যকৌশল, তদ্বিষয়ে সিদ্ধি লাভ, এবং স্বার্থসাধনই সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। তুমি চালাইতেছ আমি চলিতেছি, তুমি বুঝাইয়া দিতেছ আমি বুঝিতেছি, তোমার নিষেধ বিধির অনুজ্ঞা শুনিতেছি আর তৎসঙ্গে কার্য্যে নিবৃত্ত কিম্বা প্রবৃত্ত হইতেছি; ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া এরূপ সাক্ষাৎ জীবন্তযোগ অনুভব করিতে পারি না। রেল গাড়িতে উঠিবার কিম্বা নাবিবার সময়, অথবা জনাকীর্ণ রাজপথে চলিবার কালে যেমন সর্ব্বদা সতর্ক ভাবে চারিদিকে চাহিয়া সাবধানে পদ নিক্ষেপ করিতে হয়, তখন অন্য দিকে চিত্তাভিনিবেশ করা যায় না, কর্ম্মক্ষেত্রে বৈষয়িক কার্য্যের স্রোতে তেমনি মন যখন ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাকে তোমার অভিমুখী করিয়া রাখিতে পারি না। ক্রমে তোমার বর্ত্তমানতা এবং দিব্য দৃষ্টি কার্য্যের গোলেমালে শেষ কোথায় হারাইয়া ফেলি। পূজার ঘরে পুনরায় স্থির হইয়া বসিতে না পারিলে আর আপনাকে এবং তোমাকে ধরিতে পারি না। কার্য্য করিতে গেলে ভাব থাকে না, আবার ভাব রাখিতে গেলে কাজ ভাল হয় না। একটু যদি অন্য মনস্ক হই, অমনি হয়তো ঠিকে ভুল হইবে, না হয় কেহ ঠকাইবে। একটু অসতর্ক ভাবে পথে চলিলেই অমনি হয় মাথায় টকর লাগে, না হয় পা উচু নীচুতে পড়ে। এমন বন্ধুর স্থানে, চিত্ত-বিভ্রান্তকারী কার্য্যক্ষেত্রের বিষম হট্টগোলের ভিতর তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না, পদে পদে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। যাই ধ্যান উপাসনার পর চক্ষু খুলিয়া বাহিরে পদ নিক্ষেপ করি, অমনি দেখি আর এক রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চক্ষের ভিতর দিয়া বিবিধ রূপের ছায়া, কর্ণের ভিতর দিয়া নানাবিধ শব্দ এবং বাক্যকোলাহল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া নিমেষমধ্যে মনকে চঞ্চল করিয়া ফেলে। তৎসঙ্গে পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান সংস্কার ভাবযোগ কতই যাওয়া আসা করে। ফলতঃ কার্য্যের দায়িত্ব ভাবনা, এবং তাহার বিশাল

বিঘূর্ণিত চক্রমধ্যে পড়িলে অন্য আর কিছুই মনে থাকে না, তখন যেন আমি একটী কার্য্যযন্ত্রবিশেষ। কোন কাজ যদি না করিতে হয়, বহিরিন্দ্রিয়গণ কূর্ম্মের ন্যায় যদি অন্তরমুখী থাকে, তখন বেশ তোমার সহিত যোগানুভব করিতে পারি। কিন্তু সংযতেন্দ্রিয় হইয়া উৎসাহের সহিত কোন কার্য্যে দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি বিবেককে এক সঙ্গে সমঞ্জস ভাবে নিযুক্ত রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র যোগের জমাট, সংযমের দৃঢ়তা অমনি শিথিল হইয়া যায়।

সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী আচার্য্য বলিলেন, "সাধারণ মানব জীবন এই রূপই বটে। তন্নিমিত্তই কর্ম্মযোগ সাধনের আবশ্যকতা। কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ত্বদর্শী আমার উপাসক যাহারা তাহাদের জীবন লৌহবর্ত্ম সংলগ্ন বাষ্পায় শকটের ন্যায় যদিও মহাবেগশালী, তথাপি নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত। যোগশক্তি এক অবিভাব্য অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহার কার্য্য বিচিত্র; জীবনের বিচিত্র বিমিশ্র কর্ত্তব্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া সজ্ঞানে সেই যোগশক্তি স্রোতের ন্যায় চলিবে। দেহ মন বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, অথচ আত্মার গতি পরমাত্মার অভিমুখীন। এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা আরাধনা সাধনের আবশ্যকতা আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন অন্তর বাহির, জড় চৈতন্য, কার্য্য ভাব, স্রষ্টা সৃষ্ট, সমুদায়কে এক অখণ্ডরূপে দেখিতে হইবে। আমি যেমন দেবালয়ে তপস্যাকুটীরে যোগীর যোগধ্যানে, বিদ্যালয়ে তত্ত্বদর্শীর তত্ত্ব জ্ঞানে, ভক্তের প্রেমমত্ততার ভিতর সচ্চিদানন্দরূপে বর্ত্তমান, তেমনি বিষয়-ক্ষেত্রে বাণিজ্য স্থানে, হট্টমন্দিরে কর্ম্মীর মস্তিষ্কে ও হস্তে, তাহার কার্য্যশক্তি এবং বিষয়বুদ্ধির ভিতরেও কর্ম্মকর্ত্তারূপে বিরাজিত। আমি এক অখণ্ড, প্রকাশ আমার কেবল বিভিন্ন। অতএব হে শরীরধারী জীব, সাকার দৃশ্যের ভিতর নিরাকার নিয়ন্তা শক্তি যে আমি, আমাকে তুমি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে অনুভব করিবে। বস্তুতঃ কাজ এবং উপাসনা দুই নহে, একই বিষয়। আত্মবোধের ভিতরে ব্রহ্মবোধ সাধনবলে যে পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইবে সেই পরিমাণে অবিচ্ছেদে কর্ম্মযোগের মধ্যে তুমি আমার সর্ব্বগত অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাইবে। ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ববোধ চলিয়া গেলে কাজে ভাবে আর মিলাইতে হয় না, আপনিই মিলিয়া যায়। তখন অন্তরে বাহিরে এক স্রোত বহিতে থাকে। আমি

কর্ম্মকর্ত্তা, কার্য্য আমার, কার্য্য সাধনের যন্ত্র স্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মনোবুদ্ধির ভিতর আমি, তোমার উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের ভিতরেও সেই আমি যদি রহিলাম, তবে আর কার্য্যকালে আমার সহিত যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ইহার ভিতর তোমার কর্তৃত্বের স্বতন্ত্রতা এবং স্বার্থ অনুভূত হওয়াতেই আমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটে। আমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া কার্য্য সমস্ত বেশ ভালরূপেই করা যায়। ফলের প্রতি একান্ত লক্ষ্য রাখিয়া কেবল তাহাই পাইবার জন্য যেমন নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাক, তেমনি আমার অনুমোদনই সমস্ত কার্য্যের যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে কেনই বা তাহাতে সিদ্ধকাম না হইবে? এক একটী করিয়া গণিয়া গণিয়া আমার ইচ্ছার সঙ্গে কেহ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম মিলাইতে পারে না। সাধনবলে স্বভাব অনুকূল হইবে, তখন ধর্ম্মসংস্কারগুণে আপনা হইতে তোমার জীবনগতি আমার অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকিবে। তাবৎ বিষয়েই সাধনের ফল এইরূপ শেষে সংস্কার বদ্ধ হইয়া যায়। "আমি কেবল সাক্ষী মাত্র, আমার শক্তি ও বৃত্তি সকল তোমার ইচ্ছায় নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, আমি কিছু নই।" এই জ্ঞানটী কেবল দিবা নিশি সাধন কর।"

"ইতি পূর্ব্বে যখন তুমি আমার বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলে, তখন কি আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে আদ্যন্তমধ্যে সর্ব্ববিধ কার্য্যকৌশল এবং উপায় উদ্দেশ্যের অভ্যন্তরে দেখিতে পাও নাই? সেই বিশ্বাসসূত্র এখানে সংলগ্ন করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবে। কর্ম্ম ছাড়া আমাকে কে ভাবিতে পারে? ধ্যান চিন্তাতেও জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া নিবদ্ধ আছে। বাহিরের কার্য্যক্ষেত্র যতই কেন জটিল অন্ধকারাচ্ছন্ন হউক না, বিবেকশক্তিরূপে আমি তোমাতে সর্ব্বদা আছি; দায়িত্ব ভার সর্ব্বতোভাবে আমার হস্তে দিয়া, সেই বিবেক প্রদীপ ধরিয়া কুটিল বক্র তমসাবৃত সংসারপথ দিয়া চলিয়া আইস, পরিণামে আমার নিত্য তুরীয় সত্তাসন্নিধানে পৌঁছিতে পারিবে।" এক্ষণে বিশ্বের কেন্দ্রীভূত মূলশক্তি যে আমি, সর্ব্বদা আমার প্রতি একাগ্র দৃষ্টি সম্বদ্ধ রাখিয়া কর্ম্মচক্রের পরিধিমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ কর।"

জীব। সমস্ত কার্য্যের অব্যবহিত প্রবর্ত্তক শক্তি কি বিবেক, না ইচ্ছা?

ব্রহ্ম। ইচ্ছাই প্রবর্ত্তক বটে, কিন্তু সেই ইচ্ছা নানাবিধ ভাবোদ্গমের

অধীন। অনেক সময় অন্ধভাবে পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ সে অনেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কখন ইচ্ছা হইল, কখন বা কার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইল, এ প্রভেদ তৎকালে বুঝা যায় না। অবশ্য আত্মরক্ষার্থ অনেক কাজ স্বভাবতঃ যন্ত্রবৎ আপনাপনি হয়। কিন্তু প্রত্যেকের ভিতর ইচ্ছাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা দ্বারা কর্ম্মগতি রোধ হইতে পারে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত ইহার এত ঘনিষ্ঠ যোগ যে উভয়ের কার্য্য কারণ যোগসূত্র সহজে ধরা যায় না। তথাপি ইচ্ছা যন্ত্রী কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যন্ত্র। সেই যন্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইচ্ছাটি বিবেকসঙ্গত অর্থাৎ আমার অনুগামী কি না তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। বিবেক কার্য্যকারিণী শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না, কিন্তু সে আমার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার কোথায় বিচ্ছেদ কিম্বা মিলন তাহা বুঝাইয়া দেয়।

শ্রীজীব ভগবদ্বাণী শুনিতে শুনিতে যেন শেষ এক অনন্ত একত্বে মিশাইয়া গেলেন এবং পুনরায় ধ্যাননেত্রে কার্য্যক্ষেত্রে বিশ্বকর্ম্মার বিচিত্র লীলা দর্শন করতঃ ক্ষণকালের জন্য তন্ময়ত্ব লাভ করিলেন।

কর্ম্মযোগ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রাচীন শাস্ত্রবিচার।

পিতৃদেব মুখে কর্ম্মযোগের গূঢ় তাৎপর্য্য শুনিয়া চিদানন্দ তদ্বিষয়ে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্তির পর বলিলেন, "ইহা সত্য বটে। সর্ব্বভূতে যখন ভগবান অবস্থিতি করিতেছেন, আদি অন্ত মধ্য, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া, উপায় এবং উদ্দেশ্য, কার্য্য কারণ, সাধন সিদ্ধি সমস্তই যখন তাঁহা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত, তখন যোগভ্রষ্ট হইবার প্রতি কারণ কেবল এক মাত্র মোহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?" ক্ষণকাল চিন্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য! প্রাচীন গীতা শাস্ত্রে আপনার নিকট কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলাম এবং এক্ষণে তদ্বিষয়ে ভগবদ্বাক্য যাহা শুনিলাম, এ উভয়ের মধ্যে আমি যেন কিছু পার্থক্য অনুভব করিতেছি। প্রাচীন গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি আপনার গুণ অনুসারে দৈহিক কর্ম্ম করে, আত্মা তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য উদাসীন নির্লিপ্ত সাক্ষীমাত্র। প্রকৃতির বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য ক্রিয়া সকল অবশ্যম্ভাবী,

যাহার যে কার্য্য প্রকৃতির নিয়মাধীনে সে তাহা করিবেই করিবে, তদ্বিষয়ে তাহাকে কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয় প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্মই যুদ্ধ করা। তাই যদি হইল, তবে এখানে জীবাত্মার ব্যক্তি-গত কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থাকে কৈ? প্রকৃতির গুণ কর্ম্ম যদিও নিয়মাধীন এবং সীমানিবদ্ধ, তথাপি তাহা অন্ধশক্তি; পুরুষের দিব্য জ্ঞানময় বিবেক যদি তাহার নিয়ামক না হয়, তাহা হইলে মানবগণের দেহসম্বন্ধীয় ব্যবহারিক ক্রিয়ার সহিত পশু ও জড়ের কার্য্যের প্রভেদ কি রহিল? দেহধারী মনুষ্যগণের দৈনিক কার্য্যের ভিতর দিয়াইত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবন বর্দ্ধিত হয় জানি। কিন্তু সে ব্যবহারিক জীবন যদি হয় মায়া এবং ত্রিগুণাত্মক পঞ্চভূতের ক্রিয়া, তাহা হইলে ধর্ম্ম, পরকাল ইত্যাদিরত কোন অর্থ ই থাকে না।

সদানন্দ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত সংযত এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত থাকিলে প্রকৃতি অনুকূল হয়, তখন সহজেই দেহ ইন্দ্রিয়গণ ঠিক পথে চলে। তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কারবদ্ধ ক্রিয়াগুলিও কর্ম্মযোগের অনুসরণ করে; কারণ, তাহারা জীবাত্মার ইচ্ছাপরতন্ত্র।

চিদানন্দ। গীতাকার আরো বলিতেছেন, "যুদ্ধে জয় হইলে পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগ, পরাজিত বা মৃত হইলে স্বর্গ লাভ।" এখানে ফলের প্রতি এক দিকে কামনা উদ্দীপন করিবার চেষ্টা, অপর দিকে ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে; এরূপ ব্যামিশ্র উপদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? প্রাকৃতিক গুণ যদি আপনার প্রকৃতি অনুসারে তাহার কার্য্য সে করিবেই করিবে, এবং তাহার সঙ্গে আত্মার কোন পাপ পুণ্যের সম্পর্ক নাই, তবে আবার এ কথা কেন বলা হইল যে, ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে তুমি স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে,—লোকে চিরকাল তোমার অযশ কীর্ত্তন করিবে,—মহারথীগণের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না?" আবার ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ফলাফলে যদি দৃষ্টি করিবে না, তবে যুদ্ধ কিসের জন্য? সমস্তই যদি মিথ্যা মায়া, তবে যুদ্ধ করাটাও কেন মায়ার মধ্যে গণ্য হইল না?

পিতা। দয়া মায়া ভুলিয়া, ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া নিষ্কাম ভাবে ক্ষত্রোচিত কর্ত্তব্য পালনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

অবশ্য ইহার ভিতর রাজকীয় গুরুতর কর্ত্তব্য নিহিত ছিল। যেখানে কর্ত্তব্য সেখানে লৌকিক মায়া মমতা পরিহার্য্য। তবে যে লোকনিন্দা, পাপভয় কিম্বা রাজ্য ও স্বর্গভোগের কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় উক্ত সংগ্রামের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র, তাহা প্রবৃত্তিমূলক মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভগবদ্গীতার সমস্ত শিক্ষা—কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ দৃশ্যতঃ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-কর্ত্তব্য উদ্দীপিত করিবার নিমিত্তই বিবৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তদুপলক্ষে গ্রন্থকার কবি সাধারণ ভাবে উক্ত ত্রিবিধ যোগের সাধারণ লক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুদ্ধের সঙ্গে বাস্তবিক গীতাতত্ত্বের কোন যোগ নাই। উহা ঠিক ঐতিহাসিক সত্যও নহে। গল্পের সম্বন্ধ ঠিক রাখিবার জন্য "অতএব তুমি যুদ্ধ কর" ইত্যাদি বাক্য বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। শেষ ভাগে সে কথাটা অতি বিস্তৃত ব্যবধানে আছে।

পুত্র। তাহা হইলে এ স্থলে ঈদৃশ কথার অবতারণা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, এখানে ব্যামিশ্র দোষ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। আর এক কথা এই, যোগধর্ম্মের সহিত নরহত্যাদি যুদ্ধবিষয়ক কর্ত্তব্যের কি সামঞ্জস্য হইতে পারে? মায়ার জগতে ব্যবহারিক কর্ত্তব্যও কি মায়া নহে?

পিতা। তোমার ন্যায় আধুনিক শিক্ষিত যুবকের কূট প্রশ্নের মীমাংসার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকার গীতা রচনা করেন নাই, কেবল বেদান্ত সূত্রের অনুসরণপূর্ব্বক পৌরাণিক ধর্ম্মবিশ্বাস এবং নৈতিক বিধির ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মবিজ্ঞানের নির্গুণ তত্ত্ব এবং গূঢ় সত্য তখন এইরূপ কল্পনামিশ্র ঐতিহাসিক চরিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে বিবৃত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর প্রাচীন অনেকানেক শাস্ত্র এই প্রণালীতে লিখিত।

পুত্র। তবে ভগবদ্গীতোক্ত ঘটনা সকল কি ঠিক ইতিহাসমূলক সত্য ঘটনার উপর সংস্থাপিত নহে?

প্রশান্তাত্মা বর্ষীয়ান ব্রহ্মর্ষি পুত্রের সরল জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, "বৎস, তোমার এ সমস্ত গূঢ় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গেলে বর্ত্তমান যুগের অনেকানেক ভক্ত বিশ্বাসী সাধুজনের বদ্ধমূল প্রাচীন সংস্কারের উপর মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিতে হয়। কাজ কি তাহাতে! স্বদেশ বিদেশের পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল সহজজ্ঞান-সঙ্গত সার্ব্বভৌমিক এবং সুযুক্তিসম্পন্ন সত্য—

তত্ত্ব, সাধনপ্রণালী, পবিত্র নীতি, সাধু দৃষ্টান্ত, আধ্যাত্মিক গভীর চিন্তা এবং স্বাভাবিক সুমিষ্ট ভক্তিভাব আছে তাহাই কেবল তোমার জন্য প্রয়োজন, প্রত্নতত্ত্বের ঐতিহাসিক জটিল বনে কেন তুমি বৃথা ভ্রমণ করিবে? অস্মদাদির দেশে আর্য্য জাতির মধ্যে অমিশ্র সত্য ঘটনাপূর্ণ ধারাবাহিক যথার্থ কোন ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহাও ধর্ম্মকর্ম্ম, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিবার কেবল উপলক্ষ মাত্র। তদ্ব্যতীত সে সকল আবার কল্পনা কবিত্বে আবৃত। সেই জন্য তোমার নিমিত্ত আমি এই বিশুদ্ধ "ব্রহ্মগীতা" যাহা সার্ব্বভৌমিক চরিত্র শ্রীজীবানন্দ মহাত্মার মুখে শ্রুত হইয়াছি তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছি।

পুত্র। অবশ্য, আমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই আপনি এই নব গীতা শুনাইতেছেন এবং আমিও ক্রমশঃ তাহাতে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি; কিন্তু আপনি যে পৃথিবীর পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কেবল সহজজ্ঞানমূলক সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব মাত্র গ্রহণ করিতে বলিলেন, তবে সেই সমুদয় তত্ত্বের সঙ্গে কি প্রকৃত কোন জীবনগত ব্যক্তিত্বের যোগ নাই? এবং তাহার কি প্রকৃত ইতিহাস নাই?

পিতা। তুমি দেখিতেছি আমাকে সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনার আবর্ত্তমধ্যে আনিয়া ফেলিতেছ, যেখানে যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না। নিতান্তই যদি তুমি ইহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া থাক, তবে বলিতেছি শ্রবণ কর।

এ দেশের প্রধানতঃ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যে সকল বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ মত প্রচলিত দেখিতে পাও, ইহাতে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ সর্ব্বময় ব্রহ্মেতে মানুষের ব্যক্তিত্ব লোপ পাইয়া যায়। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতীত জীব, জগৎ আর আর যাহা কিছু তাহা মিথ্যা মায়া অসৎ স্বপ্নবৎ, অথবা অবিদ্যাসম্ভূত। এরূপ মতে বিশ্বাসী যাহারা, বিশেষ ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের প্রতি তাহাদের অনুরাগ জন্মে না। যখন এক নির্ব্বিশেষ অখণ্ড নির্গুণ সত্তা ভিন্ন দ্বিতীয় সবিশেষ কিছুই নাই, অহং জ্ঞানাদি যাহা কিছু বিশেষ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তাহাও অবিদ্যার খেলা অনিত্য, তখন কে কাহার ইতিহাস লিখিবে? পাছে আবার নামের অভিমান হয় সেও একটা ভয় ছিল; সুতরাং নাম ধাম এবং দেশ কালের ইতিহাস, মতামত, কবিত্ব কল্প-

নার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। শিষ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা হয়ত কোন অবতার কিম্বা স্বীয় গুরুদেবের নামে প্রচার করিলেন। ইতিহাস একবারেই যে নাই তাহা নয়, কিন্তু কল্পনাজড়িত। সুতরাং ঘটনা সকল অধিক পরিমাণে স্বাভাবিক এবং সত্য হইলেও কোন্ জীবনের সে সব ঘটনা কবে কোথায় ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। ব্যক্তিত্বের অধিকার এ দেশের প্রাচীন আর্য্যেরা পাকা দলিলে রেজিষ্টারী করিয়া রাখিতেন না। ইহা অবশ্য মহা বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। আর্য্য মহাপুরুষেরা সমস্তই মূলাধার আদি পুরুষের অখণ্ড অবিভক্ত সত্তারূপ মহাসমুদ্রমধ্যে—কেহ গুরুদেবের নামে, কেহ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—আপনাপন জীবনের ঘটনাবিন্দু সকল নিমজ্জমান করিয়া দিতেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, সত্য যাহা তাহা সাধারণের সম্পত্তি। যে আধারে যখন তাহার উদয় হউক, নিজস্ব বলিয়া কেহ তাহা স্বীকার করিতেন না। "আমার আবিষ্কৃত সত্য, অন্যে আমার নিকট হইতে শিখিয়াছে, বা চুরি করিয়া লইয়াছে, ঈদৃশ অহংসূচক বাক্য অবিদ্যার মধ্যে গণ্য হইত। তাঁহাদের মতে আত্মা পরমাত্মা উভয়ই নির্গুণ এবং অভিন্ন। কিন্তু যখন এমন সকল নিগূঢ় অমর সত্য, সুগভীর জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনতত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা, পবিত্র দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তখন তাহা আকাশ হইতে পড়ে নাই, বিশেষ বিশেষ অসাধারণ কবি জ্ঞানী সাধু ভক্ত ঋষি তপস্বীর চিন্তা গবেষণা এবং প্রকৃত জীবনের ভিতর দিয়াই সে সব বাহির হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং সমবেত জীবনের যথার্থ ইতিহাসও কিয়ৎ পরিমাণে আছে। শ্রুতি স্মৃতি দর্শন মীমাংসা ইতিহাস পুরাণ কাব্য উপন্যাসলেখক জ্ঞানী কবিগণ যে দেবতা বা যে সাধুর মুখ দিয়া যে যে সার তত্ত্ব কথা বাহির করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ শ্রুতিমূলক কিম্বা পরোক্ষ স্মৃতিমূলক ঐতিহাসিক হউক বা কল্পিত হউক, যাহা সত্য তাহা নিত্য, এবং অমর। কোন্ জীবনের কিরূপ অবস্থায়, কোন্ বিশেষ সময়ে, কোথায় তাহা ঘটিয়াছে, কেইবা কবে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছে, ইত্যাদি আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস কোন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই প্রায় পাওয়া যায় না। এ দেশেত ছিলই না।

পুত্র। এ বিষয়ে আপনি আরো সব কথা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলুন। লোকের

ভ্রান্ত সংস্কারের উপর আঘাত যদি লাগে তাহাতে আর আপনার সঙ্কুচিত হওয়ার প্রয়োজন কি ? আপনিত সর্ব্বত্যাগী, অধিকন্তু পরলোকগমনোন্মুখ, সত্য প্রচার হইলে তাহার গৌরব অবশ্যই আছে। তদ্ভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কাল্পনিক মতের তো আমি কিছু মূল্য দেখিতে পাই না।

পিতা ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন, “বাপু হে, যাহা তুমি বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু ইহাতে অনেক বিপদ আছে। কেন না, আধুনিক ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মানুরাগ এবং পরলোকে আশা বিশ্বাস মতামত যত কিছু দেখিতে পাও ইহার যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। যাহারা বেশী বিচার করে, তাহারা ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, নাস্তিকবৎ। পক্ষান্তরে কল্পিত কাহিনীর উপর জনসাধারণের প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কার, অন্ধভক্তি, ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকাতে জাতীয় ধর্ম্মভয়, নীতিভয় এবং ভক্তিবৃত্তি জীবিত রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারাই সে সকল পরিপোষিত হইতেছে; তোমার ন্যায় কৃতবিদ্য তত্ত্বানুসন্ধায়ীর বিচারদন্তে পড়িলে তাহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু বিচার করিয়াই বা কয় জন ব্যক্তি সত্য সিদ্ধান্ত, বিশুদ্ধ বিশ্বাস ভক্তিতে উপনীত হইতে পারে ? তার চেয়ে কল্পনা হউক, অনৈতিহাসিক হউক, ঐতিহাসিক উপন্যাসমূলক হউক, বিশ্বাস ভক্তিটে থাকে এটা ভাল। সাধারণতঃ বৌদ্ধ বিচারপ্রিয় জ্ঞানী জগতের ধর্ম্মবিড়ম্বনা কত তাহাত দেখিতেছ ?”

“প্রাচীন বদ্ধমূল ধর্ম্মসংস্কার দ্বারা অপেক্ষাকৃত জনসমাজ, পরিবারে বিশ্বাস ভক্তির মর্য্যাদা রক্ষা পায়, কল্পনার সাহায্যে লোকে সাধু চরিত্র হয় তাহাতে মন্দ কি ? ফলত ভাল হইল। আর জ্ঞান বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের বিচার কুতর্ক যদি নাস্তিকতা দুরাচারের হেতু হয় তাহা কি প্রার্থনীয় ? কেবল বুদ্ধির বিচারানুরোধে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান এবং সাধু ভক্তের আনুষ্ঠানিক জীবনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি হ্রাস কিম্বা সমূলে তৎসমুদয় পরিত্যক্ত হইবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। কঠোর জ্ঞানী শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা কেবল নির্গুণ সত্তা অথবা অজ্ঞেয় কারণ মাত্র লইয়া বৃথা কুতর্ক করে, কিন্তু সৎ পদার্থের স্বরূপ লক্ষণ কি তাহা কেবল সাধু মহাত্মাদিগের জীবনেই প্রকাশ পায়; দর্শনশাস্ত্র কিম্বা বিচার সিদ্ধান্তের ভিতর তাহা নাই। পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল দেবস্বভাব-সম্পন্ন অসাধারণ মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে যতই

কেন অত্যুক্তি করুন না, তাহাতে যতই কেন কবিত্ব কল্পনা ভ্রম থাকুক না, তাঁহাদের চরিত্রসাহায্য বিনা তোমার আমার পক্ষে ধর্ম্মজগৎ একবারে যেন অন্ধকারময়। অতএব সহজজ্ঞান বিশ্বাসে ভক্ত মহাজনদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে যেন তোমার ত্রুটি না হয়। সাবধান! কদাপি তাঁহাদিগকে বিচারের বিষয় মনে করিবে না।

পুত্র। সে স্বতন্ত্র কথা। তথাপি প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান কেন করিব না? সত্যমূলক বিশ্বাস ভক্তিই প্রার্থনীয়। পাছে ভক্তি শুকাইয়া যায়, হৃদয় কঠোর হয় এই ভয়ে কি সত্যাপেক্ষা কল্পনার উপর অধিক নির্ভর করিব?

পিতা। না, তাহাও পার না। তোমাকে আমি জ্ঞান ভক্তির সামঞ্জস্য শিক্ষা দিবার জন্যই এই নবগীতার চরম সিদ্ধান্ত শুনাইতেছি। সুতরাং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের ঐতিহাসিক ভ্রান্তির কথা তোমার নিকট বলিতে আর আমার আপত্তি কি? ফলতঃ এ সম্বন্ধে অনেক হাস্যজনক ঘটনায়, অসঙ্গত প্রলাপ বাক্যে জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাস আছে। তাহারা আপনার মনকে বুঝাইতে পারে না, তথাপি বুঝিবার ভান করে। মনে কর, ঘোরতর সংগ্রামক্ষেত্র, সম্মুখে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমরোদ্যত সশস্ত্র শত্রুকুল দণ্ডায়মান, তুমি সে সময় সেই সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া হঠাৎ সারথির সঙ্গে সুদীর্ঘ গীতা শাস্ত্রের গভীর যোগ বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করিলে, তার পর যুদ্ধ করা উচিত বুঝিলে; এত দীর্ঘ সময় শত্রুপক্ষ কি বক্তৃতা শুনিবার জন্য নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবে? না সারথিসহ তোমার মুণ্ডচ্ছেদন করিবে? ঈদৃশ গল্প ঐতিহাসিক হইতেই পারে না। তাই বলিয়াছি, তুমি কেবল সত্য তত্ত্ব গ্রহণ কর। ইতিহাসে অনেক গোল। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে স্পষ্টই বলিতেছেন, "যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং এই উৎকৃষ্ট গূঢ় যোগ কহিতেছিলেন, আমি তাঁহারই প্রমুখাৎ **ব্যাস** প্রসাদে তাহা শুনিয়াছি।" ইহা যে ব্যাসের (কোন পণ্ডিত বিশেষ) রচনা, যুদ্ধ স্থলের উপদেশ নহে, তাহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন সুনিপুণ রিপোর্টার তথায় অবশ্য ছিল না।

পুত্র। ইহাতো সহজ জ্ঞানেরই কথা, কিন্তু ভাল ভাল তত্ত্ব কথার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত ইতিহাস শুনিতে পাইলে আরও তাহা বিশ্বাস্য এবং হৃদয়গ্রাহী হয়।

কর্ম্মযোগ—পঞ্চদশ অধ্যায়।

স্বধর্ম্ম এবং স্বাভাবিক কর্ম্মফল।

তদনন্তর শ্রীমৎ সদানন্দ গোস্বামী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ;—"ভগবদ্বাক্যে শ্রীজীবের যখন সংশয় বিদূরিত হইল এবং তিনি স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কার্য্য ব্যতিরিক্ত দেহধারী জীবনের কোন অর্থ নাই, ভগবান স্বয়ং কার্য্যরূপী, চিরকর্ম্মশীল, বিশ্বকর্ম্মা, যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ হয় বাহ্যিক না হয় আন্তরিক কোন না কোন কার্য্য করিতেই হইবে। এবং ইচ্ছাই এই সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তিনী কর্ত্তৃত্ব শক্তি। এই ইচ্ছাটী যদি দিব্যজ্ঞান, সাধুসঙ্কল্প এবং ভগবদিচ্ছার একান্ত অধীন হইয়া চলে, সে নিজের কোন পার্থিব নীচ স্বার্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, তাহা হইলেই কর্ম্ম-যোগ সুসম্পন্ন হয়। এইরূপ দৃঢ় ধারণার সহিত তিনি পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কার্য্যফল প্রাপ্তির কিছুই ক্রটি হয় নাই, বরং নিষ্কাম কার্য্যে আরো আশাতীত অধিকতর ফল ফলিয়াছিল। অথচ সে জন্য তাঁহার কোন অভিমান, মত্ততা কিম্বা আসক্তি নিরাশা জন্মিত না। পরিশ্লেষে বেশী দিন ধরিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোন বাহ্য অনুষ্ঠানের বিস্তৃত কার্য্যপ্রণালীর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান জন্য তাঁহাকে আর চিন্তা করিতেও হয় নাই। কার্য্য সকল ক্রমে আপনার নিয়মে আপনিই চলিত। তদনন্তর ক্রমে তিনি স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সাধারণ হইতে বিশেষ এবং দৈহিক হইতে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক নিত্যকর্ম্ম নিরাপদে সহজে নির্ব্বাহ করিতেন। তদবস্থায় একদা কর্ম্মযোগতত্ত্বের আরো বিস্তারিত বিষয় সকলের সম্যক অবগতির জন্য পরম গুরু সচ্চিদানন্দের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু, এই যে সমস্ত বহু প্রকারের কার্য্য, ইহার দায়িত্ব বিভাগ কিরূপ ? এ সম্বন্ধে কি কিছু জাতিভেদ আছে ?"

মধুরভাষী পরমাত্মা মৃদু মধুস্বরে বলিলেন, "অবস্থাভেদে কার্য্যভেদ আছে ; কিন্তু ইহা মানবজাতির বংশগত বা জন্মগত প্রভেদ নহে, গুণকর্ম্মানুগত, অবস্থাগত। সেই গুণ ত্রিবিধ যথা সত্ত্ব, রজ, তমঃ। এই গুণত্রয়ের বিভিন্ন

মাত্রার সংমিশ্রণে বিচিত্র প্রকৃতির জীব সকল মদীয় ইচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করত ক্রমবিকাশ প্রণালীতে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়তির দিকে ধাবিত হইতেছে। সকলে সকল কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু প্রতি জন তাহার প্রকৃতির অনুযায়ী বিশেষ কার্য্য সচ্ছন্দে সাধন করিতে পারে। এবং তাহারই জন্য আমার নিকট সে বিশেষ দায়ী। ত্রিগুণমিশ্র নিজ নিজ স্বভাবের গতি অবধারণ-পূর্ব্বক সেই কার্য্য কি তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়; ইহাকেই বলে স্বধর্ম্ম। আর ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা মোহবশতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গমনই পর-ধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে থাকিলে অর্থাৎ প্রকৃতির অনুসরণ করিলে পান ভোজন নিদ্রার ন্যায় যাবতীয় কার্য্য সাধন সহজ এবং সুখকর হয়; তদ্বিপরীত পথে গেলে কেবল কষ্ট। স্বধর্ম্ম জাতিগত একটী নিত্য স্বভাব নহে। পূর্ব্ববংশসম্ভূত গুণ কর্ম্ম পরবংশে যদিও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, তথাপি উহা জন্মগত নহে, কর্ম্মগত এবং গুণগত।

জীব। অনেকে বলেন, স্বধর্ম্ম মানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিজ নিজ ধর্ম্মে থাকিবে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। কেহ বা ব্যাখ্যা করেন, স্বাভাবিক কর্ম্মে বিরত হইয়া যে জড়বৎ তমোগুণে স্থিতি করে তাহাকে ভোগ্যবিষয় দিয়া কার্য্যক্ষম করিবে, তৎপরে ভোগ্য বিষয়ে উদাসীন হইতে বলিবে।

ব্রহ্ম। এরূপ স্বভাব নিতান্ত বিরল যে প্রথমে ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হয় না। পরে কামনার বিষয় উপভোগে তাহা বৃদ্ধিই হয় কমে না; ইহাই সাধা-রণ নিয়ম। বর্ণাশ্রম কিম্বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মনুষ্যকৃত, আমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম এক ভিন্ন দুই নহে। ব্যবসায় ও গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ হইয়াছে, ইহা প্রকৃতিগত নহে; অদ্য যে অসভ্য বর্ব্বর, সুশিক্ষার গুণে সে জ্ঞানী ধার্ম্মিক হইতে পারে।

জীব। কর্ম্মযোগ সাধন সম্বন্ধে পূর্ব্ব জীবনে নিজের অভিজ্ঞতায় যত দূর আমি বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার এই ধারণা যে, দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি কার্য্য অনেক সময় জড়যন্ত্রের অন্ধশক্তির কার্য্যের ন্যায় আপনাপনি চলিতে থাকে। যে সব কার্য্য স্বাভাবিক তাহা স্বতঃ প্রবৃত্ত, অনায়াসসিদ্ধ। বিচার করিতে না করিতে, ভাবিতে না ভাবিতে অগ্রেই সে

সমস্ত কার্য্য হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত অধিকাংশ কর্ত্তব্য কার্য্যের নিজেরই কেমন এক আকর্ষণ শক্তি আছে যাহাতে তৎপ্রতি অভ্যাসগুণে ক্রমে ভয়ানক আসক্তি জন্মে। সুতরাং সেই অভ্যাস এবং আসক্তিমূলক কার্য্যগুলি কালে যেন স্বয়ংই চরম উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। তখন নিজের স্বাতন্ত্র্য বোধ আর থাকে না। বাসনা এমন এক রোগ তাহা কর্ত্তব্য জ্ঞানের ভিতরেও অলক্ষিত ভাবে মিশিয়া যায়। কালক্রমে কর্ত্তব্য কার্য্যের ভিতর হইতে কর্ত্তব্য বোধ অন্তর্হিত হয়, শেষ কেবল বাসনার অধীনে উহা কাজ করে।

আচার্য্য। বিনা আয়াসে যে সকল স্বাভাবিক ক্রিয়া হয়, যে যে কার্য্যে বিচার বুদ্ধি চেষ্টা যত্নের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না, তাহা নৈসর্গিক কর্তৃত্বের কার্য্য; জীবগণের যত্ন চেষ্টা বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাহার ভার রাখিলে কেহই বাঁচিত না। ভাবিয়া দেখ, দেহের নিশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন এবং ভুক্ত বস্তুর পরিপাক ক্রিয়া যদি মনুষ্যের ইচ্ছা চেষ্টা বুদ্ধি ক্ষমতার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে কি দশা ঘটিত। বিচারপূর্ব্বক পান ভোজন মাত্র কার্য্য জীবের হস্তে রাখিয়াছি এবং তদ্বিষয়ক বিবেচনা শক্তির মধ্যেও সুবুদ্ধিরূপে আমি বর্ত্তমান; তৎপরে পাকস্থলী রক্তাধার ফুস্‌ফুস্‌ শিরা স্নায়ুর মধ্যে যে যে সূক্ষ্মতম যান্ত্রিক ক্রিয়া হয় তাহা জীবগণের বুদ্ধি চেষ্টার অগম্য প্রদেশে আমা কর্ত্তৃক নিয়মিত। শরীর সম্বন্ধে যেমন, মন হৃদয় এবং আত্মার পোষণ, রক্ষণ, পরিবর্দ্ধনের কার্য্যও তেমনি অধিকাংশ আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিয়া থাকি। ভূত ভবিষ্যতের অজ্ঞাত বিষয়ের সহিত তাহাদের নিগূঢ় যোগ আছে জানিবে। আর কার্য্যের প্রতি অভ্যাস আসক্তি ইত্যাদি অন্ধানুরাগের কথা যাহা তুমি বলিলে, তন্মধ্যেও কতকাংশ আমার কার্য্যনিয়মের অধীন। মনে কর, বাল্যকালে যেমন প্রত্যেক অক্ষরটী গণিয়া শব্দ রচনাপূর্ব্বক তাহার অর্থ বুঝিতে হয়, চিরকাল যদি সেই প্রণালীতে জ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত, তাহা হইলে কি কাহারো ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা থাকিত? না কাহারো জ্ঞানের বিকাশ হইত? সাধনগুণে সমস্ত কার্য্যই সহজায়ত্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমাকে এবং কর্ত্তব্য বোধকে তদবস্থায় একবারে ভুলিয়া গিয়া বাসনাধীনে অজ্ঞানবৎ চলিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। ঠিক নিয়মে সতর্ক ভাবে কার্য্য করিলে তাহার উপযুক্ত ফল

যথা সময়ে এইরূপে স্বভাবতঃ ফলে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং বিজ্ঞানসঙ্গত; কিন্তু ফলের প্রতি লোভ আসক্তি মোহের কার্য্য। নিষ্কাম অন্তরে কার্য্য করিলে তাহার ফলপ্রাপ্তি যেমন আনন্দের বিষয় হয়, সকাম কার্য্যে সেরূপ কখনই হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে আত্মাভিমান থাকে। নিজে তুমি ফলকর্ত্তা ইহা ভাবিলে অহঙ্কার জন্মে, এবং নিষ্ফলতায় নৈরাশ্যে মন ভাঙ্গিয়া যায়। ফলাফল তত্ত্ব অতিশয় গভীর, পৃথিবীর উন্নতির ন্যায় ইহাও বহুকালসাপেক্ষ এবং ক্রমবিকাশশীল। হে জীব, তুমি কর্ম্মফলের গূঢ় মর্ম্ম শুদ্ধ বিজ্ঞান চক্ষেই যদি দর্শন কর, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে ফলের প্রতি আশা প্রত্যাশা পরিপোষণ কর্ম্মচেষ্টার কোন একটী অঙ্গ নহে। ফল প্রাপ্তির আশায় যদিও লোকে সাধারণতঃ এ সংসারে বিবিধ কঠোর কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহাদের লোভ আসক্তিতে কি কার্য্যফল প্রসূত হয়? ভূমি কর্ষণ, জল সিঞ্চন ইত্যাদি সর্ব্ববিধ যত্নে বীজ অঙ্কুরিত হইলে যথাকালে তাহাতে ফুল ফল ধরিবে, একমাত্র যত্নই তাহার কারণ; প্রত্যাশা কেবল স্বার্থ, লোভ, আসক্তির পরিচয় মাত্র। তোমার আগ্রহ ব্যাকুলতা লোভ এবং আশা দেখিয়া ফলের কি কোন দয়া চক্ষুলজ্জা হয়? এবং সেই জন্য সে উৎপন্ন হয়? যত্নের ত্রুটি, জ্ঞানের অভাব, প্রণালীর দোষে ফলোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। ইহার ভিতর অতি সূক্ষ্ম বিস্তৃত নিয়ম আছে। বৃক্ষ লতা কি কখন অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত এবং পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইবার জন্য আশার সহিত চিন্তা করে? না তরুণ বালক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেহের এক ইঞ্চি বৃদ্ধি করিতে পারে? বৃদ্ধি, ফলোৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য প্রকৃতির পরিচর্য্যায় স্বয়ং আমি করি।

জীব। আচ্ছা, সাক্ষাৎ ধর্ম্মকার্য্যে স্বর্গাপবর্গাদি কোনরূপ ফল প্রত্যাশা করা উচিত নহে, কেবল চিত্তশুদ্ধি, তোমার স্বরূপত্ব লাভ এবং সত্তা সম্ভোগই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ইহা বুঝিলাম; কিন্তু সাংসারিক, বৈষয়িক, পরহিতসাধন কিম্বা নিজের দৈহিক জীবন যাত্রার কার্য্যে ফলের প্রতি আশা রাখিলে ক্ষতি কি? কোন একটা ফল প্রাপ্তিইতো সে সমস্ত কার্য্যের আশু এবং চরম লক্ষ্য বটে?

আচার্য্য। "ফল হও, ফল হও, তুমি হইলে আমি তোমায় ভোগ করিব।" এইরূপ আশাতে কি উহা ফলিবে? বরং ফলাভিসন্ধান বা ফলাসক্তি

পরিণামে দুঃখের কারণ হয়। কারণ, দৈববশতঃ কোন কার্য্যের ফল আপাততঃ হস্তগত না হইলেই মনে নিরাশা আসিবে, তাহাতে আত্মাকে মুহ্যমান করিবে। অতএব বৈষয়িক কার্য্যের ফলাফলেও দৃষ্টি রাখিবে না। অনাসক্ত নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যই সিদ্ধির সোপান। অবশ্য এ সব কার্য্যের সঙ্গে ফলের যোগ আছে, কিন্তু তাহার প্রতি স্বার্থ বোধ আসক্তি প্রত্যাশা থাকিবে না। যদি কিছু থাকে, তন্মধ্যে আমিত্বের অহঙ্কার যেন বিন্দু মাত্রও স্থান না পায়।

জীব। সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে কোন কার্য্য করিতে হইলে ফলপ্রত্যাশা তাহার এক প্রধান উত্তেজক কারণ বলিয়া যেন আমার মনে হয়। ফলাফলে নিরপেক্ষ নিষ্কাম কর্ম্মের যে সকল স্বরূপ লক্ষণ সচরাচর শুনিতে পাই তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

আচার্য্য। পার্থিব কোন অনিত্য ফল প্রত্যাশা অপেক্ষা আমার আদেশ অনুমোদন এবং প্রীতির দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিলে তোমার কার্য্য সাধনের পক্ষে তাহা কি যথেষ্ট সাহায্য নহে? বিশ্বাসীদিগের সমস্ত কার্য্যের ইহাই এক মাত্র উত্তেজক কারণ জানিবে। নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ফল স্বরূপ পৃথিবীর বড় বড় কীর্ত্তি দেখিয়া তোমার কি মনে হয়? বিশ্বাসী সেবক দ্বারা ইহা আমিই করিয়া থাকি। ফলবাদী নাস্তিকদিগের জীবন সেরূপ নহে। ধর্ম্ম বিশ্বাস স্থির রাখিয়া প্রেমরাজ্য বিস্তার এবং সত্য পালন জন্য কিম্বা জগতের দুঃখ দুর্গতি, পাপ দুর্নীতি অন্যায় অত্যাচার নিবারণের জন্য আমার যে সকল অনুগত ভক্ত সুবহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এ সকল মহৎ কার্য্যের উত্তেজক কারণ কি পার্থিব কোন আশু ফল প্রত্যাশা ছিল? কত ব্যক্তি সৎ কার্য্যের অসৎ পুরস্কারই ভোগ করিয়া গিয়াছেন। প্রাণ সম যে সব সৎকার্য্য, তাহাতেও তাঁহারা নির্লিপ্ত থাকেন। এই জন্য মহৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য অথবা ভগ্নমনোরথ হইলেও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না। আমি স্বয়ং যাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলি, "পুত্র, উত্তম কর্ম্ম করিয়াছ; এবং আমার স্বর্গবাসী অমর ভক্তগণ তজ্জন্য যাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদের হিরণ্ময় মুকুট পরাইয়া দিয়া মুখচুম্বন করেন; অধিক কি, আমার অনুমোদিত প্রিয় কার্য্য সাধনপূর্ব্বক যে পরিণামে আমার পারিষদ শ্রেণীভুক্ত হয়, পৃথিবী তাহাকে ইহা অপেক্ষা আর সুখকর চির-

শান্তিপ্রদ কি ফলের প্রলোভন দেখাইবে? প্রকৃত ভক্তের জীবন কিরূপ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মযোগ সাধন করে তাহা তুমি বাহির হইতে বুঝিতে পারিবে না। কারণ, তাহা দৃশ্যতঃ একই, ভিতরের ভাব অভিপ্রায় নিঃস্বার্থ কি সকাম তাহা কেবল আমিই জানি।

ভগবানের শ্রীমুখের এই সকল সুধাময় বাণী শ্রবণানন্তর জীব অতিশয় বিমোহিত হইলেন এবং বিগলিত চিত্তে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে নিতান্ত বৈরাগ্য-প্রণোদিত অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কর্ম্মযোগের উচ্চতর গভীর তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা শুনিলাম তাহাতে আমার সকল সংশয় ছেদ হইয়া গেল। এক্ষণে আমার এইটী জানিতে বড় অভিলাষ হইতেছে যে, সাধারণ গৃহী জীবেরা আপনার শরীর এবং পরিবার পোষণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কার্য্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রমত্ত ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহার ভিতর হইতে স্বার্থগন্ধ সকাম প্রবৃত্তি এবং বাসনাকশায় দূর হয় কিরূপে? নিজের দেহযাত্রা এবং পরিবার পালন কার্য্যে সব সময় তোমার ইচ্ছা এবং জ্ঞানের সঙ্গে যোগ রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে জীবন পথে চলা বড়ই কঠিন বোধ হয়। সাধারণ হিতের কার্য্যে কিম্বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনে অথবা জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে চিত্তে যেমন পবিত্র নিষ্কাম ভাব জন্মে, উপরি উক্ত কার্য্যে সে, ভাব কিছুতেই আসে না। নিজের পান ভোজন বিশ্রাম, আমোদ বিহার এবং পরিবার আত্মীয় অন্তরঙ্গের অভাব মোচন, সুখ বর্দ্ধন, এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি এত সহজে করা যায়, যে সে জন্য কাহাকেও কোন কথা বলিতে হয় না। এ সকল আপনা হইতেই ভাল লাগে, তাহাতে গুরুতর ত্যাগস্বীকারও কষ্টকর নহে; বরং তাহা না করিলে থাকাই যায় না; তাই সন্দেহ হয়, বুঝি ইহাতে নিগূঢ় স্বার্থের যোগ আছে; ইহা যেন আপনার স্বার্থের বশীভূত হইয়াই সচরাচর লোকে সম্পন্ন করে। এ সমস্ত সুখকর কার্য্যও কি কর্ম্মযোগের অন্তর্গত?

আচার্য্য। তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। আমার আদিষ্ট স্বভাব-প্রতিষ্ঠিত কার্য্য মাত্রই অতীব সুখকর। যে কার্য্যে মনুষ্য অনাহারে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহ পাত করে, এমন কি, যাহাতে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন

দেয়, আপাত প্রতীয়মান তাদৃশ কঠোর কর্ত্তব্যও তাহার পক্ষে অতিশয় সুখকর। স্বার্থপ্রণোদিত কার্য্য অপেক্ষাও তাহা ভাল লাগে, বরং নিরাপদে সুখ ভোগ তাহার পক্ষে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক। জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য মানবের দৈহিক ও পারিবারিক যাবতীয় স্বাভাবিক কার্য্য বিভাগে আমি প্রচুর সুখ শান্তি রাখিয়া দিয়াছি। তদ্ব্যতীত আপাততঃ যাহা কঠোর কর্ত্তব্য, পরিণামে তাহা সুখপ্রদ। ভবিষ্যতে সুখী হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে কত লোক দুষ্কর কার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকে তাহা জান ত? আশা বিশ্বাসের গুণে ভবিষ্যৎ সুখ তাহাদের বর্ত্তমান সুখে পরিণত হইয়া কর্ত্তব্যের কঠোরতা ভুলাইয়া দেয়, তখন দুঃখেও সুখ। এ সম্বন্ধে আসক্তি বা স্বার্থগন্ধের কথা যাহা বলিলে, তন্মধ্যেও আমার মঙ্গল বিধান আছে। বস্তুতঃ শরীর কিম্বা পরিবার তোমার নহে, সম্পূর্ণরূপে তাহা আমার কর্ত্তৃত্বাধীন এক একটি লীলাসাধন যন্ত্র। কেবল কার্য্য সৌকর্য্যার্থে আমি :প্রতি জনকে কার্য্যের দায়িত্ব ভাগ করিয়া দিয়াছি। অনন্ত বিস্তীর্ণ এই কার্য্যক্ষেত্রে স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একটী বিশেষ কেন্দ্রস্থল প্রতি জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট না থাকে, কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইবে? সৈনিকদিগের জন্য নিরাপদ দুর্গ প্রয়োজন। সংসারে সহজে স্বইচ্ছায় আসক্তি মত্ততার সহিত সুখকর জ্ঞানে ঐ দুইটী কার্য্য হয় বলিয়াই যে তাহা আমার অনুমোদিত নয়, এরূপ তুমি মনে করিও না। কেবল ত্যাগ আর দুঃখ কষ্ট ভোগের সঙ্গেই যে আমার কার্য্যের যোগ ইহা কে বলিবে? পরার্থপরতা নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রথমে তোমরা কোথায় শিখিয়া থাক? পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র স্বজন-পরিবেষ্টিত পরিবারমধ্যে কি নহে? এইখানে প্রেমের বীজ ভূমি, পরে তাহা প্রতিবাসীমণ্ডলে এবং জনসমাজে বিস্তারিত হয়। প্রেম স্নেহ সর্ব্বাগ্রে স্বভাবজাত, পরে উৎকর্ষসাপেক্ষ। ভাল না লাগিলে প্রথমে কোন কাজে কেহ প্রবৃত্ত হয় না। বাল্যশিক্ষা এইরূপ সহজ প্রণালীতে তাই লোকে এখন আরম্ভ করিয়াছে। দুঃখকেও আমি সুখে, অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করি। ষ্টোয়িক-দিগের দুঃসহ কষ্টসহিষ্ণু জীবনেও এক প্রকার সুখ ছিল। স্বার্থ এবং মোহের গর্ভে কর্ত্তব্য প্রথমে জন্ম গ্রহণ করে, তদনন্তর তাহার যথার্থ স্বরূপ এবং স্বর্গীয় আকর্ষণ ধর্ম্মজীবনে প্রকাশ পায়। অপত্য স্নেহ, দাম্পত্য

প্রেম, পিতৃমাতৃ ভক্তি, দুঃখী বিপন্নের প্রতি দয়া, অন্যায় অত্যাচার অপবিত্রতার উপর ঘৃণা ক্রোধ যদি কর্ত্তব্য জ্ঞান বিচারের উপরে প্রথম হইতে নির্ভর করিত তাহা হইলে মানবসন্তান জন্মিবারই অবসর পাইত না; যদি বা জন্মিত, তাহাকে লালন পালন কেহ করিত না; যদি করিত, তজ্জন্য রাত্রি জাগিয়া অনাহারে কেহ এত পরিশ্রম ত্যাগস্বীকারে সম্মত হইত না। দুঃখিনী হতভাগিনী নারীরাও নিজ গর্ভজাত সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা ছাড়িতে পারে না। নাড়ীর টান, রক্তের সম্বন্ধ, স্বভাবের অপরিহার্য্য আকর্ষণের ভিতরেই আমি নিষ্কাম কর্ত্তব্যের বীজ নিহিত করিয়া দিয়াছি। ইহা ব্যতীত চক্ষু লজ্জা, লোকভয়, সামাজিক এবং রাজশাসন কর্ত্তব্য কর্ম্মের এক একটী প্রধান প্রবর্ত্তক। অতএব তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর; সহজসাধ্য এবং সুখকর বলিয়াই যে শরীর ও পরিবার পালন কার্য্য আমার অননুমোদিত তাহা নহে; কারণ, আমি স্বাভাবিক সুখেরও কর্ত্তা; সুখলালসা এবং সুখ বোধের ভিতর অনেক গভীর উদ্দেশ্য আছে। আত্মীয় পরিবারের প্রতি বিশেষ কর্ত্তব্য বোধ, আসক্তি মায়া অনুরাগের মধ্যেও আমার গূঢ় অভিসন্ধি আছে। বিচারপূর্ব্বক ইহা বুঝিতে হইবে। অহং জ্ঞানটী কেবল ইহাতে থাকিতে দিবে না, এই মাত্র সঙ্কেত।

জীব। ঈদৃশ স্বভাবপ্রণোদিত আত্মরক্ষার কার্য্যের মধ্যে কতটুকু তোমার অনুমোদিত আর কতটুকু আমার নীচ আসক্তি এবং স্বার্থপ্রসূত তাহা বুঝিব কি প্রকারে?

আচার্য্য। আমার প্রতিনিধি বা বাক্‌যন্ত্র স্বরূপ বিবেক সে প্রভেদ বুঝাইয়া দিবে। তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিও। বিবেকের বিচার নিরপেক্ষ। আমার প্রতি অনুরাগ ভক্তি থাকিলে এই বিবেক স্বভাবতঃ সহজে সত্য পথে তোমাকে পরিচালিত করিবে। যতই ইহার কথা শুনিবে ততই ইহার বাণী স্পষ্টীকৃত হইবে।

জীব। সে যে আমার মতে অনেক সময় সায় দিয়া যায়। যাহা আমার ভাল লাগে তাহাই কি বিবেক?

আচার্য্য। কখন না। সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা উভয়ই সময়বিশেষে বিবেকানুমোদিত। এইজন্য দুঃখেতেও সুখ বোধ হয়। আমার অনুমোদিত

যে সকল দুঃসহ ত্যাগস্বীকার এবং পরিমিতাচার তাহাতে তৃপ্তি সুখ আত্ম-প্রসাদ আছে। আবার অত্যাসক্তির জন্য কোন নিষিদ্ধ বিষয়সুখ ভোগ করিলে তাহাতে আত্মগ্লানি অনুতাপ উপস্থিত হয়। এই দুয়ের পার্থক্য সীমা আমি সহজজ্ঞানের ভিতর দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিই। অতএব তুমি সামঞ্জস্যের শাস্ত্রানুসারে অনাসক্ত মিতাচারী হইয়া অপ্রমত্ত ভাবে শারীরিক এবং পারিবারিক সুখ শান্তি সম্ভোগ কর এবং তন্মধ্যে সুখস্বরূপ যে আমি, আমাকে কেবল দেখ। আমাকে যদি সুখের হরি বলিয়া জানিতে পার, তাবৎ কার্য্যেই সুখী হইবে। দুঃখেতেও সুখী হইবে। মৃত্যুতে জীবন পাইবে। আমি সুখ দুঃখের অতীত নিত্যানন্দ অনন্ত শান্তি। পার্থিব জীবনের সুখ এবং দুঃখ ক্লেশ বেদনা উভয়ই এই স্বর্গীয় নিত্য সুখ, নির্ব্বিকার শান্তি লাভের উপায়। তাহার তুলনায় পার্থিব সুখ দুঃখ বস্তুতঃ একটী অসৎ পদার্থ। উহা স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, আসে আবার চলিয়া যায়, চিরদিন থাকে না। থাকে কেবল শান্তিময় জীবন, তাহাই সার নিত্য পদার্থ। তুমি নিজ জীবন অন্বেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, তন্মধ্যে এত পরিমাণ সুখ আর এত পরিমাণ দুঃখ ইহা বলিয়া কোন একটা সামগ্রী নাই। সুখ দুঃখ উভয়ই অবস্থাঘটিত, পরিবর্ত্তনশীল, চিরচঞ্চল, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাই তাহার জনক। কিন্তু প্রকৃত সুখের জীবন যাবতীয় বাহ্য অবস্থার অতীত, তাহা নিত্যানন্দ স্বরূপ যে আমি কেবল আমাতেই তাহার জন্ম স্থিতি এবং চির উন্নতি। চিত্তের সাম্যাবস্থার স্বচ্ছ দর্পণে যখন আমার সর্ব্বসমঞ্জসীভূত সদ্‌গুণ রাশি প্রতিফলিত হয় এবং তাহা ক্রমে দৃঢ়রূপে উহাতে মুদ্রিত হইয়া যায়, তখনই জীব আমাতে নিত্য সুখ সম্ভোগ করে। ঈদৃশ সুখের জীবন নিত্য স্থায়ী সৎ পদার্থ। যাবতীয় অনিত্য সুখ শান্তি শিক্ষা সাধনের প্রথম সোপান, এবং তাহা আমারই বহিরঙ্গ প্রকৃতির প্রতিবিম্বচ্ছটা। কিন্তু যাহারা অনিত্য অস্থায়ী পার্থিব সুখকর ঘটনার অন্তরালে আমাকে নিত্যানন্দরূপে দর্শন করে তাহারা আর উহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না।”

কর্ম্মযোগ—ষোড়শ অধ্যায়।

বাহ্য ও অন্তর যজ্ঞ।

জীব কহিলেন, "প্রভো! প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহ কেহ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানযোগ সাধনের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, কেহ বা চিত্ত-শুদ্ধিকর যাগ যজ্ঞাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ?

ব্রহ্ম। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ একটী অবিভাজ্য বিষয়, শিক্ষা দিবার সময় কেবল শিক্ষার্থীকে তিনের পৃথক পৃথক লক্ষণ, স্বতন্ত্র সাধন এবং বিশেষত্ব বুঝাইবার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ ইহারা একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তবে ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবজাত ক্ষমতার বিশেষত্ব অনুসারে কাহারো জীবনে কোনটী কম, কাহারো জীবনে বা কোনটী বেশী বিকাশ পায় এই পর্য্যন্ত প্রভেদ। কিন্তু তিনের সামঞ্জস্য ভিন্ন ধর্ম্মজীবন একদেশদেশী অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

জীব। কার্য্যের নিজের ত কোন মহিমা নাই, তাহাত এক প্রকার যন্ত্রাধীন; তাহার ফলাফলের প্রতিও নিরপেক্ষ অনাসক্ত থাকিতে হইবে, কেবল বিশুদ্ধ অভিপ্রায়টীই কর্ম্মযোগ বলিয়া তোমার নিকট গণ্য; তবে কাজ না করিয়া যদি জ্ঞানযোগে তোমাতে অবস্থিতি করি তাহাতে ক্ষতি কি? ভক্তিও হৃদয়ের অনুরাগ ভাবমাত্র, তাহা বাহিরের বিষয়ে বদ্ধ নহে।

ব্রহ্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞান কিম্বা ভক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া কেবল চিন্তা কিম্বা ভাবে বদ্ধ থাকিতে পারে না। আমার জ্ঞানে যাহারা জ্ঞানী তাহারা লোকশিক্ষার্থ সেই জ্ঞান প্রচারের জন্য উপদেশ দেয়, গ্রন্থ রচনা করে, চিন্তা, অধ্যয়ন সৎ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়; জ্ঞান অলস ভাবে কি কখন নিদ্রা যাইতে পারে? ভক্তিও তেমনি বিবিধ কার্য্যের সহিত সংযুক্ত। সাধুসঙ্গ জীবসেবা তাহার এক প্রধান লক্ষণ। ভক্ত শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে আপনি মাতিয়া অপরকে মাতাইবে, অন্য হৃদয়ে ভাব ভক্তি সংক্রামিত করিবে। কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে এইরূপে জ্ঞান ভক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তদ্ভিন্ন উহা স্বপ্ন

কল্পনার আবেগমাত্র। ফলতঃ কার্য্যবিহীন জীবন নাই। যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে পর্য্যন্ত আত্মচৈতন্তের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ ধ্যান চিন্তা যোগ সমাধি ভক্তি প্রেম সন্ন্যাস তাবৎ বিষয়ের সঙ্গেই কার্য্যের নিত্য যোগ। বিশেষতঃ মানব-দেহ কার্য্যেরই যন্ত্র।

জীব। পূর্ব্বকালে ঋষিরা যে অগ্নিহোত্রাদি যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এ যুগে কি তাহার কোন ফলবত্তা নাই? তোমার আরাধনার জন্যত কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, তদ্ভিন্ন জ্ঞান ভক্তি কিছুই উপার্জ্জন হয় না; কিরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম এক্ষণে তবে অনুষ্ঠেয়?

ব্রহ্ম। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিলে তাহা হইতে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইবে, সেই মেঘ বারি বর্ষণ করিবে, তাহা দ্বারা ফল শস্য উৎপন্ন হইলে প্রাণী-গণের জীবন রক্ষা পাইবে; কিম্বা ঘৃত মধু মিষ্টান্ন অনলে নিক্ষেপ করিলে তাহা দ্বারা ভৌতিক উপাদান সকলের পুষ্টিসাধন হইবে, এরূপ বিশ্বাস সংস্কার এখনকার লোকের আর নাই। গৃহের দূষিত বায়ু সংশোধন জন্য হোম করিতে পার, কিন্তু তদ্দ্বারা পাপক্ষয় বা ফলশস্যপ্রসূ বৃষ্টির অভাব মোচন হইবে না। তাহা যদি হইত, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন মহা মহা দুর্ভিক্ষ সকল দূর হইতে পারিত। পশুবলিদান যজ্ঞের একটী কার্য্য, তাহা অতীব নৃশংস প্রথা। নির্দ্দোষ পশুবধে অনুষ্ঠানকর্ত্তার রিপুপ্রাবল্য কি প্রশমিত হয়? তবে দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান ইহার অঙ্গীভূত একটী সৎকার্য্য বটে। প্রত্যেক গৃহকর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার প্রচুর আয়োজন প্রার্থনীয়।

জীব। এ সব প্রচলিত যাগযজ্ঞানুষ্ঠান যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া কি থাকিবে? কর্ম্মহীন লোকসমাস কি কেবল পান ভোজন আমোদ ও আত্মপোষণ দ্বারা জ্ঞান ভক্তি লাভ করিতে পারিবে?

ব্রহ্ম। কখনই না। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মযজ্ঞ অনেক বিধ আছে। প্রতি-দিনের পূজার্চ্চনা সাধন ভজন ব্যতীত অতিথিসেবা, প্রতিবাসীর উপকার, দেশের বিবিধ হিতসাধন, গৃহকর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রতাবলম্বন, দেহরক্ষা, আত্মীয়গণের ভরণ-পোষণ সমস্তই কর্ম্মযজ্ঞের অন্তর্গত। তদ্ব্যতীত পরলোকগত পিতা মাতা গুরুজনের এবং স্বদেশ বিদেশস্থ হিতৈষী মহাত্মা ও সাধুভক্তদিগের স্মরণার্থ বর্ষে বর্ষে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান; উৎসব পর্ব্বাদি উপলক্ষে অন্ন বস্ত্র ধন বিতরণ এবং সাধুভক্ত

আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুসেবা, দরিদ্রভোজন, সাধারণ হিতানুষ্ঠানে অর্থ ও দ্রব্যাদি দান। এ সমস্তই পবিত্র যাগযজ্ঞ। ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে ব্রহ্মোপাসনান্তে নিষ্ঠা ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভাবভক্তি উপার্জ্জিত এবং চিত্তশুদ্ধি হয়। স্নান ভোজনাদিও দৈনিক কর্ত্তব্য যজ্ঞানুষ্ঠনের মধ্যে পরিগণিত। যদিও ধর্ম্মকার্য্যের নিজের কোন পবিত্র শক্তি নাই, কিন্তু ইহা চরিত্রগঠন এবং আমার স্বরূপ ধারণের পরম সহায়; এই জন্য ধর্ম্মের বহু বিধ বাহ্য অনুষ্ঠান লোকে করে। ইহার অবলম্বনে ক্রমশঃ মনুষ্য শেষ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। সাধকেরা অনিত্য হইতে নিত্য, অসার হইতে সার, কর্ম্ম হইতে জ্ঞানভক্তি পবিত্রতা উপার্জ্জন করিয়া অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ করেন।

জীব বলিলেন, "এই যে সকল কর্ম্মযজ্ঞের কথা বলিলে, ইহাত ধন জন বিদ্যা ক্ষমতা বুদ্ধিবল এবং বিবিধ বাহ্যোপকরণ ভিন্ন সম্পন্ন হয় না, অথচ তাহা প্রয়োগ করিতে গেলেই তৎসঙ্গে চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে এবং অহং আসিয়া পড়ে, কাজেই কর্ম্ম সকল রজোগুণমিশ্র হইয়া উঠে। লোকে আমার সৎকার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিবে, ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা দিবে, তাহা শুনিতে শুনিতে ক্রমে আমার অভিমান স্ফীত হইবে; সুতরাং বাহ্যানুষ্ঠান সকল আরম্ভ করিবার কালে যদিও চিত্তে নিষ্কাম এবং বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের উদয় হয়, কিন্তু শেষে আর তাহা বড় থাকে না। কর্ম্মস্রোতে পড়িয়া পরিণামে তোমার সঙ্গে ক্রিয়াকর্ত্তার বিচ্ছেদ ঘটে। কর্ম্মযজ্ঞের বিবিধ উপকরণ সামগ্রী, ক্রিয়া সাধনের সুদীর্ঘ প্রণালী প্রক্রিয়া তন্ত্র মন্ত্র বিধি নিয়ম, তাহার সঙ্গে চেষ্টা উদ্যম, শারীরিক পরিশ্রম এবং ভাবনা চিন্তা বিচার ইত্যাদি তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে ভেদ জ্ঞান উৎপাদন করে। কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে তাহা হইলে তোমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করিলাম ইহা অনুভব করিব কিরূপে?"

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি বলিলেন, "মদ্ভাবাপন্ন হইয়া তন্ময় ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি কর্ত্তা, তুমি আমার অধীন কর্ম্মী, যদ্দ্বারা যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইবে তাহা কর্ম্ম, আর তোমার কৃত আন্তরিক ও বাহ্যিক ক্রিয়া; অখণ্ড জ্ঞানে একাত্মতা সহকারে যদি এই গুলি অনুভব না কর, তাহা হইলে হয় একদিকে যন্ত্রবৎ কার্য্যচক্রে ঘুরিবে, কর্ম্মবন্ধনে পড়িবে, না হয় আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া লৌকিকতার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। ইচ্ছাযোগের অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব এখানে

অবগত হও। উদ্দেশ্য, উপায়, কর্ম্ম এবং ক্রিয়া জীব এবং ব্রহ্ম সকলের মধ্যে একত্ব জ্ঞান, অভেদ ভাব উপলব্ধি করিলে আমাকে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করা হয়। ইহার নিগূঢ় সঙ্কেত, মূল মন্ত্র এই, সর্ব্বাগ্রে আমাতে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিসর্জ্জন, তাহার পর দেহ ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি স্মৃতি চিন্তা কল্পনা, জ্ঞান ভাব ইচ্ছা যাহার যে স্বর তাহা সহজে এক তানে বাজিতে থাকিবে।

জীব। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য অবলম্বন করিলেই কি তোমার জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য সাংসারিক কার্য্যে কি তাহা হয় না? কর্ম্মের অধীন জ্ঞান কিরূপ তাহা আমাকে আরো ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।

ব্রহ্ম। তোমার কৃত সমস্ত কার্য্যই কর্ম্মযজ্ঞের অন্তর্গত, ইহা মনে না রাখিয়া যদি সাংসারিক কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দুই স্বতন্ত্র কর, তাহা হইলে বিষয় কার্য্যের সময় আমার ইচ্ছার সহিত তোমার কোন যোগ থাকিবে না; অথচ বিষয় কর্ম্মেতেই তোমার পনর আনা জীবন অবস্থিতি করে। ধর্ম্মকর্ম্ম মুখ্য, এবং বিষয়কর্ম্ম গৌন; কিন্তু সেই উপায় স্বরূপ শেষোক্ত কর্ম্মে আমার সঙ্গে যদি তোমার যোগ না থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সাধন ভজন এবং যাগ যজ্ঞাদির যে মূল উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধির অন্তরায় হয়। দুইটী এক সূত্রে গ্রথিত আছে জানিবে। একটী ধর্ম্ম, একটী নীতি। ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্তি, বিষয় কর্ম্ম দ্বারা আমার ইচ্ছা পালন এবং তাহার সহিত তোমার ইচ্ছার মিলন। এই ইচ্ছা সম্বন্ধীয় অর্থাৎ নীতি বিষয়ে শাসন বিধি নিয়ম প্রভৃতির জ্ঞান বৈষয়িক কার্য্যসাহায্যে অবগত হইবে। আর ধ্যান চিন্তা, স্বরূপের আরাধনা এবং প্রার্থনাযোগে আমার তত্ত্বরস এবং প্রেমসুধা সম্ভোগ করিবে। এইরূপ উপাসনানুষ্ঠানে অন্তরে যে দৈব শক্তি সঞ্চারিত হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাই ইচ্ছা বুদ্ধি বিজ্ঞান বিবেকের ভিতর দিয়া আমার অনুমোদিত প্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। উভয়বিধ উপায়ে মানুষ ধর্ম্মজ্ঞান এবং নীতিজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া থাকে। উভয় কার্য্যই সর্ব্ববিধ জ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয়। যে ব্যক্তির ধর্ম্মকর্ম্মের কোন জ্ঞান নাই, তাহাকে যেমন পূজানুষ্ঠানের মন্ত্র তন্ত্র এবং তৎসংক্রান্ত আচার ব্যবহার রীতি পদ্ধতি শিখাইয়া দিলে ক্রমে তাহার ধর্ম্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে, তেমনি বিষয় ব্যাপার সাংসারিক কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করিলে বিবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মবুদ্ধি ও বৈষয়িক

নীতিজ্ঞান জন্মিবে। অতএব কর্ম্মই জ্ঞান ও ভক্তির প্রধান সহায় এবং অবলম্বন।

জীব। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং যোগ তপস্যা কি শারীরিক কষ্ট সাধন ভিন্ন হইতে পারে না? ব্রতের অনুরোধে পান ভোজন আমোদ বিহার বিলাস সুখ ইত্যাদির সঙ্কোচ সাধন কি নিতান্ত আবশ্যক?

ব্রহ্ম। সময়ে সময়ে আবশ্যক, বিলাসিতা সকল সময়েই পরিত্যাজ্য; এবং তাহা সাধনানুরাগের অবস্থায় স্বাভাবিকও বটে। নিজ দুরবস্থা, পাপাসক্তি স্মরণে যাহার অন্তরে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠে এবং আমার প্রতি যাহাদের অনুরাগ ভক্তির উদয় হয় তাহারা সহজেই দৈহিক বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে। কিন্তু বৈরাগ্যের কঠোর নিয়ম সকল যদি আন্তরিক ভাবের প্রকাশক না হয়, তাহাতেও কর্ম্মবন্ধন উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, দৈহিক কষ্ট বহনের মধ্যেও আসক্তি আছে। তদুপলক্ষে অনেকে ক্রমে বহির্ম্মুখে ধাবিত হয়। বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় কঠোর ব্রতাচরণ একটী ঘোরতর প্রলোভনও বটে। কেন না, পান ভোজন, বেশ ভূষায় বীতরাগ ও কৌমার্য্য এবং বিষয়ত্যাগ দেখিলে জনসাধারণ সহজে বিমোহিত হয়, তজ্জন্য ব্রতধারী বৈরাগীকে তাহারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি ও সুখ্যাতি প্রশংসা করে; তাহা শুনিতে শুনিতে কালক্রমে তাঁহার মনে অহঙ্কার জন্মে। পরিশেষে অহঙ্কার ধর্ম্মাভিমানে সাধকের পতন হয়। তিনি ব্রত বিধি পালন করেন, অন্যে তাহা করে না; এই ভাবিয়া তিনি অপর সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। একদিকে ধর্ম্মাভিমান, অন্যদিকে মানুষের প্রতি ঘৃণা অশ্রদ্ধা, ইহাতে সাধক আমা হইতে ক্রমে দূরে গিয়া পড়ে; তখন তাঁহার ব্রত নিয়মই সর্ব্বস্ব হয়। সাধুরা বৈরাগ্যের ঈদৃশ অপব্যবহারকে মর্কট বৈরাগ্য বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সংযম নিয়ম শম দম ইষ্টনিষ্ঠাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা বলে, স্বভাবের নিয়ম পালনই ধর্ম্ম, অতএব আমরা সমুদয় প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য সাধন করিব; তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস। বহু কঠোর অস্বাভাবিক সাধনের কোন ফলবত্তা নাই, আবার চিত্ত শুদ্ধির জন্য আমার আদেশে ত্যাগস্বীকার নিতান্ত আবশ্যক। অবশ্য এক নিয়মে চিরদিন বৈরাগ্য সাধন চলে না, যখন যে অবস্থায় যে নিয়ম অবলম্বন আত্মার পক্ষে হিতকর তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু সাধক যতই উন্নত অবস্থায় উত্থিত হউন

না কেন, জীবনের মহৎ ব্রতের অলঙ্ঘ্য শাসন বন্ধনের অধীনে তাঁহাকে চিরকাল থাকিতে হইবে।

জীব। বাহ্য কর্ম্মকাণ্ড, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং আন্তরিক শমদমাদি সংযম নিয়ম জপ তপ ধ্যান দুই কি স্বতন্ত্র ভাবে সাধন করিতে হইবে, না এক সঙ্গে?

ব্রহ্ম। যাহা ভিতরে তাহারই প্রকাশ বাহিরে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু নিয়ম সংযম বিষয়ক বাহ্যানুষ্ঠানের সাহায্যেও অন্তঃকরণ দিন দিন সংযত এবং বিশুদ্ধ হয়। অনেকে ভ্রান্তি বশতঃ কতকগুলি মুখস্থ দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য মন্ত্র পড়িয়া, এবং অভ্যস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া মনে মনে ভাবে, আমার সাধন ভজন যোগ তপস্যা হইল, আমি পুণ্য সঞ্চয় করিলাম, মুক্তি লাভের আর আমার কোন ভাবনা নাই। অথচ সে পূর্ব্বে যে যে রিপু ও বাসনার দাস ছিল তাহাই আছে। এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে জীব অধোগামী এবং আত্মপ্রবঞ্চিত হয়। বাহ্য যজ্ঞ অপেক্ষা অন্তর যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। অন্তর শুদ্ধি এবং ভক্তিভাবের জন্যই বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রয়োজন; যেখানে সে উদ্দেশ্য সফল না হইল সেখানে সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হইয়া গেল বুঝিতে হইবে। অতএব তুমি এই অন্তর যজ্ঞ সাধনের পক্ষপাতী হও। প্রজ্বলিত বৈরাগ্যের হোমাগ্নিতে বাসনার আহুতি দিয়া, সংযমরূপ যূপকাষ্ঠে রিপুদিগকে বলিদান কর, এবং রসনায় কেবল বল, "ওঁ ব্রহ্ম সদ্‌গুরু।" বিভক্ত চিত্ত হইয়া বাহিরের বহু বিষয়ে ধাবিত হইও না। এইরূপ অন্তর যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে ভূতগণকে, বিশেষরূপে ক্ষুধার্ত্ত দীন দরিদ্রদিগকে ভূরি ভোজন ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহাই প্রকৃত যাগ যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড। ইহা দ্বারা বিজ্ঞান বিবেক উজ্জ্বল হয়। তখন সহজে অবৈধ ভোগে অরুচি, বৈধ ভোগ এবং পরিমিতাচারে আত্মা পরম সন্তোষ লাভ করে।

জীব। পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ইহা ব্যতীত কি অন্য প্রকার যজ্ঞাদির প্রয়োজন আছে? না নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাহা অপনীত হইবে?

ত্রিকালজ্ঞ পরম দেবতা বলিলেন, "পাপ বস্তুতঃ কি, তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে, ইহা জানিতে পারিলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ বিধেয় তাহা বুঝিতে পারিবে। পাপ পুরাতনও যা, নূতনও তাই, কেবল বাহ্য ক্রিয়ায় তাহার গাঢ়তার তারতম্য দৃষ্ট হয়। দৈহিক অবৈধ ভোগস্পৃহা

এবং মানসিক স্বার্থ প্রবৃত্তিই পাপের উৎপত্তির স্থান। নৈসর্গিক অভাব মোচনের বিষয়াদিসংযোগে দেহীর প্রথমে লোভ কুবাসনা কুরুচি কুঅভ্যাস জন্মে, পরে সেই সেই বিষয়ের সংযোগ হইবামাত্র সহজে তাহা ইচ্ছাকে প্রণোদিত করে। যে পর্য্যন্ত সেই কুরুচি কুঅভ্যাসকে বিবেকাধীন ইচ্ছাশক্তি-যোগে বৈধপথে ফিরাইতে না পারিবে তাবৎ বাহ্য প্রায়শ্চিত্তে পাপ উন্মূলিত হইবে না। ইহার জন্য মস্তক মুণ্ডন, উপবাস, গোময় ভক্ষণ, কষ্ট বহন, ধর্ম্মযাজকের নিকট পাপ স্বীকার, কতই নিয়ম প্রচলিত আছে! যদি এ সকল বাহ্যানুষ্ঠানে পাপের সম্ভবনীয়তা, অর্থাৎ পাপের দিকে ঝোঁক কাটিয়া যায়, তবে গোপনে বা প্রকাশ্যে তাদৃশ ক্রিয়া অবলম্বন শ্রেয়স্কর। দৈন্য প্রকাশ, অপরাধ স্বীকার, ভোগবাসনা ত্যাগ, কষ্টগ্রহণ এ জন্য প্রার্থনীয়। কিন্তু যেখানে পাপের উৎপত্তি সেইখানেই তাহাকে লয় করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি, কিম্বা দ্রব্যময় যজ্ঞে তাহার মূল উৎপাটিত হইবার নহে। যত দিন তাহার মূল আছে, ততদিন পুরাতন পাপ নিত্য নূতনরূপে দেখা দিবে। তথাপি পাপ বলিদানের জন্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রয়োজন। পাপ মানে কোন একটী কার্য্যবিশেষ নহে, প্রবৃত্তিই পাপের মূল।"

কর্ম্মযোগ—সপ্তদশ অধ্যায়।

গৃহকর্ম্ম।

"দেহ মন আত্মা ও হৃদয় ভগবানের সহিত একত্বে পরিণত হইলে তবে প্রকৃত কর্ম্মযোগ নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু গার্হস্থ জীবনে নানা কার্য্যের দায়িত্ব ভাবনা লইয়া তাহা কি সম্ভব?" জীবের মনে এই ঘোর সংশয় উপস্থিত হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, তুমি যে কর্ম্মযোগ সিদ্ধির উপদেশ দিলে তাহা সামান্য বিষয়ী গৃহীর পক্ষে সুসাধ্য বলিয়াত মনে হয় না।"

ভগবান অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিলেন, "গৃহীর জন্যই কর্ম্মযোগ, সন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগী অলস পরগলগ্রহ ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্রই নাই, সে কিরূপে কর্ম্মযোগের মর্ম্ম অবধারণ করিবে? তুমি কর্ম্মযোগের সিদ্ধাবস্থার সহিত গৃহী

জীবের প্রচলিত সাংসারিক জীবনের তুলনা করিয়া হতাশ হইও না। গার্হস্থ জীবনে কর্ম্মযোগ কি জন্য সাধিত হয় না, তুমি নিজে তাহা পরীক্ষায় বুঝিয়াছ ; আবার হয় যে কেন তাহাও বুঝিয়াছ। যদি ইহা অসম্ভব হইত, কদাপি আমি কাহারো নিকট উভয়ের সামঞ্জস্য প্রত্যাশা করিতাম না। সাধনেই সিদ্ধি। কর্ম্ম আরম্ভ করিলে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান আবার কর্ম্মযোগ সিদ্ধির পরম সহায় হয়। যাহারা বলে সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন করা যায় না, তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন না করিয়াই এ কথা বলে। হয় না সে কি করিয়া জানিল? যদি বল, অনেকে চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই। কিন্তু কে কত দূর কি ভাবে সাধন করিয়াছে না করিয়াছে তাহা আমি জানি। আন্তরিক চেষ্টা যাহার থাকে, ভক্তি অনুরাগ-বলে মৎ কৃপাশক্তি লাভ করিয়া পরিণামে আমার পরম পদ সে প্রাপ্ত হয়। ইহা আমার বিশ্বজনীন অভ্রান্ত নিয়ম। তথাপি যদি জিজ্ঞাসা কর, সংসারে থাকিয়া কয় জন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে? ভূত কালে ইহার দৃষ্টান্ত অধিক যদি দেখিতে না পাও ভবিষ্যতেও কি পাইবে না? আমি যে উপদেশ দিতেছি ইহা অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য। কোন সত্যের পূর্ণতা ভূত কালে নাই, ভবিষ্যতে তাহা দেখিতে পাইবে। যাহা হইবে এবং হওয়া উচিত এখন তাহার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে, সুতরাং ইহার প্রতি চাহিয়া কোন সত্য সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইতে পারে না। ভ্রূণকে দেখিয়া কি কাহারো মনে হয় যে ইহা হইতে দিব্য দেহধারী জ্ঞানোন্নত মনুষ্য উৎপন্ন হইবে? অথচ তাহাই হয়।”

জীব। আমার প্রতি তুমি যে কৃপা করিয়াছ তাহাতে আমি যথেষ্ট আশা পাইয়াছি। এবং আমি এক ব্যক্তি যদি সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, কিম্বা দিন দিন সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হই, তাহা হইলে জীব মাত্রে সকলেরই গতি হইবে। আচ্ছা, তুমি যে বলিলে, কর্ম্মযোগে একত্বে পরিণত হইতে হইবে। তাহা হইলে সে একত্ব অনুভব করিবে কে?

ব্রহ্ম। একত্ব মানে অস্তিত্বের বিলোপ নহে। দেহ মন বিবেক বিজ্ঞান হৃদয় সামঞ্জস্য ভাবে মিলিত হইয়া আমার ইচ্ছার সহিত একতা অনুভব করিবে। কেবল এই অনুভূতির জন্যই তোমার স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান সব সময়েই

আবশ্যক। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকিবে না। রাসায়নিক, য্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের মিলন যেমন, এ মিলন সেরূপ নহে; অনন্ত চৈতন্যের সহিত ক্ষুদ্র চৈতন্যের জ্ঞানগত সহজ একতা। চারিদিকে এক মহা ইচ্ছার অনতিক্রমণীয় অনন্ত কর্ত্তৃত্ব, তাহার একান্ত অধীন একটী ক্ষুদ্র ইচ্ছা তুমি। এই স্বাধীন জীবাত্মার যে আমার প্রতি ঐকান্তিক অধীনতা ইহা প্রতিদিনের গৃহকার্য্যের অবলম্বনে উপলব্ধ হইবে।

জীব। স্বতন্ত্রতার ভিতর মিলন, বহুতার মধ্যে একতা, ইহা এই নব-গীতার নবীন তত্ত্ব বটে। বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসন পালনে এইরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ব্রহ্ম। গৃহরূপ তপোবনে বাস করিয়াই ইহা সকলে সাধন করিতে পারিবে। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। গৃহাশ্রমের কেমন গভীর মর্ম্ম, ইহার উদ্দেশ্য কি মহৎ তাহা এখন হৃদয়ঙ্গম কর। স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার পালন, জীবিকা সংগ্রহের নিমিত্ত ভাবনা, বা জীবনসংগ্রাম; এবং রোগ শোক অভাব কষ্টের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইও না। এই গৃহধামে আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রতিবাসীর মধ্যে তোমার ধর্ম্ম এবং নীতির উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা আমি করিয়াছি। বৈরাগীর কৌপীন, কমণ্ডলু, তাঁহার ভস্মমাখা কলেবর, মুণ্ডিত শির অপেক্ষা গৃহাশ্রমের অন্ন বস্ত্র এবং ব্যবহার্য্য সামগ্রীর ভিতরে আমার জীবন্ত আবির্ভাব দেখিতে পাইবে। বৈরাগ্যের পবিত্র চক্ষে সে সকল দেখিলে গৃহই প্রকৃত তপোবন বলিয়া প্রতীত হইবে। গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্মই যথার্থ তপস্যা। এই খানেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

কর্ম্মযোগ—অষ্টাদশ অধ্যায়।

লৌকিক ব্যবহার।

চিদানন্দ কর্ম্মযোগের গভীরতা এবং বিস্তৃতি জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিয়া পিতা সদানন্দকে বলিলেন, "আর্য্য! কর্ম্মযজ্ঞের মর্ম্ম এবং তাহার ফলাফল তত্ত্ব যাহা আপনি বর্ণন করিলেন তাহাতে দেখিতেছি, সমস্ত লোক এবং যাবতীয় কার্য্য বিভাগের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু একা মানুষ গৃহধর্ম্মে

ব্যস্ত থাকিয়া বহুবিধ লৌকিক ব্যবহারের তরঙ্গ তুফানের মধ্যে আপনাকে কিরূপে স্থির রাখিবে? যাহার বিষয়কার্য্য, আত্মীয় কুটুম্ব বা অধীন কর্ম্মচারী যত অধিক, তত পরিমাণে তাহার চিত্তের গতি নানা দিকে নিরন্তর ধাবিত হয়, এ অবস্থায় জীবের দাঁড়াইবার স্থির ভূমিত দেখি না।"

সদানন্দ বলিলেন, "পুত্র, কার্য্য বহু হইলেও কর্ত্তা একই, তাহার একত্ব সকল সময়েই থাকে। যে কর্ত্তা পুরুষ, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে সে কাহারো পিতা, কাহারো পতি, কাহারো ভ্রাতা, কাহারো মাতুল, কাহারো বন্ধু, কাহারো প্রভু, কাহারো ভৃত্য, কাহারো কনিষ্ঠ সহোদর, কাহারো বিচারপতি দণ্ড-দাতা; কখন বা নিজেই সে দণ্ডার্হ অপরাধী। সেই এক জনের এক হৃদয় হইতে স্ত্রীর প্রতি প্রেম, সন্তানের প্রতি স্নেহ বাৎসল্য; পিতা মাতা গুরু জনের প্রতি ভয় ভক্তি, বন্ধুবর্গের প্রতি সখ্য ভাব; দরিদ্রের প্রতি দয়া, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। পাত্র এবং অবস্থাভেদে এক জনের দ্বারা বিচিত্র ব্যবহার, বিচিত্র কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু সে নিজে একই অবিভাজ্য ব্যক্তি।

চিদানন্দ। তাহা সত্য, কিন্তু এক জনের দ্বারা সব দিক্ রক্ষা হইবে কিরূপে? সকলকেত সে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। যাহার সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ অন্তরে সেই রূপ ভাব পোষণ করিলে কি ব্যবহারের ত্রুটি দোষ অপরাধ মার্জ্জনীয় হয় না?

সদানন্দ। সকলের সম্বন্ধে হয় না। সাধারণ মানব জাতির প্রতি তুমি কেবল সহানুভূতি কিম্বা সাধু ভাব মাত্র অন্তরে পোষণ করিয়া অব্যাহতি পাইতে পার, কিন্তু আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের সীমান্তর্গত পরিবারবর্গ এবং পরিচিত বন্ধু আত্মীয় প্রতিবাসীর প্রতি সাধু ইচ্ছা, কর্ত্তব্য জ্ঞানকে যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। সম্বন্ধ অতি নিকট হইলেও কার্য্য ব্যব-হারের উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। সেবা পরিচর্য্যা আদর যত্নের অভাবে পুত্র কন্যা স্ত্রী ভ্রাতা পিতা মাতাও পর হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সৎ ব্যবহার দ্বারা পরও আপনার হয়। এই ব্যবহারিক জীবন এবং লৌকি-কতার উপর নৈতিক চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করিতেছে। নৈতিক চরিত্র আবার অধ্যাত্ম ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিভূমি।

চিদানন্দ। কিন্তু এই যে লৌকিকতা বা সামাজিকতা ইহা পরিশেষে অতিশয়

মোহের কারণ হয়। মনুষ্যের, বিশেষতঃ আত্মীয় প্রিয় এবং জ্ঞাতি কুটুম্বের মুখাপেক্ষা করিতে করিতে শেষ এমন কি, ইষ্টদেবতার প্রতিও দৃষ্টি থাকে না।

সদানন্দ। সৃষ্ট যাবতীয় বিষয়ই মোহের কারণ, অথচ তৎসমুদায়ের ভিতর দিয়া ভগবান প্রতি জনকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্তরদর্শী বিবেকী পুরুষের নিকট উহা অতীব স্বচ্ছ অনাবৃত। ইহার ভিতর হইতে তিনি নিত্যানিত্য, সত্য মিথ্যা, শ্রেয় অশ্রেয় নির্ব্বাচন করিয়া লন।

চিদানন্দ। পৃথিবীর মনুষ্যগণ বহু প্রকার কুটিল স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, অধিক দিন এই জন্য কাহারো সহিত মিলনও থাকে না; স্বার্থের হানি হইলেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়।

সদানন্দ। মনুষ্যসমাজ যখন আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কোন রূপ কর্ম্মযজ্ঞ যখন হইতে পারে না, তখন এরূপ অভিযোগ করা বৃথা। ধৈর্য্য শান্তি দয়া ন্যায় নীতি কোথায় গিয়া আর শিখিবে? স্বার্থের সম্বন্ধ মধ্যেই নিত্য প্রেমের আভাস আছে। ভগবানের উদ্দেশে নিষ্কাম ব্যবহার দ্বারা পরস্পরের সহিত নিত্য প্রেমে বদ্ধ হওয়া যায়। নতুবা স্বর্গ ভোগ আর কাহাকে বলিবে? স্বর্গের এক অংশ এই সকল বিচিত্র প্রকৃতির নরনারীকে লইয়া। এখানে যদি তাহার পূর্ব্বাস্বাদ না পাও, তবে পরকালে তাহাতে একবারে কিরূপে প্রবেশ করিবে? প্রথম শিক্ষা শেষ না হইলে উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য কি কেহ বুঝিতে পারে? পৃথিবীর আত্মীয় পরিবার জনসমাজ, এবং ধর্ম্মমণ্ডলী স্বর্গের আভাস। যদিও ঈষৎ আভাস বটে, কিন্তু ইহা তাহার নিদর্শন স্বরূপ। একটী অল্লাধিক বিস্তৃত ধর্ম্মপরিবার বা সুখী পরিবার সঙ্গঠন কর্ম্মযোগের চরম ফল। সংসারে মোহ-কোলাহলে বিভ্রান্ত চিত্তে বিমুগ্ধ হইয়া বৃথা পরিশ্রম করিলে কর্ম্মযোগ সম্পন্ন হয় না।

চিদানন্দ। যাহারা পরোক্ষে নিন্দা করিয়া বেড়ায় এবং বার বার বিরক্ত করে, তাহাদের সাহায্যে কর্ম্মযোগ সাধন এবং সুখী পরিবার গঠন কি সম্ভব? ভালই লাগে না।

সদানন্দ। ভাল লাগে না বলিয়াই ত লোকে শেষ বনবাসী হয়। সাধনের অবস্থায় কিছুই ভাল লাগে না। এমন যে চিত্তবিনোদন গীত বাদ্য, প্রথম শিক্ষার কালে কি কষ্টকরই না বোধ হয়! মানুষ সম্বন্ধেও ঠিক সেই রূপ।

বিবেক বিজ্ঞানও হৃদয়ের তারে তারে মিশিয়া দুই পাঁচটী আত্মা যখন পরমাত্মার অনন্ত মিলন তানে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন সশরীরে এই ধরাতলে তাহারা স্বর্গ-ভোগ করে। যদি সেই স্বর্গ সম্ভোগে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজ বিবেকের সহিত নিজ ইচ্ছার মিলন সম্পাদন কর, তৎপরে পরমাত্মা ও সর্ব্বজীবের সহিত তোমার মিলন হইবে। পরিবার ও মনুষ্যসমাজ তাহার প্রাথমিক শিক্ষার স্থল এবং কর্ম্মভূমি। নিজের সুর যদি ভগবানের সুরের সহিত মিলিত হয়, সমস্ত জগৎ সঙ্গীতময় বোধ হইবে। মানুষকে ভাল না বাসিলে ভগবানকে ভালবাসা যায় না। এবং মানুষকে ক্ষমা না করিলে তাঁহার নিকট কেহ ক্ষমা পায় না। মানুষে মানুষে যে আধ্যাত্মিক প্রেম-মিলন তাহাই প্রকৃত বিবাহ। এই বিবাহসুখ সম্ভোগের জন্য তাঁহার দ্বারে যে প্রার্থী হইয়া থাকে, শুভযোগে কাহারো না কাহারো আত্মার সহিত তাহার চিরপ্রেম-মিলন হয়। লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে উহার বীজ নিহিত আছে। তাই মানুষ, মনের মানুষ অন্বেষণ করে।

চিদানন্দ। তাহা সত্য, কিন্তু মানুষ আবার যেমন মানুষের শত্রু এমন আর কেহ নয়। দুষ্ট হিংস্রক অহঙ্কারী কপট অত্যাচারীদিগের এমন সকল কুটিল দুর্ব্যবহার আছে যাহা অসহ্য। পাপাত্মা দুরাচারীর ধর্ম্মভান সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য। তাহার কোন রূপ প্রতিবিধান না করিলে সংসারে জীবনধারণ করা যায় না, স্বর্গভোগ ত দূরের কথা। অথচ সে বিষয়ে বল কিম্বা ক্রোধ প্রকাশ করিতে গেলে অন্তরে শান্তি থাকে না। কেবল প্রেমিক ক্ষমাশীল যদি হই, দুষ্টেরা প্রশ্রয় পাইয়া ধর্ম্ম অর্থ লজ্জা সম্ভ্রম জীবন সকলই নাশ করিবে। আবার যদি কর্ত্তব্যানুরোধে ন্যায়পক্ষ সমর্থন এবং সত্য রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হই, তোমার প্রতি ভক্তি রাখিতে পারি না; চিত্ত বিকৃত, হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। যাহা অসহ্য তাহা চিরকাল সহ্যই বা করিব কিরূপে? এবং ক্রমাগত তাহা যদি করি, বিবেক মনুষ্যত্ব নীতি ভদ্রতায় একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

সদানন্দ। বিধাতার পানে চাহিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বনের তুল্য শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। দুষ্ট প্রকৃতি দুর্জ্জনদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার অন্য পন্থাও আছে। ভগবৎ প্রেরিত শুভ বুদ্ধি এবং সুকৌশল প্রভাবে সাধুরা অনেক সময় আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রোধান্ধ হইয়া দুষ্ট বুদ্ধি ও পশুবল আশ্রয়

করিলে সে শুভ বুদ্ধি পাওয়া যায় না। সহিষ্ণুতা সহকারে কোন্ অবস্থায় কি বিষয়ে কত দূর ত্যাগস্বীকার করা যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য দৈবাদেশের জন্য প্রতীক্ষা এবং প্রার্থনা করিবে। দুষ্টদিগের কুমন্ত্রণাজাল এবং অত্যাচারীর উৎপীড়ন হইতে তিনিই আপনার দাসদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

কর্ম্মযোগ—ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিষয়সুখ ও বৈরাগ্য।

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ, যাহাদের ইহ সংসারে বিপুল বিত্ত সম্পদ্ ক্ষমতা প্রভুত্ব এবং পার্থিব ভোগ্য অনেক থাকে তাহারা কি কখন তোমায় পাইবে না? মহাযোগী পরম বৈরাগী শ্রীঈশাদেব বলিয়াছেন, "সূচীর ছিদ্র দ্বারা বরং উষ্ট্রের গমন সহজ, তথাপি ধনীসন্তানের স্বর্গরাজ্য প্রবেশের কোন সম্ভাবনা নাই।" বস্তুতঃ ইহার প্রমাণ যেখানে সেখানে দেখিতে পাই। তবে বিপদাপন্ন দীন কাঙ্গালেরাই কি তোমার জন্য লালায়িত হইবে, আর যাহাদের সংসারে তেমন প্রলোভনের বস্তু নাই, কিন্তু ভাবনা চিন্তা অভাব অনেক, কেবল তাহারাই তোমাকে অন্বেষণ করিবে? দরিদ্রাবস্থার লোকেরা যখন আবার ধন সম্পদের অধিকারী হয় তখন তাহারাও আর তোমাকে চায় না, লৌকিক ধর্ম্মের অনুরোধে কেবল নিজ সুখ সৌভাগ্যের জন্য মাঝে মাঝে দুই একটা ধন্যবাদ দেয় এই মাত্র। ফলতঃ যেখানেই আমি বিষয়সুখের প্রচুর আয়োজন দেখি সেখানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার আসক্তি মোহ বিলাস যেন অবশ্যম্ভাবী। ভোগ বিলাস সুখ সম্পদের সঙ্গে বৈরাগ্য ভক্তি বিনয় দীনতার সামঞ্জস্য কি সম্ভব?

ব্রহ্ম। দীনাত্মা ভিন্ন আমাকে কেহ চায়ও না, সুতরাং পায়ও না। কিন্তু ধনহীন দরিদ্র হইলেই যে তাহার আত্মাতে বৈরাগ্য অনাসক্তি এবং দীনতা থাকে তাহা নহে। নিতান্ত যে দুঃখী তাহারও পর্ণকুটীর, ভগ্ন জলপাত্র, এবং ছিন্ন কন্থার প্রতি মহা আসক্তি। ধনী হউক, মধ্যবিধ সম্পন্ন গৃহস্থ হউক, কিম্বা দরিদ্র হউক,

অন্তঃকরণে যাহার যখন বিবেকের উদয় হয় তখনই তাহার আত্মা বৈরাগ্য ও দীনতা অবলম্বন করে। সত্যাসত্য নিত্যানিত্য বিচারে যে অক্ষম সে যদি সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগীও হয়, তথাপি তাহার আসক্তি কিছুতে যায় না। ধনীরা যেমন বিস্তীর্ণ ভূভাগ, ধন জন যৌবন শ্রীসম্পদ এবং প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্যের মায়ায় অন্ধ আসক্ত, বৃক্ষতলবাসী সাধু ফকির কিম্বা কুটীরবাসী অতি দরিদ্র নিরন্ন ব্যক্তিও তেমনি শিষ্য যজমান কৌপীন কমণ্ডলু, হুকা কলিকা, কিম্বা সামান্য মৃৎপাত্রের প্রতি আসক্ত; আসক্তি একটি মানসিক ব্যাধি, তদ্বিষয়ে ধনী দরিদ্রের কোন প্রভেদ নাই। তাহার নিকট বিপুল রাজৈশ্বর্য্য এবং শতচ্ছিদ্র ভগ্ন জলপাত্র উভয়ই সমান। সে ব্যাধি যখন ছুটিয়া যায় তখন মহাসম্পদশালী সম্রাট্ এক নিমেষের মধ্যে সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী হয়। এক দিকে দেখিতে গেলে যে ব্যক্তি কখন পার্থিব সুখ বিলাস সম্ভোগ করে নাই, অথচ সুখপিপাসা বশতঃ যে কল্পনায় বিলাসী ধনীর উচ্চতর সুখভোগকে পরমসুখ মনে করে, তাদৃশ দরিদ্র জীবনে বাসনা লালসা অতিশয় প্রবল। পক্ষান্তরে বাল্যকাল হইতে যে বিবিধ বিলাস সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদিও অভ্যাস বশতঃ তাহাতে সে অনুরক্ত আসক্ত, কিন্তু অনেক ভোগ করিয়া করিয়া বহু পরিমাণে তাহার পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অতএব প্রচুর সম্পদ এবং ভোগ্য বস্তু যে কেবল আসক্তির কারণ তাহা মনে করিতে পার না।

জীব। অবশ্য আসক্তি একটী মহাব্যাধি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহা মোহবশতঃ অবিবেকীর অন্তরে সঞ্জাত হয়; তথাপি ধনী দরিদ্রের বাহ্য প্রলোভনের প্রভাব সম্বন্ধে গভীর পার্থক্য আছে। সেই জন্য সচরাচর দেখিতে পাই, অর্থবিত্তবিহীন নগণ্য দরিদ্র কিম্বা মধ্যবিধ শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র হয়; দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব কষ্ট তাহাদের এ পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কিন্তু ধনীসন্তান যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে অহঙ্কারী বিলাসী খামখেয়ালী স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর অভিমানী স্বার্থপর নীচমনা পরসুখে দুঃখী সমতাবিদ্বেষী হইয়া উঠে। দুঃখ অধীনতা অভাব কি তাহা সে জানে না, কাজেই তোমার কিম্বা তোমার প্রেরিত সাধু মহাত্মাদিগের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি হয় না; আপনাকেই সে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া মনে করে। যদিও জনক যুধিষ্ঠির অম্বরীষ, শাক্য প্রতাপরুদ্র এব্রাহেম মার্ক আরিকিউলাস

রূপসনাতন রামানন্দ রঘুনাথ প্রভৃতির ন্যায় ধনী নরপতিদিগের জীবনে বৈরাগ্য ভক্তি দীনতার অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য নিদর্শন প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ ধনী সম্বন্ধে শ্রীঈশাদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা চিরপ্রসিদ্ধ সত্য। ধনৈশ্বর্য্যের এমনি মোহিনী শক্তি, পথের ভিখারী অতি নিকৃষ্ট অজ্ঞাতকুলশীল তৃণ সমান পদদলিত ব্যক্তিও তাহার স্পর্শে ঘোরতর অহঙ্কারী বক্রগ্রীব হইয়া উঠে। বংশপরম্পরা তাহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, "আমরা ধনী বড় লোক, ধর্ম্ম পুণ্য বিনয় বৈরাগ্য ভক্তি বিশ্বাসে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; যাহারা অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গালী, বহু-পরিশ্রমে যাহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, ধর্ম্মবিশ্বাস বৈরাগ্য ভক্তি দৈবনির্ভর ব্যতীত তাহাদের আর উপায়ান্তর নাই। অতএব তাহা-রাই কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ঘুরিয়া বেড়াক, আমরা চিরদিন সুখ সচ্ছন্দে বিলাস আমোদ ভোগ করিব; ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের কোন অভাব বোধও নাই, এবং তাহা সাধনের অবসরই বা কোথায়?" এ সকল ব্যক্তি সময়ে সময়ে বিপদ পরীক্ষায় পড়ে বটে; স্ত্রী পুত্র বিয়োগে বা অভাবে, উৎকট রোগ বা নিদারুণ শোকে, ধনহানি বা মানহানিতে তাহাদের অন্তরে বিদ্যুৎবৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু তাহা কেবল নৈরাশ্য এবং ক্ষোভজনিত; বিনয় ভক্তি বিশ্বাস নির্ভরের সঙ্গে তাহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। জাতক্রোধ, প্রতি-হিংসা, দম্ভ অহঙ্কার, কুবুদ্ধি চাতুরী, বাক্-কৌশল, আত্মাভিমান এবং পার্থিব বল ক্ষমতা দ্বারা যাবতীয় ক্ষতি তাহারা পূর্ণ করিতে চায়। যখন আর কোন উপায় থাকে না, রাজলক্ষ্মী যখন নিতান্তই বাম হন, তখন উহারা শাখাভগ্ন শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় কালের দুর্জ্জয় শক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শন করে। তথাপি বংশগৌরবসূচক অসারতা এবং বৃথাভিমান প্রকাশে ক্ষান্ত হয় না। তাহাদের তৎকালকার অবস্থা অবিকল বিষবীর্য্যবিহীন ভগ্নকটী বৃদ্ধ কালসর্পের ন্যায়। ফলতঃ বিষয়ের বিষ অতি ভয়ানক। দুঃখী হতভাগ্যদিগের সহজেই চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু হৃষ্ট পুষ্ট ছাগশিশুকে যেমন ব্যাঘ্রের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া যায় না, ধনীকে বিষয়াসক্তি হইতে রক্ষা করা তাহা অপেক্ষাও কঠিন। হায়! এ সকল জীবের কি গতি হইবে। পার্থিব প্রলোভনে ফেলিয়া তাহা-দিগকে তোমাধনে কেন ঠাকুর এরূপে বঞ্চিত রাখিয়াছ? দিনান্তে একটী বার

তোমার মধুর নাম তাহাদের কর্ণে কি প্রবেশিধিকারও পাইবে না? সে দিন যে যুবা মেষশিশুর ন্যায় সরল বিনম্র ছিল, পরদুঃখে যাহার চক্ষে জল পড়িত, যাই সে উপার্জ্জনক্ষম ধনবান্ হইল অমনি সে সকল গুণ কোথায় চলিয়া গেল! অহঙ্কার স্বার্থ কৌটিল্য তখন যেন একবারে মূর্ত্তিমান। হায় কেন এ বিকৃতি বল না!

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ হরি স্মিত মুখে বলিলেন, "বৎস, তজ্জন্য খেদ করিও না, তাহাদেরও উদ্ধারের উপায় আছে, আমি সে সকল লোককে ভুলি নাই। ধন সম্পদ্ পদমর্য্যাদা প্রভুত্ব শক্তির যথাযথ ব্যবহার শিখিলে ধনীসন্তানেরাও স্বর্গে যাইতে পারিবে। তাহাদের বৈরাগ্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন্ অবস্থার লোকদিগকে আমি কোন্ পথ দিয়া কি প্রণালীতে নিয়তির দিকে লইয়া যাইতেছি তাহা তোমরা জান না, কিন্তু আমি জানি; এবং কাহার দ্বারা বিশ্বোন্নতি সম্বন্ধে কি কাজ আমি সাধন করিয়া লইতেছি তাহাও তোমাদের জ্ঞানের অগোচর। ধনীরা আমার কোষাধ্যক্ষ এবং ভৃত্য। কেবল ধনৈশ্বর্য্য থাকিলেই মানুষ অহঙ্কারী নাস্তিকবৎ হয় তাহা নহে, জ্ঞান এবং ধর্ম্মেরও যথেষ্ট অভিমান আছে। দরিদ্র অথচ জ্ঞানী পণ্ডিত, ঈদৃশ লোকদিগেরও কি অহঙ্কার কম? বরং ধনীরা সুখ সৌভাগ্যের কালে আমার নিকট কৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু জ্ঞানীরা বুদ্ধিবলে আমার ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চায়। যাই হউক, এই জ্ঞানী ধনী উভয় শ্রেণীর লোক সকলেরও গতি হইবে। সাধক তপস্বী যোগী ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিরা যখন জ্ঞান ও ধর্ম্মাভিমান ছাড়িয়া অহংবর্জ্জিত মদ্গতপ্রাণ হইবেন তখন ঐ সকল ধনাঢ্য ব্যক্তির বিবেক জাগিয়া উঠিবে; তখন জ্ঞান এবং ধনের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং সদ্ব্যবহার সকলে জানিতে পারিবে। এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগের দায়িত্ব যে কত গুরুতর, কি জন্য যে আমি তাহাদিগকে জ্ঞান এবং ধন দিয়াছি তাহা বুঝিতে না পারিয়া মোহহ্রদে উহারা ডুবিয়া রহিয়াছে। আত্মাভিমান, নীচ কামনা চরিতার্থ এবং পাশবসুখ সম্ভোগের জন্য আমি কাহাকেও জ্ঞানী বা ধনী করি নাই। যাহাকে যে পরিমাণে ক্ষমতা শক্তি দিয়াছি সেই পরিমাণে তাহার নিকট হইতে হিসাব লইব। কে কত দিন অহং মদে মত্ত থাকিবে? আমার প্রেরিত জরা মরণ ব্যাধি এবং বিপদ শাসনকে কেইবা না ভয় করে? পার্থিব ভোগসুখ, ইন্দ্রিয়প্রলোভনেই বা কত কাল কাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে? ভোগেরও সীমা আছে। ভোগসামর্থ্যাপেক্ষা ভোগ্য বিষয় অনন্ত। তুমি নিজে বৈরাগী

হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হও, এবং আপনি জাগিয়া তাহাদিগকে জাগাও। তখন দেখিবে, হরিভক্তি এবং ব্রহ্মযোগের প্রলোভন আকর্ষণ কত। তখন বিষয়সুখ বিদ্যোপাধি ধন মান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধনী ও জ্ঞানীরা আমার প্রেমের জন্য কাঙ্গালী হইবে।”

জীব আশাপূর্ণ বচনে বলিলেন, “পরিণামে তাহা ভিন্ন আর গতি কোথা? তোমার মঙ্গল ইচ্ছা নিশ্চয়ই এক দিন ঐ সকল ব্যক্তির কঠোর জীবনকে পরাস্ত করিবে। কিন্তু আমি এখন এইটী জানিতে চাই, ধন সম্পদ সুখবিলাস কি তবে একান্তই পরিহার্য্য? রাজপরিবারে কি ধনীগৃহে যে জন্মিয়াছে, সর্ব্বত্যাগী ফকির না হইলে কি আর সে তোমার চরণে স্থান পাইবে না? সুখ ঐশ্বর্য্য প্রভুত্বও তো তোমারই দান। কেন তবে ইহার ভিতরে থাকিয়া তোমার ভক্ত হওয়া যাইবে না?”

ব্রহ্ম। অন্তরে বিবেক বৈরাগ্য এবং নির্লিপ্ত ভাব থাকিলে ধনীও ভক্ত হইতে পারে, সম্রাট নরপতিও আমার প্রেমের জন্য ক্রন্দন করে। উপাদেয় ভোগ্য তাহাকে কখন আসক্ত করিতে পারে না। বৈরাগ্য প্রভাবে লালা বাবু পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। তিনি যদি গৃহেও থাকিতেন, কোন প্রকার সুখবিলাসে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। ধনী নিজে সুখী হইয়া পরকে সুখী করিবে, পরের সুখে সুখী হওয়াই পরম সুখ। নিজের জন্য অতি সামান্যই দরকার হয়।

জীব। পরিমিত ভোগ কি তবে ভক্তি বৈরাগ্যের অনুকূল?

ব্রহ্ম। যদি আসক্তি তাহাতে থাকে, অনুকূল হইতে পারে না। বাহিরে যত কেন সুখ বিলাস বৈভব থাকুক না, হৃদয়কে নিরন্তর আমাতে বদ্ধ রাখিতে পারিলে আর কোন ভয় নাই।

জীব। এক দিকে রাশি রাশি সুখ প্রলোভন, অন্যদিকে বৈরাগ্য ভক্তি এক সঙ্গে দুইটী বিপরীত বিষয়ের কি সামঞ্জস্য হইতে পারে?

ব্রহ্ম। আমার প্রেমে যে মত্ত ইন্দ্রিয়সুখলালসা তাহার থাকে না। সে কেবল আমার ভাণ্ডারী এবং পরিচারক হইয়া আমার আদেশে ধনের সদ্ব্যবহার করে। সে জানে তাহার নিজভোগ বা অতি ভোগের জন্য আমি তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা দান করি নাই, অপরের অভাব মোচনের জন্য তাহা দিয়াছি। ইহা যে ধনী ভুলিয়া যায়, সে ব্রহ্মস্বাপহারী তস্কর প্রধান। বিন্দুমাত্র

পার্থিব ভোগ লালসা অন্তরে থাকিলে হরিভক্তি জন্মে না। অল্প ধনী বা নির্ধনী যদি অনাসক্ত চিত্তে সংসারে থাকিয়াও আমার অনুগত ভক্ত হইতে পারে, সেই ভাবে উচ্চ পদস্থ মহাধনীও পারিবে। অনিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্তি এবং আমাতে একান্ত আসক্তি এ প্রশ্নের মীমাংসা।

কর্ম্মযোগ—বিংশ অধ্যায়।

বৈষয়িক নীতি।

তদনন্তর শ্রীজীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ অর্থোপার্জ্জন একটী সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, ইহা ত ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলকার জন্যই দেখিতে পাই; অধিকাংশ ব্যক্তির সমস্ত জীবনই ইহাতে অতিবাহিত হয়। ইহাতেও কি প্রকৃতি ভেদ আছে?"

ভগবান বলিলেন, "নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অর্থের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু কর্ম্মই অর্থ; অথবা তাহার ফল স্বরূপ অর্থ। স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে তাহার ফলস্বরূপ অর্থ পরোক্ষ কিম্বা প্রত্যক্ষভাবে আপনিই আসিয়া থাকে। কিন্তু কে কোন্ কাজের জন্য উপযুক্ত তাহা জানিয়া সেই সেই কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে। অর্থোপার্জ্জন, অর্থব্যবহার নৈতিক উন্নতির এক প্রধান উপলক্ষ। এই অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্যেই চরিত্র গঠিত হইবার উপায় আমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি জনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে তাহার বিবেক বুদ্ধি নীতিবৃত্তি যথাযথরূপে পরিচালিত এবং বিকসিত হইয়া ব্যবহার চরিত্র ফুটিয়া উঠিবে। যে কার্য্যে যে আছে, তাহাই তাহার পক্ষে সাধনক্ষেত্র জানিও। যে কুলি সে কুলীর কাজেই পরিত্রাণ পাইবে। মধ্যবিন্দু হইতে বৃত্ত রেখার সকল স্থানের দূরত্ব যেমন সমান, প্রতি জীবনের সহিত আমার সম্বন্ধ তদ্রূপ।

জীব। কিন্তু মানুষেরা কেবল কার্য্যেতেই ব্যস্ত, নিজের অভাব পূর্ণ হইলে তদনন্তর ভাবী বংশের তিন চারি পুরুষের দেহযাত্রা কিসে সুখে

নির্ব্বাহ হয় তাহাও ভাবে। এই অবস্থায় তাহারা শেষে মরিয়া যায়, তথাপি জ্ঞান শিক্ষা করে না।

ব্রহ্ম। পৃথিবী শুদ্ধ সমস্ত প্রাণী এবং নরনারী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে আত্মঃবিসর্জ্জন করে তাহার গূঢ় অর্থ কি ভাবিয়া দেখ। কিন্তু আমি কি পশুর ন্যায় মানুষকে উদরপরায়ণ করিয়াছি? কার্য্যক্ষেত্রে নানাবিধ অবস্থা ঘটে, তদুপলক্ষে জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা হয়, এই জন্য সকলকে আমি সংসারকার্য্যে ব্রতী রাখিয়াছি। ক্ষুধা শান্তি সে কার্য্যের প্রথম উত্তেজক অজেয় শক্তি। তাহার পরেই আত্মোৎপাদন জন্য সঙ্গী অন্বেষণ প্রবৃত্তি। দেহপোষণ ও আত্মোৎপাদন প্রবৃত্তির সঙ্গেই ধর্ম্মনীতির কর্ত্তব্যফাঁদ পাতা আছে।

জীব। প্রকৃত পক্ষে কাজের লোক হইতে গেলে কিছু কিছু মিথ্যা চাতুরী ছলনার যেন প্রয়োজন হয়। এই জন্য দেখিতে পাই, ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও অতি সূক্ষ্ম আকারে ধর্ম্ম ও নীতির আবরণে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন; তদ্ভিন্ন অর্থ বিত্ত ক্ষমতা প্রভুত্ব প্রচুর পরিমাণে আয়ত্তীকৃত হয় না, তাহা না হইলে কাজের অনেক ব্যাঘাত ঘটে। যদি দেশের উপকার কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে অর্থ এবং প্রভুত্বের প্রয়োজন। কাহারও কিছু অনিষ্ট না করিয়া অত্যল্প মিথ্যা প্রতারণার সাহায্যে ভাল কাজ করায় কি কোন দোষ আছে? যদি থাকে, উত্তম কর্ম্মফল কি অধম উপায়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইতে পারে না?

ভগবান। কখনই না। এরূপ মিথ্যা কৌশলমিশ্র কার্য্যের মূলে মনুষ্যের গূঢ় আসক্তি স্বার্থপরতা থাকে। তাহার দুর্গন্ধ বহু ফলপ্রদ মহাযজ্ঞের আহুতি গন্ধেও ঢাকিয়া রাখা যায় না। আমি অনেক কার্য্য, কিম্বা প্রচুর কল্যাণকর কার্য্য চাই না, মানুষের বিশুদ্ধ অভিপ্রায়টী কেবল দেখিতে চাই। সৎকার্য্যের জন্য যুগে যুগে কত লোক জন্মিবে! আমার কার্য্য আমিই করি, মনুষ্য কেবল উপলক্ষ মাত্র; সুতরাং ছল চাতুরী দ্বারা নির্ব্বাহিত কার্য্য পণ্ড শ্রম মাত্র। সাধু সঙ্কল্পে ব্রতী নিঃস্বার্থ প্রেমিকের বহু কল্যাণপ্রদ কত কত মহৎ কীর্ত্তিও কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে কি তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসী অকৃতার্থ করিতে পারে? সৎ সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা পুরস্কৃত এবং কৃতার্থ হন।

জীব। তবে ধ্যান চিন্তা সাধন ভজনের পরিমাণ বাড়াইয়া সেই সঙ্গে অল্প কিছু কিছু কার্য্য করাইত ভাল।

ভগবান। তাও না। পূর্ণমাত্রায় বিষয় কার্য্য করা চাই। সে জন্য দায়িত্ব বোধ, ভাবনা চিন্তা চেষ্টা উদ্যম যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক। তন্নিমিত্ত অনেক সময় বিপদ পরীক্ষা ক্ষতি অবমাননা নির্য্যাতন বিশেষ কল্যাণপ্রদ। সমস্ত মনোবৃত্তি, বিবেক বিশ্বাস বৈরাগ্য ভক্তির উপর দায়িত্বের গুরুভার পড়িলে তবে জীব আমার নিকট প্রার্থনা করিবে, এবং সেই প্রার্থনা দ্বারা আদেশ বাণী শুনিবে এবং দৈববল পাইবে। যাহার উপর কোন বিশেষ কার্য্যের দায়িত্বভার নাই, তাহার দিব্যজ্ঞান এবং দৈববলের কোন প্রয়োজন হয় না। দায়িত্ববোধই স্বর্গীয় বল বুদ্ধি লাভের উপায়। আমি যাহাকে যে কার্য্যের ভার দিই নাই সে যদি সে সম্বন্ধে আদেশ প্রাপ্তির ভান্ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় আত্মপ্রবঞ্চক এবং কপটী দাম্ভিক বলিয়া জানিবে। কিন্তু লোকভয়ে কেহ যদি নিজের বিশেষ দায়িত্ব পালনার্থ আমার কোন একটী আদেশ অবহেলা করে, কিম্বা বিনয়ের অনুরোধে দৈবাদেশ ঘোষণায় কুণ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সে আমার নিকট গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

জীব। চিরকাল পৃথিবীতে কি মানুষ বিষয় কার্য্য লইয়াই কেবল বিব্রত থাকিবে? প্রেমভক্তি ধ্যান সমাধি সম্ভোগের সময় কি পাবে না?

ভগবান। যত দিন যে পরিমাণে শারীরিক কিম্বা মানসিক কার্য্যশক্তি থাকিবে তত দিন প্রকৃতি তোমাকে স্বতঃই কার্য্যচক্রে ঘুরাইবে। এবং তত দিন পর্য্যন্ত তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে আমার লীলাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। পরে সময় আসিলে বাহ্য কার্য্য আর করিতে হইবে না। তখন ধ্যান সমাধি।

জীব। কার্য্যের ভিতর তোমার লীলা মূর্ত্তির সন্দর্শন কিরূপ আমাকে বুঝাইয়া দাও।

ভগবান। যত ক্ষণ কাজ আছে তত ক্ষণ কর্ম্মকর্ত্তার প্রেরণা, পরামর্শ, ইঙ্গিত, সাহস বুদ্ধি পদে পদে দরকার। সেই অবস্থায় আমি লীলাময়রূপে ভক্তের নিকট অশেষ লীলা প্রদর্শন করি। যাহাদের বুদ্ধি জ্ঞান অতি প্রখর তাহারা শারীরিক শ্রম অধিক করে না, তথাপি জ্ঞান এবং ইচ্ছায় তাহারা

সর্ব্বদা কর্ম্মযোগে যোগী। আবার এমন লোক অনেক আছে যাহাদের শরীরের বল ক্ষমতা অধিক; তাদৃশ ব্যক্তি চিরদিন শরীর যোগে কর্ম্ম করিয়া থাকে। দিব্যজ্ঞান প্রভাবে যখন আমার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছা এক হইবে তখন তোমার বাহ্যকর্ম্মের উপর কোন কিছু আর নির্ভর করিবে না। তথাপি যত দিন জীবনীশক্তি থাকিবে তত দিন নিজের জন্য না হউক, অন্ততঃ পরসেবার জন্য কিম্বা লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কেন না, জনসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্তে অজ্ঞান মূঢ় জীবসাধারণ নিত্যকর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক ক্রমে জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিয়া থাকে।

জীব। কোন কার্য্যে ভালরূপ কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে এবং তাহার সফলতার পরিমাণ অধিক না হইলে অন্তরে কৃতার্থতা জন্মে না।

ব্রহ্ম। তাহাও এক প্রকার আসক্তির লক্ষণ। সেই নিমিত্ত অনেকে অসদুপায়ে অনেকানেক সৎকার্য্য করিতে গিয়া শেষে ধর্ম্মভ্রষ্ট নরকগামী হয়। আমার অনুমোদিত কার্য্য সাধনের জন্য যদি কেহ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দশ দিন ভাবেও, তাহাও কার্য্যমধ্যে গণ্য হয়। সাধু ভক্তজনের মুখের একটী সত্যবাক্য কত শত নূতন সৃষ্টির কারণ তাহা কি বুঝিতে পার? ভক্ত সেবকের এক বিন্দু অশ্রু,—কণ্ঠের একটী সঙ্গীত—অথবা একটী কথায় পাষাণ সমান কঠিন প্রাণ বিগলিত হইয়া যায়।

জীব। তবে এখন আমি বুঝিলাম, বহুপরিশ্রমের কাজ, কিম্বা আশু ফলপ্রদ অধিক পরিমাণ কাজের উপর মুক্তি নির্ভর করে না।

ভগবান। আমি জীবগণের অবস্থানুযায়ী কার্য্য বিভাগ করিয়া রাখিয়াছি। শরীর যত অক্ষম দুর্ব্বল হইবে ততই তাহারা মনোজগতে প্রবেশ করিবে; পরিশেষে অধ্যাত্মযোগে নিত্য শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করিবে। তাহার নির্ব্বাণ শান্তি, আত্মবিসর্জ্জন ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ব্যাপার এক অর্থে নিষ্ক্রিয়, অথচ তাহা শত সহস্র যাগযজ্ঞ অপেক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ী। সাধু মহাত্মাদিগের নীরব প্রার্থনাবলে সমস্ত মনোজগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ চিরদিন মহাবলে বিঘূর্ণিত হইতেছে। সাধু ইচ্ছাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ।

জীব দেববাক্য শ্রবণ করতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে অনুরঞ্জিত হইয়া কৃতার্থের ন্যায় সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "বিশ্বের এই যে সমস্ত বৈষয়িক কর্ম্মবিধান,

ইহা অতীব আশ্চর্য্য। নিজ নিজ দেহ পোষণের জন্য অজ্ঞান মূঢ় ব্যক্তি, সদ্যোজাত শিশু, পশু, প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রাণীটী পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছে। বংশের পর বংশ তাহারা ক্রমাগত জন্মিতেছে আর মরিতেছে। যুগযুগান্তর প্রবাহিত এই সমস্ত কর্ম্মজীবি জীবদিগের জীবন নিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক তাহা হইতে জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির নিত্য তত্ত্ব তুমি ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করিয়া লইতেছ।"

কর্ম্মযোগ—একবিংশ অধ্যায়।

সুখদুঃখের তত্ত্ব।

অতঃপর জীব বলিলেন, "তুমি সুবিচারক, দয়াময়, মঙ্গলসঙ্কল্প, অতএব ফলসম্বন্ধে তুমি যাহা করিবে তাহাতে আমার ভালই হইবে, এই বিশ্বাসে সজীব হইয়া আচ্ছা যেন কর্ত্তব্য কার্য্য আমি করিলাম; কিন্তু তদ্ভিন্ন আমি যে সকল পার্থিব সৌভাগ্য কিম্বা সুফল তোমার অনুমোদিত এবং আমার মোক্ষ সাধনের পক্ষে কল্যাণকর উপায় বলিয়া জানি তাহার প্রতি কোন আশা রাখিব না কেন? তাহাতে আমার তো কোন স্বার্থ নাই। অথবা তাহাতে আমার এমন স্বার্থ সুবিধা আছে যাহা তোমার মঙ্গল নিয়মেরই অনুগত। ঈদৃশ স্থলে তোমার প্রীতিকামনায় পার্থিব কোন রূপ সৌভাগ্যজনক ফলের প্রত্যাশা করায় দোষ কি আমি ত বুঝিতে পারি না। পার্থিব সুখের জন্যেও ত বিশ্বাসী লোকে তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হয়। এরূপ নিঃস্বার্থ পারিবারিক এবং পরহিত-কর কার্য্যে আশানুরূপ ফলের প্রত্যাশায় কি কোন প্রত্যবায় আছে?

ভগবান। তাহাতে যে তোমার গূঢ় আসক্তি এবং আত্মাভিমানজাত স্বার্থ-পরতা নাই তাহা কিরূপে জানিলে?

জীব। আমার যখন নিজের কোন স্বার্থ বোধ তাহাতে নাই, এবং আমি কেবল তোমারই মঙ্গল রাজ্যের উন্নতি কামনা করি, তখন আসক্তি কেন থাকিবে?

ভগবান্। তা থাকে। ঠাকুর সেবার নাম করিয়া অনেকে আত্মোদর পূর্ণ করে। তাহা ব্যতীত এমন অনেক সাধক আছে যাহারা নিজে পরম বৈরাগী অনাসক্ত হইয়াও স্ত্রী পুত্র কন্যা, কিম্বা অনুগত বাধ্য এবং সম্বন্ধীয় সুখের জন্য

অতিশয় লালায়িত। তিনি নিজে কৌপীন কন্থা করোয়াধারী, পর্ণকুটীরবাসী নিরামিষ হবিষ্যান্নভোজী, ভিক্ষোপজিবী সর্ব্বত্যাগী; কিন্তু তাঁহার অন্তরের একান্ত কামনা যে স্ত্রীটী উত্তম বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া চিরসুখে থাকে,— উপাদেয় পান ভোজনে পরিপুষ্ট হইয়া সুস্থ শরীরে অট্টালিকায় বসিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে,—কন্যা পুত্র, জামাতা পুত্রবধূ, নাতি নাতিনীরা ফীটফাট হইয়া রাজপথে বেড়ায়,—তাহাদের শারীরিক সৌন্দর্য্য, সামাজিক পদ সম্ভ্রম, অর্থ বিত্ত খুব বাড়ে। সন্ন্যাসী এইরূপে বংশান্তরে আসক্তি চরিতার্থ করিতে চাহেন। দেহান্তরে এ ভাবেও আসক্তি বেশ চরিতার্থ হয়।

জীব মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "ঠাকুর, এ আবার যে নূতন কথা শুনিলাম! ইহা কি সম্ভব? কি জানি, অনন্ত তোমার লীলা, ইহাও তবে তোমার এক লীলা বোধ হয়। যা হউক, তোমারই মুখে এ কথা কেবল শোভা পায়।"

ভগবান। হাঁ, লীলা তাহাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু সত্য ঘটনা।

জীব। আচ্ছা, ইহা যেন তোমার একটী লীলা। কিন্তু নিজে কোন রূপ ভোগস্পৃহা চরিতার্থের আশা পরিপোষণ না করিয়াও এ ভাবে বংশান্তরে শুদ্ধ কেবল তোমার স্বর্গরাজ্য বিস্তার বাসনায় কি মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে না? পরিবারস্থ সুস্থ সবল সুশ্রী সুবিদ্বান্ আত্মীয়দিগকে লইয়া তোমার সুখী-পরিবারে পবিত্র বেদিকার চারি পার্শ্বে দিব্যাসনে পবিত্র বসনে ভূষিত হইয়া আমরা বসিব, তব পাদপদ্মে কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ করিব, সমস্বরে মধুর তানে গীত গাইব; এটা কি সাত্ত্বিক বাসনা নহে? আমার ছেলেটী ভালরূপে লেখা পড়া শিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক টাকা আনিবে, সুন্দরী পুত্রবধূ একটী আসিয়া আমার বাড়ী আলো করিবে, তাহার গর্ভে কষিতকাঞ্চনতুল্য গৌরবর্ণ পৌত্র, পৌত্রী ভাবীবংশ জন্মিবে, সকলে মিলিয়া আমরা ধর্ম্ম কর্ম্মে দান ধ্যান করিব, দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্র দিব, তোমার নামে মহোৎসব করিয়া বাড়ী ঘর সাজা-ইব; ইহাও কি সাত্ত্বিক কামনা নহে? সুখী পরিবারের যে ছবি তুমি আমার অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছ তাহা কেন বাহিরে দেখিতে পাইব না?

ভগবান। যদি বাসনা আসক্তি স্বার্থপরতা না থাকে, সকলই আশা করিতে পার। কিন্তু এরূপ ভক্তিতে বহু পরিমাণে রজোগুণ মিশ্রিত থাকে।

স্থুখীপরিবারের লক্ষণ বাহ্য বিলাস ঐশ্বর্য্য ভোগে প্রকাশ পায় ইহা মনে করিও না।

জীব। সে কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্থখ সম্পদ বিলাসের মধ্যে লক্ষ্মী শ্রী দর্শনপূর্ব্বক তোমার মহিমা বিস্তারই তাহার উদ্দেশ্য।

ভগবান। সেটা কথায় বলিলে হইবে না। আমার আলোকে বিবেকের দ্বারা তাহা বুঝিয়া দেখিবে। ঐ সকল ধর্ম্ম আড়ম্বর এবং ভক্তির কবিত্ব লালিত্য মিষ্ট কথায় আমিত ভুলিব না। আত্মীয় অন্তরঙ্গের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ধন মান ঐশ্বর্য্যের ভিতর আমার মহিমা কয় জন লোক দেখিতে শিখিয়াছে? ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ, নাতি নাতিনীরা যদি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট দেহে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হয়ে, হেসে খেলে বেড়ায়, খুব টাকা কড়ি আনে, আর বিলাস স্থখ ভোগ করে, ইহা দেখিলেই কর্ত্তা গিন্নীর মন সন্তুষ্ট; কিন্তু তাহারা আমার ভক্ত হউক না হউক, কিম্বা একেবারে অধঃপাতেই বা যাউক, সে জন্য কোন ভাবনা চিন্তা কি তাঁহাদের হয়? আমার প্রীতিকামনায় পার্থিব স্থখ স্থবিধা ধনৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করা বড় উচ্চ মনের কার্য্য। সর্ব্বত্যাগী ফকির ভিন্ন তাহা কেহ পারে না। এ জন্য আত্ম-পর সমজ্ঞান আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ্যে আত্মীয় কুটুম্ব কেহ নাই, সকলেই আত্মীয়। ধর্ম্মের নামে সেবাইতেরা প্রচুর সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকে।

জীব। তা ঠিক বটে। কিন্তু যদি ঘরে অন্নের সংস্থান না থাকে, দারিদ্র্য কষ্টে পড়িয়া পরিবার সন্তান সকল রোগে অনাহারে উৎসৃষ্টলোভী কুকুরের মত পথে পথে দ্বারে দ্বারে বেড়ায়, মূর্খ দুরাচারী চোর দস্যু পরপ্রত্যাশী ভিখারী মদ্যপ হয়, তাহা হইলে তোমার স্বর্গরাজ্য কেমনে বিস্তার হবে? দারিদ্র্য দুঃখে অজ্ঞানান্ধকারে পাপে পড়িয়া কেহ নষ্ট না হয় এটাত তোমারই ইচ্ছানুযায়ী কামনা?

ভগবান। কিছু মাত্র দুঃখ পায় না, অগাধ ঐশ্বর্য্য বিদ্যা সম্মান উপাধি ভোগ করিতেছে, এমন লোকও অনেক আছে; কিন্তু তাহাতে কি তাহাদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাও? দুঃখ অভাব যেমন অধঃপতনের কারণ, স্থখ সৌভাগ্যও কি তেমনি নহে? ঘোর দুঃখ দ্রারিদ্র্যের ভিতর জন্মিয়া কত লোক আমার গৌরব সম্মান রক্ষা করে, আবার চিরদিন পুরুষানুক্রমে বিপুল বিলাস স্থখে প্রতিপালিত হইয়াও নরকের কীট, অতি সঙ্কীর্ণ নীচ হয়। অতএব বুঝিয়া দেখ, আত্মীয়দের মুক্তির প্রার্থী হইয়া লোকে কি পার্থিব সৌভাগ্য

চায়, না তাহার ভিতর তাহাদের গূঢ় আসক্তি মোহ থাকে? দারিদ্র্য মূর্খতা অপেক্ষা বাহ্য সভ্যতা, ধর্ম্মহীন নীতি, বিদ্যাভিমান, ধনগর্ব্ব অধিকতর অনিষ্টের কারণ জানিবে। উত্তম উপাদেয় সুরসাল সামগ্রী ভোজন করিয়া, রত্নখচিত পরিচ্ছদ পরিয়া, দিব্য অট্টালিকা ত্রিতল গৃহে স্বর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি শুইয়া, প্রচুর সুখ সম্পদ দাস দাসীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কয় ব্যক্তিকে মিষ্ট ভাষী, বিনীত স্বভাব, নিরহঙ্কারী দীনবৎসল পবিত্র চরিত্র হইতে দেখিয়াছ? কখন কোন্ অবস্থায় কাহার প্রতি কত পরিমাণে সুখ দুঃখ, দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক, যথার্থ সুখ দুঃখ এবং দারিদ্র্য সম্পদই বা কাহাকে বলে তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমরা জান না। বিন্দুমাত্র যেখানে আসক্তি থাকে তাহার নিকট বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞান অগ্রসর হয় না। তদবস্থায় যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের কথা লোকে বলে তাহা স্বার্থ আসক্তি প্রণোদিত। আমার আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বে চিত্তকে একবারে খালি করিতে হয়। নিজ নিজ বাসনা ও সুবিধার অনুরূপ কর্ত্তব্যাদেশ কেহ যেন প্রত্যাশা না করে। হে অপূর্ণ আত্মা দুর্ব্বল জীব, সম্পদের অবস্থায় মানুষ কোথায় কোন্ সামগ্রী নিরাপদে আপন কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করিবে, কাহাকে ভোগাবশিষ্ট অব্যবহার্য্য কিঞ্চিৎ দিবে, কাহাকে বা দিবে না; যদি কিছু দেয়, তৎপরিবর্ত্তে গৃহীতার নিকট কত পরিমাণে বংশপরম্পরা তোষামদ দাসত্ব পাইবে, এবং সপরিবারে তাহা নিজে কত ভোগ করিবে এই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। রাশি রাশি নয়নমনোহর ভোগ্য সামগ্রী ভাল করিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে, দেখিতে তাহাদের সময় টুকু সবই যায়, যাহা কিছু বাকী থাকে তাহাও ঐ সকল বিষয়ের ভাবনা চিন্তা দর্শন শ্রবণ, আলোচনা, আশা কল্পনা এবং উদ্যোগে অতিবাহিত হয়; সুতরাং এমন একটু অবসর কিম্বা ইচ্ছা থাকে না, আমি যে সর্ব্বসুখদাতা বিধাতা আমাকে একবার তাহারা স্মরণও করে। কোথায় আমার প্রদত্ত সুখসেব্য সামগ্রীর ভিতর দিয়া আমার দয়া স্নেহ দেখিয়া ভক্তি কৃতজ্ঞতায় তাহারা বিগলিত হইবে, তাহা না হইয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্পদকে আমার আবরণ প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া রাখে। মহার্ঘ হীরক অঙ্গুরী বা মণিহারের ভিতর আমার মুখচ্ছবি দেখিবার চক্ষু কয় জনের আছে? তবে কখন কখন যে দেখিতে পাও, গদ্‌গদ্ ভাবে গললগ্নীকৃতবাসে আমার পূজার মন্দিরে আসিয়া আমাকে তাহারা প্রণাম করে; কখন বা আমার

উদ্দেশে কাঁদে; ধূলায় গড়াগড়ি দেয়, সে কেবল প্রিয় আত্মীয় জনের রোগ ও মৃত্যুভয়ে, না হয় বিষয় হানির আশঙ্কায়, অথবা অধিকতর বৈভব প্রাপ্তির কামনায়। সে ভাব ভক্তি টুকু আবার নিরাপদের অবস্থায় ঠিক থাকে না। বিপদের সময় এক প্রকার মানত রাখে, কার্য্য সিদ্ধি হইলে পূজা দিবার সময় তাহার ভিতর হইতে যতটা পারে বাদ দেয়। সময়ে সময়ে খুব ঘটা করিয়া, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া, গরদ তসর পরিয়া লোকে আমার পূজা দেয়, প্রচুর দান বিতরণ করে, তাহার অর্থ কি ? মোকদ্দমায় জিতিয়া যথেষ্ট বিষয় পাইয়াছে, না হয় শত্রু নির্জ্জিত হইয়াছে, অথবা অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। ঈদৃশ অবস্থায় কৃতজ্ঞতা ভক্তিতে হৃদয় উথলিয়া পড়ে। কিন্তু যাই তাহারা কোন আশায় নিরাশ হয়, অমনি মুখ বিষণ্ণ, চিত্ত বিরক্ত, হৃদয় শুষ্ক ; তখন আমার প্রতি অভিসম্পাত করিতেও ছাড়ে না।

জীব। ঠিক কথা বলেছ ঠাকুর ; এইরূপ সচরাচর হয় বটে। কিন্তু মানুষ বড় সুখপ্রিয়, কি করে বল। সুখ সম্পদ, সুবিধা অনুকূল অবস্থাটাই তাহার চির প্রার্থনীয়। তদবস্থায় তাহার ধর্ম্ম ভাবও একটু বেশ স্ফূর্ত্তি পায়, বিপরীত ঘটিলে চক্ষে আঁধার দেখে, ইষ্ট দেবতার নাম ভুলে যায়। অথচ এই সুখপ্রিয়তাই আবার সমস্ত ব্যবধানের কারণ। তোমার দয়া স্নেহের এবং শিক্ষা শাসনের নিদর্শন স্বরূপ যে সকল পদার্থ বা ঘটনারাজী দৈনিক জীবনে উপস্থিত হয় তাহার ভিতরে তোমার মাতৃস্নেহ এবং ন্যায় শাসন উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান থাকে, কিন্তু সে দিকে প্রায় লোকের দৃষ্টি পড়ে না ; ভোগ্য বস্তুর রূপ রস গন্ধে মন মাতিয়া উঠে, আর অমনি তোমার মুখ ঢাকা পড়িয়া যায়।

ভগবান। সেই জন্যইত আমি বলিলাম, মানুষ সুখেতেও মরে, দুঃখেতেও মরে ; সুতরাং মুক্তি ও শান্তির এ পথই নয়। পৃথিবীতে পার্থিব বিষয়ে সে কোন কালে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, পারিবেও না। পুরুষকার, সর্ব্বসহিষ্ণুতা, ত্যাগসামর্থ্য, তিতিক্ষা যাহাতে জন্মে, পার্থিব অবস্থা অতিক্রম করিয়া যদ্দ্বারা দ্বিজাত্মা হওয়া যায়, তজ্জন্য আমি সুখের সহিত দুঃখ মিশাইয়া রাখিয়াছি। সুখ কি, দুঃখই বা কি তাহা তোমরা জান না। শরীরের সুখ দুঃখ আত্মার সুখ দুঃখ নহে। প্রকৃত সুখ স্বয়ং আমি।

জীব। যদিও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন, কার্য্যফল সম্পূর্ণ তোমার

ইচ্ছার অধীন, তথাপি তাঁহাদের ইচ্ছার গতি প্রত্যাশিত শুভজনক ফলের দিকে কি থাকে না? তাঁহাদের অন্তরের বিশ্বাস যে সেই বাঞ্ছিত ফল ইহপর-কালের কল্যাণ সাধন করিবে।

ভগবান। প্রকৃত বিশ্বাসী ধার্ম্মিক যিনি আমাতেই তিনি সন্তোষ প্রাপ্ত হন। তিনি জানেন, পার্থিব সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখ বিপদ স্বর্গ প্রাপ্তির প্রধান সহায়। তাই বলেন, "দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়। চাহি না সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময়।"

জীব। গান করা সহজ, আমিও অনেক সময় নিরাপদে বসিয়া এ রূপ গান গাহিয়া থাকি। কারণ, বৈরাগ্যের এক প্রকার রমণীয় কবিত্ব মাধুরী এবং বিষাদসৌন্দর্য্য আছে। সৌভাগ্যের সীমায় পৌঁছিলে তাহা ভালও লাগে। কিন্তু যখন কোন দুঃখজনক ঘটনা উপস্থিত হয় তখন মন তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠে।

ভগবান। আমি যে কেবল সর্ব্বদা লোকদিগকে দুঃখ কষ্টই দিই, বাস্ত-বিক তাহা নহে। জগতের চারিদিকে সুখ সৌভাগ্যের প্রভূত নিদর্শন দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু আমার যে বিশ্বাসী সাধক আমা ব্যতীত তাহার অন্য প্রার্থনীয় কিছু নাই। আমিই তাহার সর্ব্বস্ব। ইহা সে প্রতি ঘটনায়, বিশেষ-রূপে বিপদ পরীক্ষার সময় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আশার সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ যাহা ঘটিবে তাহাতেই তাহার কিছু না কিছু স্বর্গীয় সম্পদ লাভ হইবে। সংসারী বদ্ধ জীব যদি কোন দিন পীড়া কিম্বা দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ কোন ভোগ্য বস্তু হইতে অথবা তাহার আস্বাদনসুখে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, "হায়! আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গেল; পান ভোজন নিদ্রা দর্শন শ্রবণ ভ্রমণ কিছুতেই আর আমার সুখ নাই, সব বিষয়ে অরুচি। হায় তবে আর জীবন ধারণে কি ফল!" এই বলিয়া বৈরাগ্যের মহা শ্মশানে বসিয়া সে আর্ত্তনাদ করে। সুখ সৌভাগ্যের পরিমাণ অনুসারে যাহা-দের ধর্ম্ম কর্ম্ম, বিশ্বাস ভক্তি কৃতজ্ঞতা, তাহারা আমাকে চেনে না, জানে না, সুতরাং চায়ও না; সুখ সম্পদই তাহারা চায়, এবং তাহারই অনুরোধে সময়ে সময়ে আমাকে কেবল একটু শ্রদ্ধা ভালবাসা দেখায়। কিন্তু তুমি

নিশ্চয় জানিও, যেখানে লোভ, সেই খানেই ক্ষোভ ; যেখানে আশা সেই খানেই নিরাশা। এইজন্য প্রকৃত ভক্তেরা বলেন, "পার্থিব সুখাসক্তির বিষয় এক একটী করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ভালই হইতেছে, এখন আমি নিঃসঙ্গভাবে সুখস্বরূপকে পাইয়া নিত্যশান্তি নিত্যানন্দ ভোগ করিব।"

জীবের সমগ্র হৃদয় ইহাতে সায় দিয়া বলিল, "ঠাকুর, তুমি যাহা যাহা বলিলে এ সমস্তই আমার জীবনে ঘটিয়াছে এবং আমি ইহার সত্যতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এক্ষণে আমাকে এমন দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দাও যাহাতে আমাকে আর কর্ম্মবিপাকে মোহবিকারে পড়িতে না হয়। পৃথিবীর বিঘ্ন এবং প্রলোভনের মধ্যে জরা ব্যাধি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাহাতে আমি নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার থাকিতে পারি তুমি এমন সুশিক্ষা আমাকে প্রদান কর।"

কর্ম্মযোগ—দ্বাবিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

অতঃপর স্বামী সদানন্দ কর্ম্মযোগ বিষয়ক তত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া পরিশেষে ভগবান যে ভাবে উহার উপসংহার করেন সংক্ষেপে তিনি তাহা পুত্রকে এইরূপে বুঝাইয়া দিলেন। অন্তরাত্মা সদ্‌গুরু জীবকে বলিলেন, "তুমি এক্ষণে কর্ম্মযোগের গভীর বিজ্ঞানরহস্য নিঃসংশয়রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। ইহা সহজজ্ঞান ও বিজ্ঞানসিদ্ধ নৈসর্গিক সাধন। মানবের জীবনক্রিয়ার আদি অন্ত মধ্যে আমার জ্ঞান, শক্তি, ক্রিয়া তিন এক সঙ্গে থাকে।

আমি যে কর্ম্মযোগের কথা বলিলাম, ইহার তাৎপর্য্য অতি উদার এবং প্রশস্ত। ধর্ম্মার্থ যে সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান,—সংযম নিয়ম ব্রত জপ তপ ধ্যান আরাধনা উপাসনা প্রার্থনা নামকীর্ত্তন শাস্ত্রাধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ যাগ যজ্ঞ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া এ সকলই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক সাধন। ইহা ব্যতীত সাধারণ কর্ম্ম যথা, দেহরক্ষার্থ স্নান ভোজন নিদ্রা ব্যায়াম, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশজন্য অধ্যয়ন অধ্যাপন,—বিচার চিন্তা দর্শন, ভ্রমণ ; পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় পরিবারবর্গের সেবা ও প্রতিপালনার্থ রাজকার্য্য বাণিজ্য ব্যবসায় ; হৃদয় বৃত্তির উন্মেষজন্য পরসেবা জীবের

উপকার ইত্যাদি বহিরঙ্গ ক্রিয়াও আছে। যাবতীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান এই কর্ম্মযোগের অন্তর্ভূত। মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মের সহিত আমার সাক্ষাৎ নিকট যোগ আছে, সুতরাং কর্ম্মযোগ বলিলে কেবল যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্র বুঝায় না। বালক বালিকাগণ জ্ঞানোন্নতি সহকারে সুবিজ্ঞ পিতা মাতা এবং কুলগুরু ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশানুসারে শরীর পালন ক্রীড়া ব্যায়াম, বিদ্যোপার্জ্জন এবং নীতি শিক্ষা করিবে। এইরূপ শিক্ষা লাভের পরে যখন তাহারা যৌবনে উপনীত হইবে তখন যথারীতি ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিবে। তদনন্তর বিবাহিত হইয়া নরনারী আপনাপন নির্দ্দিষ্ট পথে বৈষয়িক ও পারমার্থিক জীবনব্রত সাধন করিতে থাকিবে। পরিশেষে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে বহিরঙ্গের বিষয় কার্য্য সংক্রান্ত দৈহিক পরিশ্রমের অংশ কমাইয়া স্বভাবের ইঙ্গিতানুসারে সময়োপযোগী আধ্যাত্মিক যোগ ভক্তি তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবে। শেষাবস্থায় ভক্তসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন এবং নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা জপ ইত্যাদি প্রশস্ত কর্ম্ম।”

“চিত্তশুদ্ধি ও দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য যেমন এক দিকে বিষয়ক্ষেত্রে পরিবারে এবং সমাজে অর্থ বিত্ত পদার্থ এবং ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নির্দ্দোষ পবিত্র থাকিবে, তেমনি প্রাত্যহিক এবং নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে বিশুদ্ধ প্রণালীর অনুসরণ করিবে। সূর্য্যের নিকট পূজা প্রার্থনা করিও না; যদিও সে প্রকাশগুণবিশিষ্ট তেজোময় পদার্থ এবং তোমাদের দৈহিক জীবনীশক্তিপোষক প্রধান সহায়, তথাপি অচেতন জড় বস্তু; অতএব তাহার আদি শক্তি এবং তেজ যে আমি, কেবল আমাকেই পূজা করিবে। অগ্নিকেও উপাসনা করিও না। তাহাও জ্ঞানহীন জড়ীয় শক্তি। ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষে যে কিছু জড় জীব উদ্ভিদ, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, নদী সমুদ্র পর্ব্বতমালা কিম্বা দারু মৃত্তিকা প্রস্তরনির্ম্মিত অচেতন মূর্ত্তি, চিত্র পট ছবি, ভূত প্রেত রাক্ষস হনুমান দানব অসুর দেখিতে পাও ইহারা কেহই উপাস্য নহে। তুমি অমর জীবাত্মা, এ সকল জড় বা ইতর প্রাণী অপেক্ষা তুমি বহু গুণে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং উহাদের দ্বারা তোমার আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধনের সম্ভাবনা নাই। জড় এবং জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যতই কেন প্রভাবশালী এবং উপকারী হউক না, তাহারা জ্ঞান প্রেম পবিত্রতাবিহীন অচেতন। তীর্থ স্থান, দেবমন্দির, নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত

প্রস্রবণ, ইহাদেরও পবিত্রকারিণী কোন শক্তি নাই। যাগ যজ্ঞের হোমাগ্নি রাশি রাশি কাষ্ঠ তৃণ ঘৃত মধু ভস্মীভূত করিতে পারে, কিন্তু কেশাগ্রভাগ সমান তোমার এক কণিকা পাপকে দগ্ধ করিতে পারে না। তীর্থবাস উপবাস পথশ্রমে তোমার শরীর শুকাইয়া যাইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা তোমার পাপ বাসনার মূল উৎপাটিত হইবে না। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া তুমি আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিতে পার, কিন্তু তাহাতে তোমার ষড়রিপুর বলক্ষয় হইবে না। ভূরি দক্ষিণা দিয়া, বহুলোককে ভোজন করাইয়া, বলিদানের রক্তে মেদিনীকে ভাসাইয়া, তুমি একটী পাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না ; বরং রাজসিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে তোমার অহঙ্কার ধর্ম্মাভিমানকে আরো স্ফীত করিয়া তুলিবে। পাপত্যাগ এবং মুক্তিলাভের উপায় প্রতি-জনের স্বাভাবিক দৈনিক জীবনের কর্ত্তব্য মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। প্রলোভন পরীক্ষা বিপদে যখন রিপুবিশেষ প্রকুপিত, ধর্ম্মানুরাগ শিথিল এবং বিশ্বাসের তেজ প্রশমিত হয়, তখন পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত সহস্র যাগ-যজ্ঞের ফল কি তোমায় পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? যখন যে অবস্থা ঘটিবে, তাহার সাধন সঙ্গে সঙ্গে সেই খানে, অন্য অবস্থায় নহে। চিত্তের নৈর্ম্মল্য উপার্জ্জনই যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডের শেষফল। ধর্ম্ম সাধন যদি পাপজয়, চিত্তশুদ্ধি, যোগ বৈরাগ্য প্রেম পুণ্য উপার্জ্জন এবং দ্বিজত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে এই প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন করিও। (১) প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর আমাকে প্রথমে আত্মস্থ অনুভব, স্মরণ ও ভক্তিপূর্ব্বক নামগান এবং প্রণিপাত। (২) হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে অভ্যাস ও অবস্থানু-যায়ী কিঞ্চিৎ পান ভোজন এবং উপস্থিত কর্ত্তব্য সাধন। (৩) নির্ম্মল শীতল জলে স্নানাবগাহন এবং সলিলের শুদ্ধি ও স্নিগ্ধতার মধ্যে আমার সর্ব্ব-ব্যাপী অধিষ্ঠানের অনুভূতি। (৪) প্রেমভক্তি উপহারে আত্মাতে আমার দৈনিক পূজা অর্চ্চনা এবং উজ্জ্বল আবির্ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি; তৎসঙ্গে দয়াব্রত সাধন। (৫) ভোজনকালীন আমি যে বিধাতা অন্নদাতা, মাতৃরূপে নিকটে বর্ত্তমান, এই ভাবে আমাকে অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা ভক্তি দান। (৬) কার্য্যক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে আমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা। (৭) কার্য্যকোলাহল এবং ব্যস্ততার মধ্যে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা প্রলোভনের

সময় আমার নাম গ্রহণ ও স্মরণ, এবং আমি যে পরম প্রভু এবং সর্ব্বময়কর্ত্তা, ন্যায়বান বিচারপতি, বিশ্বাসনেত্রে তাহা পুনঃ পুনঃ দর্শন। (৮) কার্য্যাবসানে প্রসন্ন চিত্তে আমার নাম গাইতে গাইতে, পথে আমাকে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন। (৯) সায়ংকালীন নির্জ্জন ধ্যান চিন্তা নাম গান, এবং পরিবার এবং বন্ধুসমাজে সদালোচনা প্রার্থনা সঙ্কীর্ত্তন। (১০) শয়নের কালে ভক্তিপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন এবং আমার কোলে যোগ-নিদ্রা সম্ভোগ। ধর্ম্মকর্ম্মের এই দশ বিধি।

সাধারণ গৃহীদিগের জন্য ইহা ব্যতীত বিষয় কার্য্যের বিশেষত্ব অনুসারে বিশেষ বিধি অবলম্বিত হইবে, কিন্তু সময় এবং স্থান সম্বন্ধে কেবল তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম হইতে পারে, অন্য কোন বিষয়ে নহে। যোগের ভাব রক্ষার জন্য সর্ব্বক্ষণ আমাকে স্মরণে রাখিয়া সতর্ক থাকিতে হইবে। এই স্মরণ কর্ম্মযোগের প্রধান অঙ্গ এবং অবলম্বন।

আমি কত স্থানে কত রূপে কর্ম্ম করি, এসিয়া আফ্রিকা ইয়োরোপ আমেরিকা চীন জাপানের লোকদিগের জীবনে তাহা বিশেষরূপে দেখিতে পাইবে। কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রাণ এবং প্রমাণ। কেহ শারীরিক বল সামর্থ্য, কেহ মানসিক বুদ্ধিশক্তি, কেহ নৈতিক বিশুদ্ধতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কেহ দান বিতরণ পরসেবা, কেহ বা আধ্যাত্মিক ধ্যান জ্ঞান বিশ্বাস ভক্তিযোগে বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করে; কিন্তু সকল কার্য্যের একই উদ্দেশ্য,—আমার ইচ্ছা পালন। কে কি কার্য্য, কত পরিমাণে, কি প্রণালীতে করিবেন তাহার বিচার নিষ্পত্তি স্বীয় স্বীয় বিবেকের নিকট। একটী জীবনের সমস্ত কার্য্যের কোন একটী বাঁধা তালিকা নাই। আমি সদ্‌গুরু সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে জীবের সঙ্গে থাকি, বার বার আমার নিকট জিজ্ঞাসু হইবে। যখন যাহা প্রয়োজন ঠিক সময়ে তাহা বলিয়া দিব। এই মাত্র কেবল মনে রাখিও, আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু করিবে তাহাতেই অপরাধী হইতে হইবে। তুমি পরিবারবেষ্টিত গৃহস্বামী হও, কিম্বা নিঃসঙ্গভাবে একাকীই থাক, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বজীবে কেবল আমার আবির্ভাব দেখিয়া আমার সেবা করিবে।

এই যে কর্ম্মযোগের কথা বলিলাম, ইহা এক মহাসংগ্রাম। দেহের ক্ষুধা নিদ্রা এবং ইন্দ্রিয়সুখলালসা, মনের প্রবৃত্তি, ভ্রান্তি সংশয়, নিরাশ অভক্তি

অল্পবিশ্বাস, হৃদয়ের প্রমত্ত স্নেহ মায়া বাসনা, পরিশেষে জরা ব্যাধি মৃত্যু এই সকলের বিরুদ্ধে চিরদিন তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। সমরনিপুণ সৈনিক বীরেরা কদাপি অলস নিরুদ্যম সাহসবিহীন হয় না, সামরিক মত্ততাই তাহাদের জীবন এবং সেই মত্ততাতেই তাহারা সুখী। তদ্রূপ প্রত্যেক প্রিয়পাপ, কুঅভ্যাস, দুর্ব্বাসনাকে পরাজয় করিবার জন্য তোমাকে নিয়ত রণরঙ্গে মাতিয়া থাকিতে হইবে। নিদ্রা আলস্য শান্তি বিশ্রামের প্রতি যেন কখন তোমার আসক্তি না হয়। আমি সেনাপতি হইয়া তোমাকে সর্ব্বদা যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়াছি, পরাজয়ে আশা এবং জয়ে উৎসাহ দিতেছি, তদনন্তর পরিণামে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবে। আমার আবির্ভাব তোমার অঙ্গের বর্ম্ম স্বরূপ। আশা, সহিষ্ণুতা, শান্তি যুদ্ধাস্ত্র। পরিশেষে দেহ ত্যাগে অর্থাৎ আত্মবলিদানে জয়লাভ। কিন্তু হে অমর জীব, তুমি এই জীবনসংগ্রামে কদাপি পশুবল, কুবুদ্ধির সহায়তা লইও না। পৃথিবীর শাসনবিধির অনুযায়ী চরম বিচার মুণ্ডচ্ছেদন; কিন্তু আমার আদেশ প্রাণদান করিয়া জয়ী হইবে। ঈশা শাক্য শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে মানব হৃদয় চিরকালের জন্য জয় করিয়া গিয়াছেন। এ সংগ্রামের চরম-উদ্দেশ্য আমার সত্য প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এ স্থলে কেবল দৈববল একমাত্র সম্বল। আমার শক্তিতে জ্ঞানেতে আমার জয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। পরিণামে তোমার এই পাঞ্চভৌতিক তনু রণভূমির ধূলিকণার সহিত যখন মিশিয়া যাইবে, তখন তোমার অমরাত্মা জয়যুক্ত হইয়া ইহলোকে সদৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্ব্বক অমরলোকে দেবত্ব লাভ করিবে। সংক্ষেপে এই কয়টী কথা স্মরণে রাখিয়া যাবজ্জীবন কর্ম্মযোগ সাধন করিতে থাক;—

সুখপ্রিয় ভোগবিলাসী হইবে না। পার্থিব কোন অভাব বৃদ্ধি হইতে দিবে না, বরং তাহা যত কমাইতে পার ততই ভাল; কেন না, তাহাতে তুমি স্বাধীন ভাবে স্ববশে থাকিতে পারিবে। পৃথিবীতে যে বিভাগে যে কার্য্য যে করুক, তাহারই ভিতরে সে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে পারে। ন্যায় সত্য দয়ার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে সকল কার্য্যই তপস্যারূপে প্রতীয়মান হয়। কোন কোন ব্যবসায় বিশেষে স্বার্থ রক্ষা না হইতে পারে; কিন্তু সত্য রক্ষা কেন হইবে না? কেহ যদি সর্ব্বাগ্রে স্বার্থে অন্ধ হয়, তাহা হইলে সে সত্য রক্ষা কিরূপে করিবে? কোন বস্তু বা কার্য্যের কোন দোষ নাই, অন্তরের

নীচ বাসনা, স্বার্থকামনাই সমস্ত অধর্ম্মের মূল। কার্য্য করিয়া ধর্ম্মেতে উন্নত, ভক্তিতে বিগলিত হইব, চরিত্র বিশুদ্ধ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প চাই। অতি সামান্য বিষয় কার্য্যেতে স্বর্গলাভ হয়, আবার ধর্ম্মকার্য্য করিতে গিয়া লোকে নরকে ডুবিয়া মরে। যাহার অভিপ্রায় মন্দ সে যে কোন কার্য্য করুক না কেন, সব কাজই তাহার অধঃপতনের কারণ। অগ্রে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যদি মনে মনে এই সঙ্কল্প কর যে, "এই কার্য্য যেমন করিয়াই হউক, আমাকে করিতেই হইবে।" তাহা হইলে তাহার সঙ্কল্প এবং সিদ্ধি উভয়ই অধর্ম্ম।

নিত্য পূজা আরাধনায় তোমার কর্ম্মযোগের পরীক্ষা হইবে এবং দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে ধর্ম্মজীবনের পরিচয় পাইবে। প্রতিদিন যে যে কার্য্য করিবে তাহা দ্বারা যদি আমার প্রতি ভক্তি অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয়, তবে জানিবে তোমার কর্ম্ম সকল কর্ম্মযোগের অনুরূপ। কিন্তু যদি তাহাতে শ্রান্তি অবসাদ নিরাশ বিরক্তি, লালসা আসক্তি এবং বিকার জন্মে তাহা হইলে পরিশেষে আমার সঙ্গে তোমার দেখা করিতেই ইচ্ছা হইবে না। অবশ্য ইহা তুমি নিজ জীবনের পরীক্ষাতেই বুঝিতে পারিয়াছ। ব্রহ্মযোগ, হরিভক্তি, কর্ম্মযোগের চরম ফল, আবার প্রাত্যহিক সরস সুমিষ্ট পূজা প্রার্থনা সেবা সাধনের ফল; উভয় উভয়কে পরিপোষণ করিবে, এক অপরের কখনই প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না; কর্ম্মযোগের ইহাই লক্ষণ। এইরূপে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে করিতে শেষ তুমি ধর্ম্ম হইয়া যাইবে। ব্রহ্মারাধনাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ এবং তাঁহার শেষ ফল স্বরূপত্ব প্রাপ্তি। তখন দেখিবে, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাহা নির্ব্বাহের সুবুদ্ধি এবং বলশক্তিও আমি। তুমি কেবল আমার হস্তে যন্ত্র সদৃশ। অবশ্য জড়যন্ত্র নহ, সজ্ঞান সচেতন যন্ত্র। এক অর্থে তুমি আমার সহকারী সহযোগী এবং প্রতিনিধি। এই ভাবে কর্ম্মযোগ সাধনপূর্ব্বক তুমি আমার পুত্র কন্যাদিগের নিকট তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হও।"

[কর্ম্মযোগ সমাপ্ত।]

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:০—:০—

জ্ঞানযোগ—১ম অধ্যায়।

—০—০—

জীবনোৎপত্তি বিবরণ।

চিদানন্দ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অগ্রে যদি কর্ম্ম, তার পর জ্ঞান, তাহা হইলে মানবাত্মা কি জড়ের ন্যায় অন্ধভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে? কার্য্যনির্ব্বাচনের পূর্ব্বেইত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি। ভগবান্ শ্রীজীবকে জ্ঞানযোগ তত্ত্ব কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা শুনিবার জন্য আমার চিত্ত নিতান্ত পিপাসু হইয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহা এক্ষণে বলিতে আজ্ঞা হউক।"

স্বামী সদানন্দ ক্ষণকাল নিষ্পন্দভাবে ধ্যানস্থ থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"জ্ঞান ত্রিবিধ। (১) স্বতঃসিদ্ধ, (২) প্রমাণসিদ্ধ, (৩) অনুমানসিদ্ধ। তাহা ত্রিবিধ উপায়ে সমাগত হয়। (১) বহির্জ্জগৎ, (২) মানবমণ্ডলীর আদ্যোপান্ত ইতিহাস, (৩) নিজের আত্মজ্ঞান। কার্য্য আর জ্ঞান যুগপৎ আরম্ভ হয়, কার্য্যই নিদ্রিত জ্ঞানবীজকে প্রস্ফুটিত করে। এ বিষয়ে ভগবান্ সবিস্তারে জীবকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

জীব কহিলেন, "হে অন্তর্য্যামী পুরুষ, মহাত্মারা শুনিয়াছি প্রথমে দিব্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার আদেশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা সেরূপ জ্ঞান কি সাধারণ জীবমাত্রে প্রাপ্ত হইতে পারে?

আচার্য্য। প্রতিজনের বিশেষ নিয়তির অন্তর্ভূত কর্ত্তব্যের দায়িত্ব অনুসারে জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য এবং তারতম্য হয়। জনসাধারণ প্রথমে

প্রাকৃতিক ঘটনা ও সামাজিক অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া সহজে সহজজ্ঞান শিক্ষা পায়। অনন্তর আমার প্রেরিত শিক্ষাগুরুর উপদেশে বাহ্যকার্য্য অবলম্বনে তাহারা পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে; তাহা হইতে ক্রমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবেকের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানালোকে আমার আদিষ্ট কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। মহাত্মাদিগের শিক্ষার প্রণালী স্বতন্ত্র; তাঁহারা প্রথম হইতেই প্রতিভাবলে আমার ইঙ্গিতক্রমে জীবনের বিশেষ কার্য্যভার বুঝিতে পারিয়া তাহা নিঃসংশয় চিত্তে বহন করেন। কর্ম্মযোগ এক দিকে সাধন, অপর দিকে সিদ্ধি। ইহাতে সাধন আরম্ভ করিয়া লোকে ইহাতেই সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। জন্মযোগী কৃপাসিদ্ধ মহাজনেরা জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি ত্রিবিধ যোগে সদাকাল জীবিত থাকেন।

জীব। আচ্ছা, এই যে জীবন, ইহার অর্থ কি? মৃত জড় ভূতের সংযোগ হইতে জীবন, না জীবন বলিয়া স্বতন্ত্র কোন শক্তি আছে, তাহা হইতে জীবন? আমি জীব, কিরূপে আমার উৎপত্তি হইল? প্রাণ কি প্রাণহীন জড়ের যোগাযোগ ফল? কিম্বা জড় ও প্রাণ দুই অবিভাজ্য অচ্ছেদ্য, দৃশ্যাদৃশ্যে বিমিশ্র? অথবা উভয়ের অতীত কোন এক অলৌকিক স্বাধীন শক্তি?

ব্রহ্ম। তোমাদের তত্ত্বদর্শী বিখ্যাত বিজ্ঞানিগণ এ পর্য্যন্ত ইহার কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

জীব। পণ্ডিত বেষ্টিয়ান্ কাচের সিসির ভিতর কিছু মৃত উদ্ভিদ্ চূর্ণ রাখিয়া, পরে তাহা উষ্ণ জলে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া এরূপ ভাবে তাহার মুখে সিপি আঁটিয়া দেন যে তন্মধ্যে বাহিরের বাতাস কিছু মাত্র প্রবেশ করিতে না পারে। ক্ষণকাল পরে সিসির গলদেশের শূন্য স্থানে দেখিলেন, যে তন্মধ্যে অগণ্য কীটাণু জন্মিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জীবন হইতে যদি জীব জন্মিত, তাহা হইলে এ স্থলে অগ্নির উত্তাপে জীবন রক্ষার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তবে অসংখ্য জীবাণু কোথা হইতে আসিল? অতএব জীবন আপনিই উৎপন্ন হয়, তাহার পূর্ব্বে জীবপ্রসবিনী স্বতন্ত্র শক্তি আর কিছু নাই। তদনন্তর পণ্ডিত টিণ্ডাল এই বিষয়টী আরো সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সিসির

অন্তর্গত পদার্থ এবং শূন্য স্থানে যাহাতে জীবাণু একবারে দগ্ধ হইয়া যায় তাহার জন্য যত দূর সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহা করিয়া শেষ তিনি বলিয়াছেন, "জীবাণু কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। বহুল চেষ্টার পরেও দেখা গিয়াছে, সিসির অন্তরস্থ আকাশে জীবাণু অবিনশ্বর থাকে।" পরিশেষে যে স্থানে প্রাণীমাত্রে কিছুতেই থাকিতে পারে না, এমন জীবশূন্য স্থানে তিনি এ বিষয় চূড়ান্তরূপে পরীক্ষা করিয়া শেষ বলিয়াছেন, "প্রাণীশূন্য বাতাসের মধ্যে কোন মৃত জড় পদার্থ হইতে জীব জন্মিতে পারে না, মৃত জড় হইতে জীবোৎপত্তি অসম্ভব।" পণ্ডিত ডালিঞ্জার বলেন, "নীচ শ্রেণীর প্রাণী অবিনশ্বর। ডাক্তার বেষ্টিয়ান্ যেরূপ উত্তাপে প্রাণিনাশ পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তাপের মধ্যেও অনেকানেক প্রাণী বাঁচিয়া থাকে। এমন কি, কোন কোন জীবাণু অগ্নিতে আদৌ দগ্ধ হয় না।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবশেষে বিজ্ঞবর জ্ঞানী হাক্সিলী এবং টিণ্ডেল দুই জনেই বলিয়াছেন, জীবন বিনা জীব কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু হাক্সিলি মৃত জড় পরমাণুর গতিশক্তির ক্রিয়ার সহিত জীবন্ত প্রোটোপ্ল্যাজম বা জীবাণুর অদ্ভুত গতিশক্তি, তাহার অপ্রতিহত উন্নতি ও বিস্তার দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন, "প্রাণের স্বভাব প্রকৃতি জানা যায় না, তাহা জড়াতীত; এ বিষয়ে বিনম্র ভাবে আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করাই ভাল।" প্রোটোপ্ল্যাজম নামক আদিম জীবনী শক্তি অক্সিজন্, কার্ব্বন্ প্রভৃতি মৃত উপাদান চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে কিরূপে প্রাণবিশিষ্ট হইল, পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিয়া তিনি মহাবিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। প্রোটোপ্ল্যাজমের মূল উপাদান গুলিকে স্বতন্ত্র করিলে তাহা মৃত, যোগ করিলে জীবন্ত, ইহা জ্ঞানীজগতের নিকট এখনো পর্য্যন্ত একটী বিষম সমস্যা। প্রস্তরাদি খণিজ পদার্থে জীবনীশক্তির লেশ মাত্র নাই, কিন্তু উদ্ভিজ তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহাকে আপনার অঙ্গীভূত করিতে পারে। হে অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ, তুমিও যেমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য, প্রাণও তাই। অথবা তুমি নিজেই প্রাণ।

ব্রহ্ম। তার পর জীবনোৎপত্তির প্রক্রিয়া এবং জীবদেহ গঠন সম্বন্ধে তাঁহারা কে কত দূর অবগত হইয়াছেন?

জীব। মহাবুদ্ধি হাক্সিলী প্রাণী উৎপাদনের বিজ্ঞানাতীত অদ্ভুত প্রক্রিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। সাধারণ জীবোৎপাদক প্রোটোপ্লাজমের গতিক্রিয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করত তিনি বলেন, "এই সামান্য তরল ডিম্বাকৃতি পদার্থের ভিতর অত্যাশ্চর্য্য ভাবীজীবনক্রিয়া নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে। একটু সামান্য উত্তাপ উহার জলীয় অংশের সহিত সংযুক্ত হইলে আটার মত যে অংশ তাহা এমন একটী অভিপ্রায়ের সহিত দ্রুত এবং অপ্রতিহত গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে যে, এক জন সুনিপুণ কুম্ভকার একতাল মৃত্তিকা লইয়া যেমন গঠনকার্য্য সম্পাদন করে ঠিক তাহার সহিত কেবল ইহার উপমা করা যায়। যেন এক খানি অদৃশ্য কর্ণিক দ্বারা প্রথমে উহা স্থূল এবং অতি সূক্ষ্মাংশে বিভাযিত হয়। শেষে উহা এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে যে তাহার সংহতিতে দৈহিক কোন একটী যন্ত্রের অতি সূক্ষ্মতম অংশও গঠিত হইতে পারে না। তদনন্তর জ্ঞান হয়, যেন কে সুকোমল সূক্ষ্মাঙ্গুলী দ্বারা তাহা ভাগ ভাগ করিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার কতকাংশ মেরু দণ্ডে পরিণত হইল। পরে টিপিয়া টিপিয়া কে যেন একদিকে একটী মস্তক আর এক দিকে এক লাঙ্গুল গঠন করিল! এইরূপে এক জন কে যেন জীবদেহের অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যথা পরিমাণে এমনি নৈপুণ্যের সহিত গঠন করিতে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহা দেখিতে দেখিতে দর্শকের মনে আপনা হইতে এই সংস্কার জন্মে যে কাচের অণুবীক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মদৃষ্টি-শালী কোন যন্ত্র থাকিলে তদ্দ্বারা—ঈদৃশ নিপুণতার সহিত যে কারীগর আপনার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গীনরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে—কাজের নক্সা শুদ্ধ সেই গুপ্ত কারীগরকে দেখিতে পাওয়া যাইত! বস্তুতঃ প্রভু, এ বড় রহস্য কথা। যদি প্রোটোপ্লাজম জীবনাধার হয়, তবে পশু এবং মানবদেহের যথাস্থানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে কে গঠন করে? তাহার কি বুদ্ধি বিবেচনা-শক্তি আছে?

ব্রহ্ম। এক জন কারীগর যেমন একই মৃত্তিকা হইতে নানাবিধ জীবমূর্ত্তি, প্রতিমা, ঘট জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নির্ম্মাণ করে সেইরূপ কি?

জীব। না, কোন কারীগর কর্ত্তাব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না; তাই পণ্ডিতেরা বলেন, দৃশ্যতঃ একই প্রোটোপ্ল্যাজম দ্বারা বহুবিধ উদ্ভিদ্, ইতর প্রাণী এবং মনুষ্য উৎপন্ন হইতেছে এবং প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং জীবের এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছাঁচ (Type) তন্মধ্যে আছে। যাহার ভিতর যেরূপ ছাঁচ তাহার তদ্রূপ গঠন হয়। সে ছাঁচের সংখ্যা করা যায় না।

ব্রহ্ম। প্রোটোপ্ল্যাজম স্থূলতঃ দেখিতে এক বলিয়া তাহার ভিতর অদৃশ্যভাবে বিভিন্ন অভিপ্রায় ও কারণগুণ থাকা কি অসম্ভব? এবং উহার মূল উপাদান চারিটী কি একবারেই মৃত এবং উদ্দেশ্য অভিপ্রায়-শূন্য? আর সেই বিশেষ বিশেষ এক একটী ছাঁচই কি জীবনোৎপাদক এবং জীবদেহের নির্ম্মাতা?

জীব। তাহাত কৈ কিছু শুনি নাই। ঐ ছাঁচ অনুসারে দৃশ্যতঃ একবিধ প্রোটাপ্ল্যাজম হইতে বহু বহু প্রকারের উদ্ভিদ্, প্রাণী বা জীবদেহ গঠিত হয় এই পর্য্যন্তই তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছেন, এবং অধিকতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশীল অণুবীক্ষণ পাইলে তাহার সাহায্যে কারীগরের সহিত উক্ত ছাঁচের ক্রিয়াপ্রণালী পরিষ্কাররূপে জানা যাইতে পারিত, এইরূপ সিদ্ধান্তে পরিশেষে উপনীত হইয়াছেন; ইহার অতিরিক্ত কিছুই ভাবিতে পারেন নাই।

ব্রহ্ম। তবে তোমাদের পণ্ডিতদিগের মতে সেই বিভিন্ন প্রকার আদর্শ ছাঁচই জীবের জীবনদাতা,—সৃষ্টিকর্ত্তা! কি বিষম ভ্রান্তি! জীব গঠনের ছাঁচগুলি কিরূপে জীবস্রষ্টা হইল? মৃত্তিকা এবং কুলালচক্র কি ঘটাদির নির্ম্মাতা হইতে পারে? ছাঁচ সকল কেবল জীবদিগকে নির্দ্দিষ্ট এক একটী আকার দান করে; কিন্তু গঠনকার্য্যের বিচিত্রতা এবং তাহার শেষ উদ্দেশ্য যে জ্ঞান ও ইচ্ছাসাপেক্ষ তাহা কি স্পষ্ট প্রকাশিত নাই? তদ্ব্যতীত জীবন সঞ্চার আর জীবদেহের আকার সংগঠনকারী ছাঁচ এই দুইটী কি একই বিষয়?

জীব। না, তাহা কিরূপে হইতে পারে? অসম্ভব। আচ্ছা, হাক্সিলি যে বলিলেন, ইহা অপেক্ষা আরো প্রখর দৃষ্টিশীল কোন যন্ত্রের সাহায্য

প্রয়োজন, বাস্তবিক কি তাদৃশ যন্ত্র দ্বারা জীবস্রষ্টাকে সৃষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবার সম্ভাবনা ছিল?

ব্রহ্ম। যাহা অদৃশ্য নিরাকার শক্তি এবং অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ আমার লীলাভিপ্রায়, অণুবীক্ষণ সাহায্যে তাহার দর্শন কিরূপে সম্ভবে? বুদ্ধি যুক্তির আলোক, দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণের দৃষ্টি ঐ পর্য্যন্তই যায়, তাহার অতীত স্থানে অন্য দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন।

জীব। তাহা কি? এমন কি কোন দৃষ্টিশক্তি আছে যাহাতে তোমার সহিত তোমার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আদ্যোপান্ত গতি অবলোকন করা যাইতে পারে? ফলতঃ এই স্থানে আসিয়া জ্ঞানীরা একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। আর পথ দেখিতে পান নাই।

ব্রহ্ম। এই থান হইতে বিশ্বাসের রাজ্য আরম্ভ। বিশ্বাসের অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে লোকে প্রকৃতির অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে দেখিতে পায়। ইহা অন্ধ অযৌক্তিক কল্পনামূলক বিশ্বাস নহে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজজ্ঞানের বিশ্বাস।

জীব। বিশ্বাসদৃষ্টির দর্শনে কি জ্ঞানের সম্যক চরিতার্থতা জন্মে?

ব্রহ্ম। তাহাতে সন্দেহ কি। বিশ্বাসের দর্শন প্রত্যক্ষ, বুদ্ধিযুক্তির দর্শন অনুমেয়, পরোক্ষ। চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত যাহা কিছু প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান তাহাও মোহাবৃত অস্পষ্ট, সে জ্ঞানের ভিতরে অনেক ভ্রম দোষ থাকে। কিন্তু বিশ্বাস অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ। আমি বিচিত্র সুন্দর আদর্শ এবং অভ্রান্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা অনুসারে যাবতীয় সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন, পরিপোষণ, পরিবর্ত্তন, ও গঠন করি। ধ্বংসের ভিতরেও অখণ্ড নিয়ম বিধি প্রতিষ্ঠিত আছে। তোমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঐ আদর্শ এবং নিয়মাবলী পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য দৃষ্টির সাহায্যে, বুদ্ধি বিচার দ্বারা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারেন। কিন্তু আদর্শ সকল কেবল জীবদেহ গঠনের ছাঁচ (Type) মাত্র, গঠনকর্ত্তা নহে; আর নৈসর্গিক নিয়মাবলী সমস্ত কেবল কার্য্যসাধনের অপরিবর্ত্তনীয় ব্যাপক প্রণালী, তাহারা নিয়ন্তা বা স্রষ্টা নহে। অতএব তুমি বিশ্বাসচক্ষে দিব্যালোকে এইটী দেখ, যে আমি স্বয়ং আদর্শের অব্যবহিত অন্তরালে স্বয়ম্ভু ইচ্ছাময়

পুরুষরূপে রহিয়াছি, আমার অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তিতে প্রতিক্ষণে অনন্ত সৃষ্টিলীলা সম্পন্ন হইতেছে; এবং আমি সর্ব্বনিয়ন্তারূপে নিয়মরূপ রাসরজ্জু ধরিয়া তৎসমুদায়কে স্ব স্ব নিয়তির পথে নিরন্তর নিয়মিত করিতেছি। গঠনশক্তি, নিয়মশক্তি, জীবনীশক্তি আমার জ্ঞানময়ী ইচ্ছা-শক্তিতে সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত আছে।

ভগবদ্‌মুখবিনিঃসৃত জীবনবিজ্ঞান বিষয়ক এই সকল নিগূঢ় রহস্য কথা শুনিয়া জীব একবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। নিজজীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে বিধাতা যে ঈদৃশ নৈকট্যরূপে অবস্থিত, প্রাণে প্রাণে তিনি যে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত, ইতঃপূর্ব্বে ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে গুরুবাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন যেন অনন্তপ্রাণ ওতপ্রোত ভাবে তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, এবং উদ্ভিদ্, প্রাণী ও নরদেহের মূল উপাদান যে সর্ব্বগত প্রোটোপ্ল্যাজম তাহা অদৃশ্য ভগবদেচ্ছার দৃশ্যমান ছায়ার ন্যায় চর্ম্মচক্ষের উপর ভাসিতেছে। এই উল্লাসকর জ্ঞানানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মজাত দেহাতীত যে জীবাত্মা তাহার জন্ম কর্ম্ম নিয়তি এবং অমরত্বের উজ্জ্বল ছবি খানি তদীয় হৃদয়ফলকে অঙ্কিত হইয়া গেল। তখন তাঁহার দেহাত্মা উভয়ের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জ্বলন্ত ব্রহ্মজ্যোতি শতধা জ্বলিয়া উঠিল। তদবস্থায় তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে পরম পুরুষ জীবনস্বামী, জড় চৈতন্যে মিলিত এই অদ্ভুত বিশ্বের অন্তর বাহ্য যাবতীয় অংশে তোমার যে গভীর জ্ঞানকৌশল দেখিতে পাই তাহা নিতান্ত অনির্ব্বচনীয়। পদার্থ এবং প্রাণের যোগাযোগে যে অনন্ত ক্রিয়া, বিচিত্র ফলাফল সমুৎপন্ন হইতেছে ইহার একটীও তোমার অভিপ্রায় ছাড়া নহে। না জানি সৃষ্টি প্রসবের পূর্ব্বে তুমি এ জন্য কতই ভাবিয়াছ! কারণ, ইহার প্রত্যেকটিই নিগূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় এবং বিবিধ কৌশলে পূর্ণ। তোমার সৃষ্টি বিষয়ক সঙ্কল্প এবং তাহা প্রকাশের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটী আমি ভাবিতে পারি না। এক একটীর বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং একের সহিত অপরের যোগফলের বিস্তৃত ঘটনা চিত্রপটের ন্যায় অগ্রে তোমার জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তদনন্তর তাহারা নির্দ্দিষ্ট আকারে

প্রকাশ পাইয়াছে; ইহা কি আমি ধারণ করিতে পারি? অতি অদ্ভুত তোমার লীলা, হে আশ্চর্য্যকর্ম্মা, তোমাকে নমস্কার।”

জ্ঞানযোগ—২য় অধ্যায়।

—:০—:০—

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস।

মহাত্মা শ্রীজীব নিজজীবনে ভগবানকে জীবনরূপে দর্শন করিয়া বলিলেন, “দেব, এখন আমি বুঝিলাম, বিজ্ঞান বিচারের পত্তন ভূমি এবং শেষ সিদ্ধান্ত কেবল তোমার উপর সরল বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং বিজ্ঞান অপেক্ষা আমার বিশ্বাসই ভাল। কেন না, ইহাই জ্ঞানের চরম ফল। বিজ্ঞানের পথ অতিশয় কুটিল বক্র এবং সুদীর্ঘ, বিশ্বাসের পথ সহজ। জীবনোৎপত্তি, তাহার স্থিতি এবং উন্নতি সম্বন্ধে যাহা তুমি আমায় এখন বলিলে, তাহা আমার হৃদয় মনের সহিত মিলিয়া গেল। এখন তোমার নিজের তত্ত্ব আমায় কিছু বল, আমি শুনি; কারণ, তোমার গূঢ় মঙ্গল স্বভাবের যত পরিচয় পাওয়া যায় ততই ভাল। তৎসঙ্গে এই বিশ্বতত্ত্বের নিয়ম কৌশল সহজেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

ব্রহ্ম। আমার বিষয়ে তোমার কি কি জানিতে ইচ্ছা? কতই বা তাহা জানিতে পারিবে এবং জানিয়াই বা কি করিবে? বিশ্বাসালোকে আমার জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রত্যক্ষবৎ নিরীক্ষণ কর, তাহাতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে।

জীব। কেন, তুমি যে কত বার বলিয়াছ, “এখন বিশ্বাস করিয়া যাও, পরে আমি তোমার বিশ্বাসে জ্ঞান সংযোগ করিব।” আমিত সামান্য তর্ক বিচারের দ্বারা জ্ঞানী পণ্ডিত হইবার অভিলাষ রাখি না, বিশ্বাসের আলোকে দিব্যজ্ঞান কেবল আমার প্রার্থনীয়। তাহাতে বিশ্বাস গভীর, প্রশস্ত এবং আরো উজ্জ্বল হইবে। তাহা দ্বারা তোমার গুণের অধিকতর পরিচয় পাইব।

ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টিলীলার দিব্য কথা সকল শুনিতে আমার বড় ভাল লাগে। আমার জ্ঞানপিপাসাও তোমাকে চরিতার্থ করিয়া দিতে হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অনন্ত শূন্যে একা কি করিতে? তোমার 'বিশ্বপালক অনন্ত জীবন্ত ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান প্রেম মঙ্গল সঙ্কল্প তখন কি নিষ্ক্রিয় নিদ্রিত ছিল? কেহ কেহ বলেন, তুমি স্রষ্টা নহ, কেবল নির্ম্মাতা। তাহা হইলে সৃষ্টিমূল উপাদান গুলি কোথা হইতে আসিল? তাহারাও কি তবে নিত্য স্বয়ম্ভু? অথবা অবিদ্যার কুহেলিকা?

ব্রহ্ম। দেশকালাতীত আমার সৃষ্টিলীলার ভূগোল, ইতিহাস কি তুমি পড়িয়াছ? কোথায় কবে তাহার আরম্ভ এবং সীমাই বা কোথা? অনন্তের মহালীলা অন্তঃবিশিষ্ট মানবীয় বিচারের অধীন কিরূপে হইবে? কোথায় কবে সৃষ্টির আরম্ভ তুমি মনে কর?

জীব। কৈ, তাহারতো কোন ধারণা হয় না। বিজ্ঞানী পণ্ডিতদিগের মুখে কেবল শুনি, প্রথমে উত্তপ্ত তরল নিহারময় অনন্ত আকাশ ছিল, তাহা হইতে আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং উত্তেজনার গতিশক্তির উদয়, তদনন্তর Natural selection, Complexity, Modification, struggle for existence এবং survival of the fittest ইত্যাদি নৈসর্গিক নিয়মক্রমে এই সব হইয়াছে। এইটাই কি প্রথম সৃষ্টি, না একটী কল্পারম্ভ? প্রথম কল্প তবে কোন্‌টী তাহাও তো বুঝিতে পারি না। যাই হউক, সৃষ্টির আরম্ভ স্বীকার করিলে তাহার পূর্ব্বে অনন্ত ভূত কালে তুমি সৃষ্টিবিহীন নিষ্ক্রিয় ছিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু তোমার অনন্ত মহাশক্তিত এক নিমিষের জন্যও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে উপাদানের আবশ্যকতা। আবার তাহা উৎপাদনের জন্যও সর্ব্বাগ্রে সৃজনী ইচ্ছার প্রয়োজন। কাজেই সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন সময়ে তোমার সৃজনী ইচ্ছা সহসা জন্মিয়াছিল। তাহা হইলে আদিম সৃষ্টি আরম্ভের একটা সময়ও ধরিতে হয়। অথবা সৃষ্টি মানেই আরম্ভ। সুতরাং তৎ পূর্ব্বে তুমি সৃষ্টিবিহীন হইয়া অনন্ত কাল ছিলে। সৃষ্টির অপ্রকট কারণ কিংবা বীজাবস্থা (Potential Existence) স্বীকার করিলে কেবল এ প্রশ্নের কতকটা মীমাংসা হয়। কিন্তু সেই অপ্রকট কারণ বীজের ভূত কালের দিকটাও আবার অনন্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সে কারণবীজও

নিত্য স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ং তুমিই। তাই বুঝি প্রকৃতির মৌলিক উপাদান গুলি তোমার চিরসঙ্গী এবং মায়াপ্রসূত বলিয়া সাংখ্য ও বেদান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? কিন্তু অজ্ঞান মায়া বা প্রকৃতি কি আপনি আপনার স্রষ্টা হইতে পারে? সব দিকেই অকূল পাথার! মাথার মাথার ভিতরটা যেন কিরূপ গোলমাল বোধ হইতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ সংক্রান্ত কালের ব্যবধান ভাবিতে গিয়া আমি যেন অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছি!

ব্রহ্ম। দেশকালাতীত এ সব গুপ্ত রহস্য চিরদিন অব্যক্ত, তোমার জ্ঞানকৌতূহল এখানে চরিতার্থ হইবে না। অচিন্ত্য অভাবনীয় অনাদি তত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ করিলে অজ্ঞানতা ক্রমে বাড়িয়াই যাইবে, কখন কমিবে না। গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞানের আলোক নিদাঘের মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় এমন খরতর উজ্জ্বল যে তাহার পানে চাহিলে মানবের বিজ্ঞান দৃষ্টি একবারে ঝলসিয়া যায়। তখন সহজজ্ঞানচক্ষুও কেবল অন্ধকার দর্শন করে।

জীব। সে কথা সত্য, তথাপি বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধির আলোকের সম্মুখে জীবনোৎপাদনের তত্ত্ব এবং তাহাদের ক্রমবিকাশশীল ক্রিয়া দিন দিন উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে। প্রাণবিজ্ঞানী পদার্থবিদেরা আজ কাল স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন, কার্ব্বণিক এসিড্, জল আর এমোনিয়া হইতে প্রোটোপ্ল্যাজম জন্মিল, তাহা হইতে সর্ব্ববিধ জীবনী শক্তির প্রবাহ ছুটিল। তদনন্তর ক্রমশঃ যথানিয়মে উদ্ভিদ্, ইতর প্রাণী এবং মানবদেহের আবির্ভাব। তাহা হইতে শেষে মন বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান ভাব ইচ্ছার উৎপত্তি। কেবল এই মাত্র এখন জানিবার বাকী, মৃত মৌলিক উপাদান, যথা হাইড্রোজন, অক্সিজন, নাইট্রোজন এবং কার্ব্বণে রচিত প্রোটোপ্ল্যাজমে জীবনীশক্তি কোথা হইতে আসিল। এবং এই উপাদান চতুষ্টয়ের যোগক্রিয়ার মধ্যে যে একটু রহস্য আছে তাহা কি?

ব্রহ্ম। আমি তাহাদিগকে যে পরিমাণে অধিকার দিয়াছি তাহা সে অবশ্য ভোগ করিতে পাইবে। কিন্তু অনন্তের জন্ম কর্ম্ম অবগতির জন্য যে তোমার কৌতূহল তাহা কি বিশ্বাসগত জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয়? যদি সৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানানুসন্ধানের ন্যায় আমার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চাও, তবে তাই কর। কত দূর সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পার একবার দেখ।

শ্রীজীব অনন্তের জন্ম কর্ম্ম ভাবিতে গিয়া শেষ ঘোর বিপাকে পড়িলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টি, মন্বন্তরের পূর্ব্বে মন্বন্তর, কল্পের পূর্ব্বে কল্প; কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ, কারণের কারণ তস্য কারণ; কার্য্যের পর কার্য্যফল, ফল হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে ফল; এইরূপে যত ভাবেন ততই চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। পরিশেষে গভীর রহস্যে আবৃত দিগন্তব্যাপী এক মহা অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া পথহারা হইলেন। সৃষ্টিক্রিয়ার উৎপত্তি এবং উন্নতির দুর্লক্ষ্য গতি; মৌলিক পরমাণু এবং তাহার গতিশক্তি ও অদ্ভুত যৌগিক ফল, ক্রমবৈচিত্র্য; অনন্ত শূন্যে আলোকচ্ছটা, জলবায়ু ইথার বিদ্যুতের স্পন্দন এবং তাহাদের অদৃশ্য অনন্ত কোটী তরঙ্গ ও সূক্ষ্ম কিরণমালা; কীটাণু পরমাণুর অবিরাম গতি। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, মহাস্থূল; আবার স্থূল হইতে মহাসূক্ষ্ম। জীবন হইতে মৃত্যু, পুনরায় মৃত্যু হইতে জীবন; অখাদ্য হইতে সুখাদ্য, অসার হইতে সার, এবং দৃশ্যাদৃশ্য বিবর্ত্তন প্রবাহ; অসীম আকাশে অযুত অগণ্য জ্যোতিষ্কগণের ভ্রমণ; জীবাণুর আবর্ত্তন, প্রসারণ, বিবর্ত্তন; ইত্যাদি মহাসমারোহ ব্যাপার দর্শনে মহা বিস্ময়সাগরের অতল গর্ভে যেন তিনি একবারে ডুবিয়া গেলেন। কারণের কারণ, গুপ্ত কারণ আবিষ্কার করিতে গিয়া দেখিলেন, মৃত পরমাণুর সহিত জীবিত অণু বা জীবাণুর মধ্যে গভীর প্রভেদ। শেষোক্ত গুলির বৃদ্ধি, উর্ব্বরা শক্তি এবং পুনরুৎপত্তির মধ্যে আশ্চর্য্য জীবনীশক্তি লুক্কায়িত। আবার মৃত উপাদানের যোগে জীবিত উপাদান, তাহার অন্তরস্থিত শক্তি প্রভাবে আবার বিচিত্র গঠন এবং বিচিত্র ক্রিয়া। এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল। তাহার পর কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করত নিরাশ অন্তরে, শ্রান্ত অবসন্ন মনে, শূন্য প্রাণে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি অনন্ত নিরাকার দেবতাকে লইয়া যে বড় বিপদে পড়িলাম! হায়! কিছুই যে আয়ত্ত হয় না দেখি! ও ঠাকুর, তুমি এ কি করিলে! আমায় ফেলিয়া কোথায় গেলে? আমার প্রাণ যে তোমার জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে। আহা! আমি না বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়া তোমাকে পিতা মাতা রূপে অতি নিকটে দেখিতাম, এ আমার কি হইল? জ্ঞানে আর আমার কাজ নাই, তুমি দেখা দাও, ধরা দাও; আমার শূন্য প্রাণ পূর্ণ কর। জ্ঞানের শেষ মীমাংসাও অনুমান মাত্র;

কিন্তু বিশ্বাসের আদি অন্তে তোমার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ। বিশ্বাসের অনুমান এবং রহস্যও শান্তিপ্রদ। এখন তুমি দেখা দিয়া আমার প্রাণ শীতল কর।”

শ্রীজীবের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন, “তুমি অনধিকারচর্চ্চা করিও না, বিশ্বাসেই সুখী হও; আর যাহা আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিব তাহাই কেবল দেখিবে বুঝিবে। বিশ্বাসের আলোকে আমার পানে প্রথমে ভক্তিভাবে চাহিও, তাহা হইলে যাহা জানিবার প্রয়োজন সব আমা দ্বারাই জানিতে পারিবে। বিজ্ঞানদৃষ্টির গতি ও কার্য্যকারণতত্ত্ব অবগতির সীমা আছে। তাহার পরপারে যাইবার চেষ্টা যে করে তাহার নিকট সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়।”

অতঃপর জীব ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “উঃ কি গভীর! কি বিস্ময়কর! ধারণা হয় না। সমস্ত বিশ্ব এবং শূন্য আকাশ যেন অদৃশ্য প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ! যেমন গম্ভীর, তেমনি রমণীয়! প্রভু গো, আমি তোমার কোন্ দিক্‌টা ধরিব, কেমন করিয়াই বা চিনিয়া রাখিব, তাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি। এই অনিত্য অসার জীবনে আমার অন্য আর কিছু ভাল লাগে না; ইচ্ছা হয় সৃষ্টিলীলার আদি অন্ত মধ্যে তোমাকেই আমি দেখি, তোমাকেই ভাবি, এবং তোমাকে লইয়াই থাকি। আমার জ্ঞান বিশ্বাস ভক্তি এবং শ্রবণ দর্শনকে তুমি এক করিয়া দাও; আমি তোমায় দেখিয়া শুনিয়া, ধরিয়া ছুঁইয়া ভাল বাসিয়া তৃপ্তকাম হই। অহো! ক্রমবিকাশের কি আশ্চর্য্য ফল!

জীবের আগ্রহ ব্যাকুলতা সন্দর্শন করিয়া পরমপুরুষ শ্রীহরি বলিতে লাগিলেন, “পুত্র, নিজ অভিজ্ঞতায় যখন বুঝিয়াছ, বিচার যুক্তি তত্ত্বানুসন্ধানে প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত হয় না, হৃদয় শান্তি লাভ করে না; এবং জ্ঞানবিচারের শেষ সিদ্ধান্তও অনুমানসাপেক্ষ; তখন সহজে নিঃসংশয়ে আমার সঙ্গে শিশু বালকের ন্যায় ব্যবহার কর এবং বিশ্বাসমূলক অনুমানের সহায়তা লও। আমি তোমায় সদুপদেশ দিয়া পরিচালিত করিতেছি, তুমি সহজে তদ্দ্বারা জীবনপথে সঞ্চরণ করিতে থাক। সৎপথাশ্রয়, সাধনতত্ত্বের উপলব্ধি, কর্ত্তব্য বোধ এবং আমার নিগূঢ় মর্ম্ম পরিগ্রহ লীলা ঐশ্বর্য্য দর্শন, অনুভব সমস্তই সহজজ্ঞানসম্ভূত; কষ্টকল্পনা করিয়া এ সকল কাহাকেও হৃদয়ঙ্গম করিতে

হয় না, করা যায়ও না। আমি যেমন চর্ম্মচক্ষের সম্মুখে অতি সহজে সূর্য্যালোক প্রকাশ করিয়া থাকি, তেমনি আমি আমার নিজতত্ত্ব, গূঢ় অভিপ্রায় এবং লীলা ঐশ্বর্য্য ভক্তের সহজজ্ঞানের নিকট সরল সহজ মাতৃ-ভাষায় সহজে অভিব্যক্ত করি; ইহাতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গীন চরিতার্থতা। যেমন বাহিরের আকাশ রবিকিরণে অনুরঞ্জিত হয়, তেমনি চিত্তাকাশ আমার দিব্যজ্ঞান জ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত দেখিতে পাইবে।”

জীব। সেই কথাই ভাল। আমি বারম্বার ইহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছি। তথাপি বলিতে কি, তুমি অন্তর্য্যামী হৃদয়দর্শী সবইত জান, প্রাণটা তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, বিপুল মহত্ত্ব, অদ্ভুত লীলারহস্য দেখিয়া যেন পাগলের মত হইয়া পড়ে, তাই আবেগাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া দশদিকে ছুটিয়া বেড়াই; কি যে তখন করিব তাহা আমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। এক একবার ইচ্ছা হয়, তোমার কীর্ত্তি কলাপ গুল সমস্ত দেখিয়া ফেলি, এবং তোমার গূঢ় তত্ত্বের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেইখানে লুকাইয়া থাকি। আবার ইচ্ছা হয়, হাত পা ছাড়িয়া, গা ভাসান দিয়া তোমার কৃপাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাই। শিশু ছেলে যেমন জননীর গলা ধরিয়া কত প্রকার আদরে তাঁহাকে সম্বোধন করে, কত মিষ্ট মিষ্ট কথা বলে, তোমার প্রেমে মজিয়া, স্নেহে গলিয়া আমারও তেমনি করিতে ইচ্ছা হয়। তুমি দুর্জ্ঞেয় অজ্ঞেয় বৃহৎ ব্রহ্ম বস্তু যেমন আছ তাই থাক, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে; কিন্তু আমার নিকট চির দিন পিতা মাতা স্বরূপ হইয়া তোমাকে দেখা দিতে হইবে। আমার বড় সাধ হয়, ভক্তগণপ্রদত্ত তোমার যে সকল ভাল ভাল মিষ্ট মিষ্ট নাম আছে তাই ধরিয়া তোমায় ডাকি, আর তোমার গুণ গান করি। অন্য বিষয় আমি আর কি বুঝিব, তোমার সঙ্গে যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে সেই গুল ক্রমাগত জীবনের বিভিন্ন অবস্থাতে অনুভব করিয়া নিত্য নব নব বেশে নব নব ভাবে তোমাকে দেখিতে পাই এই প্রার্থনা।

ভগবান। এ সকল তোমার অনুরাগ ভক্তির কথা বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিশুদ্ধ জ্ঞানের যোগ থাকা আবশ্যক। যে আমার আত্মজাত সন্তান সে অজ্ঞান মোহে বা জ্ঞানান্ধকারে চিরদিন পড়িয়া থাকিবে ইহা আমার

অভিপ্রায় নয়। আচ্ছা তুমি যে বলিতেছ, আমার সঙ্গে তোমার যে বিবিধ প্রকার সম্বন্ধ আছে তাহা তুমি অনুভব করিবে। ইহার ভিতর দুইটী ভাব আছে,—এক আমার ইচ্ছা পালন করিয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধের অনুভূতি, আর আমার ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য দয়া প্রেম মহিমা দেখিয়া ভাবুকতার ভালবাসা প্রশংসা। এ দুয়ের সম্মিলন চাই। জ্ঞানও যেমন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, ভক্তিও তেমনি ভাবপ্রবণ এবং ইচ্ছাপালন। পরোক্ষ জ্ঞানের সহিত প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং ভাবপ্রবণ ভক্তির সহিত ইচ্ছাপালন ভক্তির সামঞ্জস্যে পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়। তুমি যে আমার অব্যক্ত তত্ত্ব, সৃষ্টিলীলা এবং ভগবৎ সত্তার জ্ঞান লাভের প্রয়াসী হইয়াছ, আচ্ছা বল দেখি, যাহা কিছু তুমি সত্য বলিয়া নিঃসংশয় চিত্তে বিশ্বাস করিয়া থাক তাহা কার্য্যে পরিণত হয় কি না ?

এ কথায় জীবের আত্মদৃষ্টি পরিস্ফুটিত হইল ; তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান যে জীবনে পরিপাক প্রাপ্ত হয় নাই তাহা স্পষ্টরূপে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। পরে বলিলেন, "প্রভো ! তুমি সাক্ষীরূপে আমার সকল অবস্থাই অবগত আছ, তোমার নিকট আমি আত্ম গোপন করিব কিরূপে ? যাহা যাহা সত্য বলিয়া স্পষ্টরূপে জানিয়াছি তাহার অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে তাহাও সর্ব্বাঙ্গীন নহে, আংশিক।

ভগবান। তবে আর অনেক জ্ঞান শিখিয়া কি করিবে ? এক দিকে শিখিবে, অন্য দিকে ভুলিয়া যাইবে, তাহাতে লাভ কি ? জ্ঞাতব্য বিষয় আমার অনন্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের সীমা আছে। বিশ্ব-রাজ্যে অনন্তকোটী জীব এবং পদার্থ বাস করিতেছে, তৎসমুদয়ের উপর আমার শাসন নিয়ম অভিপ্রায় অতীব দুর্ব্বোধ্য ; এবং কোন্ কোন্ কারণের সমবায়ে কি কি কার্য্য কোথায় কবে কাহার সম্বন্ধে হইবে, কোন্ কার্য্যটীই বা শেষ, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না ; বর্ত্তমানে তোমার যাহা বিশেষ কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব তাহাই বুঝিবার চেষ্টা কর। তাহার অতীত প্রদেশে আমার যে অনন্ত জ্ঞান রহস্য স্থিতি করিতেছে তাহা দুষ্প্রবেশ্য। তুমি যাহাকে ভাল কিম্বা মন্দ বল তাহার চরমাবস্থা জান না। এক্ষণে তুমি যাহা কিছু জানিয়াছ তদনুসারে

কার্য্য কর, পরে, আরো জানিতে দেওয়া হইবে। নাস্তিক বিজ্ঞানীরাও দৃশ্যমান ভৌতিক জগতের নিয়মাবলী এবং উদ্দেশ্য অনেক দেখিতে পায়, কিন্তু বিশ্বাসী এবং ভক্ত সাধক ভিন্ন অনাদি ভগবত্তত্ত্ব কাহারো জানিবার অধিকার নাই। আমি অজ্ঞানান্ধ ভক্তের ভাবান্ধতা কিম্বা নাস্তিক বিজ্ঞানীর যৌক্তিক সিদ্ধান্ত উভয়েরই দুরধিগম্য; কেবল কর্ত্তব্যপরায়ণ ভক্তেরা জ্ঞানী আমার গভীর অভিপ্রায়, নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারে।

নিম্নোক্ত এই কয়টী বিষয় বুদ্ধি যুক্তি দ্বারা কদাপি জানিতে পারিবে না; আমার চির মঙ্গল সঙ্কল্পের উপর স্থির বিশ্বাসে কেবল তাহাদের মীমাংসা আছে। (১) আমার আদি অন্ত। (২) সৃষ্টির প্রথমাবস্থা, সৃষ্ট বস্তু এবং জীবের নিয়তির দুর্ব্বিগাহ্য গতি। (৩) ধার্ম্মিকের ঐহিক কষ্ট দুঃখ। (৪) পাপীর আপাত সৌভাগ্য। (৫) মনুষ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য। (৬) দেহের সহিত আত্মার সংযোগ এবং বিয়োগ। (৭) পারলৌকিক উন্নতির বিধান। (৮) মানব স্বভাবের অধিকারভেদ ও বিচিত্রতা। (৯) ভৌতিক ও জৈবিক সৃষ্টির ভেদ বিকাশপ্রক্রিয়া। (১০) বিশ্বপালনের প্রণালী এবং গুপ্ত অভিপ্রায়। (১১) সংসার মায়া (১২) কর্ত্তব্যের ভবিষ্যৎ ফলাফল। (১৩) ঘটনা শৃঙ্খলের আরম্ভ এবং শেষ। (১৪) জীবাত্মার আন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়া। (১৫) জড়ের আদ্যন্ত এবং তাহার সংযোগ ও বিবর্ত্তনে প্রাণ ও জ্ঞানের উৎপত্তি। (১৬) জীবনের বিবর্ত্তন ক্রিয়ার ভিতর হইতে আত্মচৈতন্য ও দেবত্বের উদয়। ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত জ্ঞানী মানবগণ যাহা যাহা বুঝিয়াছে মনে করে তাহার মধ্যে অনেক ভুল থাকে। তাহারা কোন বিষয়ের আদি অন্ত দেখিতে পায় না, কেবল মধ্যস্থলের একটু তত্ত্ব বুঝিতে পারে, তাহা লইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আমি এক জন চমৎকার অত্যদ্ভুত বাজীকর বিশেষ, অথচ অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ একটী জ্ঞানী ব্যক্তি; যাহারা এইমাত্র জানিয়া বিশ্বাস ভক্তির সহিত আমার জ্ঞানের পিপাসু হইবে তাহারা চিরদিন আমার জ্ঞানানন্দরস পান করিতে পাইবে। কোন্ পদার্থের কি গুণ যাহা এত দিন অনাবিষ্কৃত ছিল, এখন ক্রমে তাহার পরিচয় পাইয়া জগৎ যেমন বিস্মিত উপকৃত হইতেছে, ভবিষ্যতে এইরূপ বিস্মিত উপকৃত চির দিন হইবে। তোমাদের মধ্যে একটু বেশী বিদ্যা

যাহার হয় তাহার মাথা ঘুরিয়া ঘাড় বাঁকিয়া যায়। কিন্তু তাহারা জানে না তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে কে আছে। আমি কে এবং কি রূপ, আমার কত ঐশ্বর্য্য বিভূতি তাহা কেবল আমিই জানি।

জ্ঞানযোগ—৩য় অধ্যায়।

জীব হইতে মনুষ্যত্বের উৎপত্তি।

জীব বলিলেন, এক্ষণে মনুষ্যত্বের উৎপত্তি বিবরণ কি তাহা জানিবার জন্য আমার চিত্ত বড় ব্যাকুল হইতেছে। জড় হইতে জীবন উৎপাদনের গভীর রহস্য যেরূপ মানববুদ্ধির অগোচর, জীবন হইতে বিবেক বুদ্ধি আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি রহস্যও কি সেইরূপ? চেতনা-চেতনের সহিত আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধ কি প্রকার? জড়েতে জীবন নাই, জীবনেও আত্মজ্ঞান বিবেক নাই; এই তিনটীই গুণে এবং জাতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, এক অপরের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, ইহা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বটে; কিন্তু এই তিনের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, অভেদত্ব ও মিশ্রযোগ দর্শনে অবাক হইতে হয়।

ব্রহ্ম। কোন্ কোন্ বিষয় মনুষ্য বুদ্ধির অতীত তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই এক প্রকার অবগত করিয়াছি। কোথায় কোথায় জ্ঞানের শেষ সীমা এবং বিশ্বাসের আরম্ভ তাহাও তোমার জানিয়া রাখা উচিত।

জীব। জ্ঞান এবং বিশ্বাস কি তবে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন দুইটী পরস্পর-বিরোধী স্বতন্ত্র বিষয়? বিশ্বাসের ভিতর কি জ্ঞান নাই? জ্ঞানের সঙ্গে কি বিশ্বাস থাকিতে পারে না?

ব্রহ্ম। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত যে বিশ্বাস তাহা অন্ধের অনুমান মাত্র। জ্ঞানালোকে যে অভ্রান্ত সার সত্য তত্ত্ব প্রকাশিত হয় বিশ্বাস তাহা-কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। শূন্য কিম্বা কবিত্ব কল্পনার ভাবান্ধতা, পুরাতন

সংস্কার, অবাস্তবিকতার উপর তাহা অধিক ক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না। দিব্য জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় তাহাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস।

জীব। সেই জন্যইত জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি জ্ঞান বিশ্বাস দুইটিকে পৃথক পৃথক্ কেন তবে বলিতেছ?

ব্রহ্ম। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যের জ্ঞানের সীমা আছে, কিন্তু তাহার বিশ্বাসের সীমা নাই। আমার বহিরঙ্গ তত্ত্বের বহুদূর পর্য্যন্ত আমি দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণের সাহায্যে মানবের জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটন করি, কিন্তু অন্তরঙ্গ নিগূঢ় তত্ত্বের গভীর রহস্য কেবল আদেশালোকে অনুরঞ্জিত বিশ্বাস চক্ষে প্রতিভাত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারও প্রথমে দৈবাদেশে উন্মুক্ত হইয়া থাকে, তদনন্তর বিচার যুক্তি তুলনা উপমা অভিজ্ঞতা চিন্তা এবং সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্রাদি তদ্বিষয়ক উন্নতির সাহায্য করে। এই জ্ঞান ও বিশ্বাসরাজ্যের সন্ধিস্থলে এক গভীর সুদুস্তর রহস্য আছে। কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাসের রহস্যমধ্যেও বিজ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসের চতুর্দ্দিকস্থ অনন্ত দুর্ভেদ্য রহস্য কেবল বিশ্বাস চক্ষেই প্রতিভাত হয়। বিশ্বাসী ভক্তের অনন্ত জীবনের জীবিকা তন্মধ্যে সঞ্চিত আছে। তাহার অতলস্পর্শ গভীর অভ্যন্তর হইতে দিন দিন নব নব তত্ত্ব উদ্ভূত হইবে। এই রহস্যই বিশ্বাসের প্রাণ এবং ভক্তির নিত্য লীলাভূমি।

জীব। যে যে বিষয় জ্ঞানের অগম্য জানিয়া বিশ্বাসের চক্ষে দেখিব তাহাতে কি জ্ঞান চরিতার্থ হইবে না?

ব্রহ্ম। তাহা না হইলে বিশ্বাস দাঁড়াইবে কি ধরিয়া? বিশ্বাসই জ্ঞান-সাধনের চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান এবং বিশ্বাস কিম্বা বিজ্ঞান একই বিষয়। তবে বিশ্বাসমূলক এক দিব্যজ্ঞান আছে তাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাপেক্ষাও সমুজ্জ্বল। অবিদ্যার পরপারে দেবালোকে তাহার প্রকাশ। ইহাকে দেবসংস্কার বলা যাইতে পারে। অনেকানেক দুর্ব্বোধ্য দুর্জ্ঞেয় জ্ঞানের মর্ম্ম বিশ্বাসের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তোমাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের মধ্যে কোন গভীর রহস্য নাই; কারণ, তাহা তোমার গণনা সিদ্ধান্তের সীমান্তর্গত। চক্ষু কর্ণ বুদ্ধির কত ভুলও তাহাতে

লুকাইয়া থাকে। অগ্রে আমার উপর বিশ্বাস করিয়া পরে আমার সৃষ্টিক্রিয়ার মঙ্গল সঙ্কল্পের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে তাহা হইতে অনন্ত তত্ত্ব জ্ঞান উৎসারিত হয়।' এখানে কোন ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সহজে স্বভাবের ভিতর দিয়া বিশ্বাসমূলক জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা দিয়া থাকি।

জীব। ঠিক কথা। ইহাতে যেমন তৃপ্তি, নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমা-মধ্যে থাকিলে তেমন তৃপ্ত্যনুভব করিতে পারি না। যাউক, এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় যদি অনধিকারচর্চ্চা না হয়, তবে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দাও।

ব্রহ্ম। মৃত জড়ের সহিত জৈবযন্ত্রের পার্থক্য কোথায় তোমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পার নাই; আচ্ছা, জীবনের পরিণাম এবং মানসিক শক্তির আরম্ভ এতদুভয়ের সন্ধিস্থল সম্বন্ধে কত দূর কি শিখিয়াছ বল দেখি শুনি।

জীব। ঠাকুর, তুমি অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ, মানুষের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কত তাহাত সবই জান, তবে কেন আর কাঙ্গালকে ছলনা কর?

ব্রহ্ম। তবু বল না, তোমাদের জ্ঞানীরা এ বিষয়ে কত দূর কি আবিষ্কার করিয়াছেন? ইহাতে লোকশিক্ষা হইবে।

জীব। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারুইন বলেন, "জীবোৎপত্তির আদিমূল অনুসন্ধান যেমন একটী নিরাশজনক কার্য্য, ইতর প্রাণীর মধ্যে মানসিক শক্তির প্রথম বিকাশের প্রক্রিয়াও তেমনি।" স্বভাবের নির্ব্বাচন বিধি (**Natural** seleotion) ইহার মূল হইতে পারে, এই বলিয়া এ স্থান হইতে তিনি বিদায় লইয়াছেন। এবং স্বভাবের নির্ব্বাচন বিধি, Survival of the fittest অর্থাৎ যে উপযুক্ত সেই বাঁচে, এই নিয়ম যেমন উদ্ভিদ এবং অতি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নরদেহে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে, মনের উৎপত্তি ও উন্নতি সেরূপ হয় নাই; যদিও হইয়া থাকে তাহার কোন ঐতিহাসিক চিহ্ন নাই। গরিলা, বা বনমানুষ, হস্তী কুক্কুর প্রভৃতির এক প্রকার মানসিক বুদ্ধি শক্তি এবং অপত্যস্নেহ, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা থাকে, কিন্তু তাহার সীমা আছে। মানুষ কোন্ স্থান হইতে

এই সীমা অতিক্রম করিয়া হঠাৎ একবারে অনন্ত জ্ঞানপথে কিরূপে উঠিল তাহা বুদ্ধির অগম্য। বস্তুতঃ মানবস্বভাবেই ইহার চরমোৎকর্ষ দেখা যায়। এই দুয়ের মধ্যে জাতিগত এবং পরিমাণগত মানসিক জ্ঞানের সুদূর ব্যবধান আছে। সাধারণতঃ ইহাই সকলের শেষ সিদ্ধান্ত। সর্ব্বাপেক্ষা যিনি বিচক্ষণ প্রবীণ জ্ঞানী, সেই হাক্সিলি মহাশয় বলিয়াছেন, "জীবাণু (Moleoular) হইতে আরম্ভ করিয়া মানবীয় আত্মজ্ঞানের উন্নতি পর্য্যন্ত এই যে মধ্য পথটী, ইহাতে কিরূপে প্রাকৃতিক শক্তির পদ চালনা নিষ্পন্ন হইল আমি তাহার কিছুই জানি না; কোন কালে যে সে বিষয় কিছু জানিতে পারিব তাহারো আশা নাই। শারীরিক প্রাণ ও মানসিক জ্ঞান দুইটী বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্।" জার্ম্মণ পণ্ডিত ডুবইস্ রিমণ্ড বলেন, "কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ এবং অক্সিজেন ইত্যাদি কয়টী মৌলিক পরমাণু কি রূপে গতিবিশিষ্ট হইতেছে এবং হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবে, এ বিষয়ে যে তাহাদের কোন চেতনা থাকিতে পারে ইহা কখন মনে ধারণা হয় না। ইহাদিগের সমবায়ে মানসিক শক্তি, আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণরূপে অননুভবনীয়।"

অন্যান্য বিখ্যাত পণ্ডিতেরাও এইরূপ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। মৃত জড় হইতে জীবন, এবং সাধারণ জীবন হইতে মানব মনের উৎপত্তির মূল ঠিক কোন্ স্থানে, মানসিক শক্তি সম্বন্ধে মনুষ্যের সঙ্গে পশুদের প্রভেদ জাতি-গত কি পরিমাণগত এবং কোন্ স্থানে তাহার আরম্ভ, এ তত্ত্ব চির কালই কি তবে জ্ঞানের অগম্য গূঢ় রহস্যেই ঢাকা থাকিবে?

ব্রহ্ম। তাহাতে ক্ষতি কি? এই খানে বিশ্বাস করিলেই হইল যে আমি কোন দুর্লক্ষ্য অতি কূট প্রণালীতে ইহা সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমার দৃষ্টিতে ইহার ধারাবাহিক কার্য্যকারণশৃঙ্খলের কোন গ্রন্থি হারাইয়া যায় নাই।

জীব। তাহাত ঠিক কথাই বটে, কিন্তু তুমি এই জায়গাটায় জ্ঞানী পণ্ডিতদিগকে অদ্যাবধি যাইতে দাও নাই কেন? দিলে কি কিছু ক্ষতি হইত?

ব্রহ্ম। তত্ত্বদর্শীদিগের বুদ্ধির আলোকের সম্মুখে আমি জগতের উৎপত্তি এবং উন্নতির ক্রমবিকাশবিজ্ঞান যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছি তাহার বিস্ময়-

জনক আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছে। অথচ তন্মধ্যে এখনও কত অনন্ত গভীর সূক্ষ্ম বিচিত্র তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। কর্ত্তা-কর্ম্মক্রিয়া, ব্যক্তি-জ্ঞান-শক্তি-সৃষ্টি, এক সঙ্গে অধ্যয়ন না করিলে জ্ঞানতৃষ্ণা কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। মানুষের যত দূর জানা প্রয়োজন তাহাই আমি জানিতে দিয়াছি, আরো দিব। কিন্তু যখন নিয়ম হইতে নিয়ন্তা, কার্য্য হইতে অনাদি কারণ, শক্তি হইতে ব্যক্তি, সৃষ্ট হইতে স্রষ্টাতে আসিয়া সে পৌঁছিবে তখন জ্ঞানের চরম পরিপাক যে বিশ্বাস তাহা পাইয়া সে কৃতার্থ হইবে। তৎকালে সে কত যে অল্পজ্ঞ অনভিজ্ঞ শিশুসমান তাহাও বুঝিতে পারিবে। সুবিজ্ঞ প্রবীণ পিতার নিকট সরল বালক যে ভাবে জ্ঞান শিক্ষা করে তাহাই সহজ প্রণালী।

জীব। এই যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মহাবুদ্ধিমান অধ্যবসায়শীল তত্ত্বপিপাসু জ্ঞানোন্মত্ত ব্যক্তি, ইহাঁদের জ্ঞান সাধনের চরম ফল তবে কি? যাহাদের কাছে যাইতে আমাদের সাহস হয় না, তাঁহাদিগকে শেষ তুমি কি মূর্খের দলে ফেলিলে?

ব্রহ্ম। যাহারা কেবল বিশ্বকার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ এবং নিয়মাদি জানিয়া জ্ঞানী হইতে চায়, কিন্তু ভক্তি বিনয়ের সহিত বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায় ইঙ্গিত বুঝিতে ইচ্ছা করে না, তাহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি মানবীয় বুদ্ধি ক্ষমতার শেষ সীমা কত দূর তাহাই সকলকে জানিতে দিয়াছি। যন্ত্রের দ্বারা যেমন যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হয় তেমনি আমি ইহাদিগকে যন্ত্র স্বরূপ—বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবন্ত যন্ত্রস্বরূপ করিয়াছি। অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অন্তরালে ইহাদের চর্ম্মচক্ষু এবং চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে বুদ্ধি বিচক্ষণতা, তাহার অন্তরালে আমি জ্ঞানের জ্ঞান, চক্ষুর চক্ষু এবং যন্ত্রী হইয়া এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব জগতে আবিষ্কার করিয়া থাকি। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশু যাহা সহজে বুঝিতে পারে, ইহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে তাহা পারে না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা স্বয়ং আমি; চিদাভাস মানব যখন নিজ জ্ঞানের মধ্যে আমাকে এইরূপে দেখিবে তখন সে জ্ঞান এবং পরিত্রাণ দুইই পাইবে।

জীব। আহা! তবে চন্দ্র সূর্য্য যেমন তোমাকে না জানিয়া তোমার মহিমাজ্যোতি প্রচার করিতেছে, জ্ঞানী পণ্ডিতেরাও কি তদ্রূপ?

ব্রহ্ম। ঠিক সেরূপ নহে, তদপেক্ষা অনেক উন্নত। কিন্তু তথাপি ইহারা আমাকে চেনে না। যাহা হউক, ইহাদের উপলক্ষে আমি অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছি।

জীব। অতঃপর আমাকে এখন বুঝাইয়া দাও, জড়, উদ্ভিদ, ইতর প্রাণী, মনুষ্য এবং তাহার মনোবুদ্ধিবিবেক এ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, না এক অখণ্ড দুশ্ছেদ্য? অথবা পরিণামবাদের ফলে একটী হইতে আর একটী দেখা দিয়াছে?

পরমব্রহ্ম সদ্‌গুরু অলৌকিক মধুর বাণীতে বলিতে লাগিলেন, "হে জীব! তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ইহার প্রকৃত উত্তর ধারণ করিতে পারিবে না। উহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র, অথচ এক। একের সঙ্গে অপরের দূরতর এবং নিকটতর এমন গূঢ় সম্বন্ধ আছে যে তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শুনিলে তুমি এখনই জ্ঞানার্ণবে ডুবিয়া যাইবে। জড় চৈতন্য, শরীর মন, অচেতন এবং সচেতন, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত, সাকার নিরাকার, ইহাদিগকে যদি তুমি বিচ্ছিন্ন জ্ঞানে দেশ কাল পাত্রে বদ্ধ করিয়া বুঝিতে যাও তাহা হইলে এই দণ্ডে এখনই তুমি পাগল হইয়া উঠিবে। যখন তুমি আমার বিশ্বরূপের স্তব করিয়াছিলে তখন তোমার মধ্যে তাহার কতক আভাস প্রতিভাত হইয়াছিল। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের ভিতর পরস্পর উপযোগিতা এবং সংযোগ বিয়োগের যে ফল তাহা অতীব অদ্ভুত। কেন হয়, তাহা কেবল আমিই জানি; তোমরা কার্য্যকারণের পথ ধরিয়া বিচার যুক্তির সাহায্যে তাহার আদ্যন্ত বুঝিতে পারিবে না। স্থূল ভাবে বিশ্বোন্নতির ক্রম এবং তাহার বিবর্ত্তনের সোপান চিহ্ন কতকটা মানববুদ্ধির অধিকৃত। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিয়োগ বিজ্ঞানের নিয়মে যদি চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে মৃত জড় কিরূপে জীবে এবং ইতর প্রাণী কিরূপে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষে এবং মানুষ কিরূপে আত্মজ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন দেবতারূপে পরিণত হইল, তৎসমুদয়ের বিবরণ, তাহাদের পরস্পর জাতি ও পরিমাণগত পার্থক্য এবং উন্নতির ক্রম, কার্য্য-কারণশৃঙ্খল ধরিয়া কেবল বুদ্ধিবলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কিছু দিন আগে যাহাকে দেখিয়াছিলে জড় অজ্ঞান অচেতন ভ্রূণ মৃতবৎ, সৃষ্টির আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের নিয়মে তাহাই আবার উদ্ভিদ্, প্রাণী এবং নরদেহে পরিণত হইল। ইহারা যদিও এক উপাদানসম্ভূত, কিন্তু কেবল নরদেহ

হইতেই মানসিক শক্তি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেকের উদয়। মূল কারণে দৃশ্যতঃ যে গুণ শক্তি ছিল না, বহু বিবর্ত্তনের পর সহসা কার্য্যে তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইল! এই ভাবিয়া তোমরা বিস্ময়াপন্ন হও। কিন্তু উপাদান কারণের অভ্যন্তরে ইচ্ছাশক্তিশালী নিগূঢ় কারণ কি আছে না আছে তাহা কে বুঝিতে সক্ষম? প্রোটোপ্ল্যাজম শব্দ মাত্র ব্যবহার করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত হইলে, কিন্তু বুঝিলে কি? প্রোটোপ্ল্যাজমের যে প্রোটোপ্ল্যাজম, তাহার অভ্যন্তরে গভীর রহস্যময়ী ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রাণ কোথা হইতে আইসে, কোথায় যায়, তোমরা কেবল তাহার আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র দেখিতে পাও, কিন্তু জীবের জন্ম মৃত্যুর রহস্য জান না। সচরাচর যাহাকে তোমরা মৃত জড় পদার্থ বল তাহার বাহ্য স্বরূপ লক্ষণ কয়েকটীর নামকরণ কেবল তোমরা করিয়াছ; কিন্তু জড়ীয় গুণের অন্তরালে সূক্ষ্ম চৈতন্যের লীলা অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়। সাকার দৃশ্য স্থূল সূক্ষ্ম জড় পদার্থ সকল আমার নিরাকার চিন্তা অভিপ্রায় প্রকাশের নিদর্শন। জড়ের পূর্ব্বেই চৈতন্য, তদ্ব্যতীত তাহার সৃষ্টিই হইতে পারে না। আবার অচেতন সচেতন আধারআধেয়রূপে এক সঙ্গে মিশ্রিত। ইহাদের যোগ-ক্রিয়ার মধ্যে অনন্ত বিচিত্রতা স্থিতি করিতেছে। জগতের উন্নতির প্রত্যেক সোপানে উহাদের বিশেষত্বের পৃথক পৃথক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের দৈহিক উন্নতির একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, বহুবিধ আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ তাহারা তথায় উঠিয়াছে; সেখান হইতে আর ইহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইবে না, ঊর্দ্ধদিকেও আর যাইবে না। কেবল উৎকর্ষাপকর্ষ জন্য যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা। মানবদেহও সেইরূপ। সে আর হনুমান, বনমানুষ, কিম্বা প্রাণী উদ্ভিদের দেহ পরিগ্রহ করিবে না, চতুর্ভুজ, পঞ্চমুখও হইবে না; পূর্ব্বাস্থার ভিতর দিয়া সে যথাসময়ে চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মানুষ হইতে এখন ক্রমাগত দিব্যশ্রী মানুষই উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি অসীম। আমি স্বয়ংই তাহার সে অসীম উন্নতি লাভের উপাদান এবং উপজীবিকা। আমার অনন্ত বিভূতিময় মহাসত্তা তাহার চতুর্দ্দিকস্থ পোষণী শক্তি, সুতরাং তাহার আত্মিক উন্নতির শেষ কোথাও নাই।”

জীব বিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাত সেই জড়বাদের মতনই খানিকটা বোধ হইতেছে! তবে কি জড়, জীবদেহ এবং তদন্তর্গত জীবনীশক্তি ও পাশব সংস্কার অমর আত্মার উৎপত্তির স্থল? এবং মনুষ্য-জাতি কি তবে একটী স্বাধীন মৌলিক জাতি নহে?"

ব্রহ্ম। প্রচলিত পরিণামবাদের বিবর্ত্তনেতিহাস ধরিয়া বুঝিতে গেলে তাই মনে হয়; কিন্তু বিবর্ত্তনপ্রসূত অনন্ত বিচিত্র যোগাযোগের ক্রিয়া-মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য এবং উন্নতির সোপান আছে। সেই জন্যই জড় হইতে প্রাণ এবং প্রাণীদেহ হইতে আত্মজ্ঞান বিবেকের উৎপত্তির প্রভেদ কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যদিও নরদেহ এবং মানবাত্মার শৈশবাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থার ক্রমোন্নতির সুবিস্তৃত ইতিহাস আছে এবং তাহার আদিমাবস্থার শরীর মনের কোন কোন গঠনের সহিত পশুগজতের কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য নয়নগোচর হয়, কিন্তু মূলতঃ তাহা ইতর জন্তু হইতে স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন জাতি। নর এবং বানর, স্ত্রী এবং পুরুষ প্রথম হইতেই স্বতন্ত্র স্বভাব।

জীব। তবে বানর হইতে মানুষের জন্ম এটা কি সত্য কথা নহে?

ব্রহ্ম। বানরবৎ অসভ্য আদিম মানবজাতি বর্ত্তমান সভ্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষ, আর বানর হইতে মানবের উৎপত্তি, এ দুয়ের মধ্যে কি কোন গৌরব অগৌরবের লক্ষণ দেখিতে পাও?

জীব। তবু নিহাত বানর হইতে জন্ম অপেক্ষা অসভ্য বর্ব্বর মানব হইতে আমাদের জন্ম এটা অনেক ভাল বৈ কি। অসভ্য আদিম মানবের ভিতর যে মনুষ্যত্বের বীজ ছিল বংশপরম্পরা তাহা হইতেই ত ক্রমে আমরা সভ্য হইয়া উঠিয়াছি। ইহাতে বংশমর্য্যাদা রক্ষা পায়। আর বানর যে সে চিরকালই বানর, তাহাদের ভিতর হইতে একাল পর্য্যন্ত কৈ একটা মানুষত জন্মিল না।

ব্রহ্ম। অসভ্য আদিম মানবের ভিতর বীজরূপে যে মনুষ্যত্ব ছিল সেই বীজের বীজ যে আবার তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অসভ্যতম নরবানরের ভিতর ছিল তাহার বিষয় কি ভাবিলে?

জীব। হাঁ, তাহাও ঠিক কথা বটে। বিবর্ত্তবাদ মানিতে গেলে

আদিম মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ হনুমানবৎ একটা কিছু জীব মানিয়া লইতে হয়। তাহারও আবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অবশ্য ছিল। কিন্তু তাহারা হনুমানবৎ মনুষ্য বংশ হইলেও আমরা এখন আরত হনুমান বংশ নই, মানুষ হইতেই আমরা জন্মিয়াছি।

ব্রহ্ম। এরূপে বংশমর্য্যাদা বজায় না রাখিয়া, তদপেক্ষা আরো উচ্চ কুলোদ্ভব আপনাদিগকে কেন মনে কর না? তোমরা আমার অংশ এবং বংশ, ইহাতে কি বিশ্বাস হয় না?

জীব। আসল গোড়ার কথাই তাই বটে; তবে Evolution শাস্ত্রটা কিনা আজ কাল সকলেই মানে, সেই জন্য পর পর যেখান হইতে মনুষ্য জাতির আরম্ভ, আমাদের উৎপত্তির ঐতিহাসিক বিশেষ মূল সেই স্থান হইতেই ধরিতে হইবে। অনৈতিহাসিক যুগে কোন সময় এমন একটা অবস্থা ছিল যখন মানবের সহিত পশু বা বানরবংশের জাতি এবং প্রকৃতি-গত একটা সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র প্রভেদ রেখা অবশ্যই তুমি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছ। তবে উভয়ের পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলের গ্রন্থি, কার্য্যকারণসম্বন্ধ, অথবা মূল ও শাখার প্রভেদ কোথায়, এখন আমাদের পক্ষে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। ক্রমবিকাশের পথের মাঝে কোন্ স্থানে কি একটা আশ্চর্য্য ক্রিয়া তুমি করিয়াছ যাহাতে পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আর আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ব্রহ্ম। যে স্থান হইতে তোমাদের উৎপত্তি মূল ধরিতে চাও ধর, কিন্তু তৎপূর্ব্বেরও সুদূরব্যাপী ইতিহাস আছে। মানুষ আরত একেবারেই ভদ্র বিদ্বান্ হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বেশে আকাশ হইতে পড়ে নাই। তাহারা পিতৃমাতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল আকস্মিক জীবও নহে। এবং আমিও কদাপি সৃষ্টির মূল উপাদান পুনঃ পুনঃ সৃজন করি না। একবার যাহা করিয়াছি তাহার একটীও পরিত্যক্ত হয় নাই, কেবল তাহাদের পূর্ণতা সাধন করিতেছি। তবে একটি কথা এখানে বুঝিতে হইবে; আমার দৃষ্টিতে এমন সকল নব নব ভৌতিক ক্রিয়া আছে যাহা মানবীয় বিজ্ঞানের চক্ষে মৌলিক সৃষ্টি বিশেষ। কিন্তু পূর্ব্বাপর অবিচ্ছিন্ন যোগ বিশ্বনিয়মের এক প্রধান লক্ষণ। সংযোগ বিয়োগ, আবর্ত্তন বিবর্ত্তন মিশ্রণে যাবতীয় সৃষ্টিকার্য্য

সম্পন্ন হইতেছে। জড় ভৌতিক বা জীবজগতের জাতি ও প্রকৃতিগত ভিন্নতার সূক্ষ্ম রেখা মানবের মনোবুদ্ধি এবং চর্ম্মচক্ষের অগোচর। আমার বিভিন্ন অভিপ্রায়ই জড় উদ্ভিদ্ ইতর প্রাণী এবং মানব জাতির জাতি ভেদের মূল। জড় ও জীবের, জীব ও মনুষ্যের মধ্যস্থলে এক একটী দুস্তর গভীর খাদ আছে; এবং মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের সন্ধি স্থানেও এক সুবিস্তীর্ণ গড়খাই দেখিতে পাইবে। তাহাদের উপরকার সেতু আমি স্বয়ং।

জীব। তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কে? জন্মস্থানই বা কোথায়? সৃষ্টির প্রথমাবস্থা সেই তরল উষ্ম বাষ্পরাশিই কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ?

ব্রহ্ম। তাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সে বাষ্পই বা কোথা হইতে জন্মিল? তোমরা এই একটী মাত্র সৌরজগৎকেই বুঝি সমস্ত সৃষ্টি মনে কর? সৃষ্টি আমার অগণ্য, তাহার আদি অন্ত জানিতে হইলে অনন্ত জ্ঞানের প্রয়োজন।

জীব। এই জগতের আদিমাবস্থাকেই আমি সৃষ্টির আরম্ভ মনে করিয়াছিলাম সত্য। আমার ভুল হইয়াছে।

সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা বলিলেন, "বৎস, কষ্ট করিয়া যদি অত দূর নামিলে, তবে আর একটু নিম্নে অবতরণ করিলেই দেখিতে পাইবে, রথচক্রের নাভি এবং নেমিদেশে অর সকল যেমন সমর্পিত থাকে, আমি নিজেই তেমনি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিপিতা হইয়া রহিয়াছি। দৈহিক গঠনের মূল উপাদান তোমারও যা, ইতর প্রাণীরও তাই; তদ্বিষয়ে উচ্চ নীচ ইতর বিশেষ কিছুই নাই। মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের অধিকারী কেবল মানুষ, সে আমারই অনুকৃতি। অনেক প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া আমি তাহাকে এই উচ্চ সোপানে আনিয়াছি। কিন্তু আদি মধ্য অন্তে, প্রত্যেক বিবর্ত্তন স্তরে আমার কর্ত্তৃত্ব চির বর্ত্তমান। আমি যে প্রণালীতে যাহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনি না কেন, এখান হইতে কেহ আর পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে না। মানব দেহ মৌলিক উপাদানে এবং তাহার আত্মা প্রোটোপ্ল্যাজমে পরিণত হইবে না। কর্ম্মদোষে মানুষ বানর স্বভাব পাইতে পারে, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ব বানরত্বের অতীত অবস্থায় এখন পৌঁছিয়াছে। আমার কার্য্যপ্রণালী অলৌকিক, মাটী

হইতে আমি সোণা প্রস্তুত করি। মানবাত্মার অধিকার কত উচ্চ তাহা এখনো তোমরা অবগত নহ।”

জীব এই সকল সৃষ্টিলীলার বিচিত্র রহস্য মধ্যে অবতরণ করিতে করিতে আত্মহারা হইলেন। এবং আদি অন্তে এক নির্ব্বিশেষ অনন্ত ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন বিপুল বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, “দেব, এক কেবল তুমিই আছ, অন্য যাহা কিছু সব তোমারই প্রকাশ। এখন আমি বুঝিলাম, Cell, Moleculs, Protoplam, Evolution, মূল কারণ এবং শেষ কার্য্যমধ্যে তুমিই স্বয়ং অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছ। ভৌতিক সপ্ততি উপাদান, ছয়টী মূল শক্তির অন্তরালে তোমারই অখণ্ড অনন্ত সত্তা বিরাজ করিতেছে। জড় প্রকৃতি, জীবচৈতন্য এবং পরম চৈতন্য, এ তিনের একটীকেও স্বতন্ত্র করা যায় না। প্রাণ বা জীবন সেও তুমি নিজে। Nebulous, Force, Motion Electricity, Magnetism, Laws ইহারা তোমার ইচ্ছাপরতন্ত্র কার্য্যযন্ত্র।”

ভগবান বলিলেন, “Evolution শাস্ত্রকার নরজাতির সহিত বানর ও বনমানুষের দৈহিক গঠন সাদৃশ্য দেখিয়া যে উহাদিগকে মানব কুলের পিতৃপুরুষ স্থির করিয়াছেন তাহা ভুল। যথার্থ Evolution কত গভীর, সুদীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম তাহা কেবল আমিই জানি। আমার বিজ্ঞানময়ী মঙ্গলদায়িনী ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টির মূল উপাদান বলিয়া বিশ্বাস কর। যে তিনটী বিভাজক খাদের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা পার হইবার জন্য ঐ সূক্ষ্ম সূত্রটী একমাত্র অবলম্বনীয়। জড় ও জীব, জীবন ও আত্মার মধ্যস্থ গ্রন্থি হারাইয়া জ্ঞানীরা কতই না বিড়ম্বিত হইতেছেন! অনন্ত আকাশব্যাপী উত্তপ্ত কুজ্ঝটিকার গর্ভ হইতে অযুত অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল কে বাহির করিল? দিগন্ত প্রসারিত ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয় হইল কিরূপে? এবং অগ্নিময় তরল দ্রব ধাতুপিণ্ডকে ক্রমে শীতল ও কঠিন করিয়া এই পৃথিবীকেই বা কে রচনা করিয়াছে? নিয়ম, শক্তি, গতি, তড়িৎ, উত্তাপ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এবং প্রোটোপ্ল্যাজম ইত্যাদি কি উহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা? ধাতু উদ্ভিদ্ কীটাণু জীবাণু ইতর প্রাণী এবং মানবজাতি যে যখন জন্মিয়াছে আমি স্বয়ং মূল শক্তিরূপে, এবং

জ্ঞানকৌশলপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছারূপে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, এখনো আছি, পরেও থাকিব। কোথা হইতে, কি নিয়মে, কি রূপে কখন প্রাণশক্তি এবং মানসিক শক্তির সঞ্চার হইল তাহা যেমন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না, জড় প্রকৃতি এবং জীব প্রকৃতির গুণভেদতত্ত্ব তেমনি ভূগর্ব্ভনিহিত কিম্বা জলধিতলস্থ পদার্থ বা প্রাণী বিশেষের জীর্ণ কঙ্কাল দর্শনে ঠিক করিতে পারিবে না। দেবক্রিয়া মানবের অগোচর। আমি ছাড়া এ সব কিছুই হয় নাই, এই বিশ্বাসালোকে সমস্ত বিভাগের বিজ্ঞান দর্শন, অজানিত ইতিহাস আলোকিত করিয়া লও। বিশ্বাসালোক ব্যতীত বিজ্ঞান সম্যক রূপে চক্ষুষ্মান্ হয় না। উপাদান কারণের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার কিয়দংশ বিজ্ঞানের বোধ্য, কিন্তু নিমিত্ত কারণের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া সকল অতীব গুহ্য। কার্ব্বণ অক্সিজেন প্রভৃতি মূল উপাদান চতুষ্টয়ের মিলনের যথাযথ পরিমাণ বুঝাইয়া দিলেও জীবন্ত প্রোটোপ্ল্যাজম কি তোমরা সৃজন করিতে পার? প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে কে? তদনন্তর ঐ জীবনী শক্তি হইতে বিজ্ঞান বিবেক প্রেম ইচ্ছা নীতি কি প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে? এ সকল অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া কেবল দেখ, এবং কারীগরকে প্রশংসা কর।”

অনন্তর শ্রীজীবকে ভালরূপে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য পরমজ্ঞানী বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, “অতি হীনাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে তোমরা অমূল্য মানবজীবন পাইয়াছ সত্য, এবং তোমাদের আদিমাবস্থার সহিত কপি বংশের দৈহিক গঠনের অনেক সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু ইহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই, বরং মহাগৌরবের কথা। রূপান্তর বর্ণান্তর কদাপি জাত্যন্তর নহে। দৃশতঃ যে কিছু ভাবান্তর বা জাত্যন্তর পরিলক্ষিত হয় তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার এবং কৃত্রিম। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের স্বাভাবিক চরম ফল মনুষ্য জাতি। বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া বিবিধ ভৌতিক, জৈবিক, সামাজিক ও মানসিক নিগূঢ় প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া আমি পরিণামে এইরূপে তোমাদিগকে প্রস্ফুটিত করিয়াছি। শেষ ফল দেখ, প্রথম কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যপ্রণালী ভাবিয়া কি করিবে? জড় ধাতু উদ্ভিদ্ প্রাণী সমস্তই তোমাদের সহায় এবং অভেদাঙ্গ। তৎ সমুদয়কে নিষ্কর্ষণ করিয়া ক্রমবিকাশ প্রণালীতে সারভূত

এই মানবজীবনকে আমি আমার পরাপ্রকৃতির অনুকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার আমূল ইতিহাস অনৈতিহাসিক যুগের অন্ধকার গর্ব্ভে নিহিত আছে।”

জীব ভগবানের মুখে মনুষ্য সৃষ্টির বিস্ময়কর ঐতিহাসিক কাহিনী শুনিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। দেহ ও আত্মতত্ত্বের অনন্ত যুগন্তরের সোপানপরম্পর ভাবিতে ভাবিতে সৃষ্টির আদি মূল উপাদান সেই অনন্ত কুজ্‌ঝটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার পরিণাম ফল এই বর্ত্তমান পৃথিবীর সহিত উভয়ের বিচিত্র বিসদৃশ মূর্ত্তি যখন দেখিলেন তখন পরম কারণ অনাদি তত্ত্বের জ্বলন্ত জ্যোতিতে তদীয় হৃদয়সমুদ্রে অদ্ভুত কল্পনাতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল।

জ্ঞানযোগ—৪র্থ অধ্যায়।

নিত্যানিত্যবিবেক।

অতঃপর জীবন ও মনুষ্যত্বের এবং দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিরহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণে জীবানন্দের অন্তরে নিত্যানিত্য বিবেক সহসা জাগিয়া উঠিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভো, তুমিইত সকলের আদি কারণ, আদি জ্ঞান এবং জীবনীশক্তি, তবে এই প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তমোগুণাশ্রিত জীবোপাধি-ধারী পুরুষের স্বভাব স্বরূপ তোমা হইতে এত ভিন্ন কিরূপে হইল? জীবাত্মা যখন তোমারই বিশুদ্ধ চৈতন্যের অংশ অথবা প্রতিবিম্ব তখন সে কেন অনস্তিত্বের ন্যায় প্রকৃতির অধীন হইয়া তদভাবাপন্ন হইয়া যায়?

ব্রহ্ম। তাইত হইবার কথা। সে যখন সৃষ্ট, অপূর্ণ উন্নতিশীল জীব এবং প্রকৃতির অন্তর্গত এবং অঙ্গীভূত, তখন আর পূর্ণ কিরূপে হইতে পারিবে? ক্রমোন্নতিশীল যাহার স্বভাব তাহাকে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে হয়, ইহাই চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম।

জীব। তোমার মত পূর্ণ অনন্ত না হউক, সে মোহে মগ্ন হইয়া কেন পশুবৎ অবস্থিতি করিবে? একবারে প্রথম হইতে শুকদেবের মত কেন দেবভাবাপন্ন সে হইল না? এই মনুষ্যলোককে তুমিত ইচ্ছা করিলে প্রথম হইতে দেবলোক রূপেও রচনা করিতে পারিতে? তাহা হইলে মানবসমাজের এ বিষম দুর্গতি আর দেখিতে হইত না।

ব্রহ্ম। তাহাইত করিতেছি। ইহা হইতে দেবতা বাহির করিব। অবশ্য উন্নতির প্রক্রিয়া অনুসারে তাহা হইবে, তোমার ইচ্ছামত রাতারাতি হইবে না। সৃষ্টিক্রিয়া আমার শেষ হয় নাই।

জীব। বহু কষ্টে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, জড়ভৌতিক ও পশু-ভাবকে পশ্চাতে ফেলিয়া পরিমামে সেইত তাহাকে দেবত্বে গিয়া উঠিতে হইবে, তবে আর এত ঘোর ফের কেন?

ব্রহ্ম। এই ঘোর ফেরই আমার লীলা। কোন এক মদ্যপায়ী পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ গির্জ্জার ঘড়ির শব্দ শুনিতে পায়। তখন সে পথি-মধ্যে দাঁড়াইয়া অধৈর্য্য চিত্তে এক দুই করিয়া তাহা গুণিতে লাগিল। অবশেষে যখন বারটা বাজিয়া ঘড়ি থামিল, তখন সে বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "এত ক্ষণ বিলম্ব করিলে কেন বাবা! একবারে "বারটা" বাজাই-লেইতো হইত?" তোমার প্রশ্ন কতকটা সেই রূপ। এক দুই তিন ইত্যাদি না হইলে কি বারটা হয়?

জীব। মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "ঠাকুর, আমিও সেই দলের এক জন লোক, মোহমদিরাঘোরে মত্ত। সে কথা যাক, এইরূপই তোমার লীলা তাহা বুঝিলাম। সুতরাং ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। আচ্ছা, এই যে প্রকট লীলা, ইহার ভিতর জীবাত্মার ক্রিয়াই বা কি, আর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ক্রিয়াই বা কি? দেহীর যে সত্ত্ব রজ তমোগুণ ইহা কি কেবল প্রকৃতির গুণ? তাহার সহিত সংযোগে পুরুষের কি এই সকল গুণ কর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে? অবশ্য, প্রকৃতির অবলম্বন বিনা পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার নিজের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কি কিছু নাই?

ব্রহ্ম। "সৃষ্টিকে স্রষ্টা এবং পুরুষকে প্রকৃতি হইতে যদি স্বতন্ত্র করিয়া

বুঝিতে যাও, তাহা হইলে সেই পুরাতন সগুণ নির্গুণ, মায়াসৃষ্ট সত্ত্ব রজ তম ইত্যাদি গুণত্রয় সংক্রান্ত দার্শনিক তত্ত্বের কুটিল আবর্ত্তে অনন্ত গণ্ডগোলের মধ্যে গিয়া পড়িবে, কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ব্রহ্ম, জীব অর্থাৎ পুরুষ, এবং প্রকৃতি, এই তিনের কার্য্য বিভাগ এবং স্বাতন্ত্র্য আছে বটে, কিন্তু তিনই এক অখণ্ড মহাকারণের অভেদাঙ্গ।

জীব। মায়ার আশ্রিতা এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির উৎপত্তি কোথা হইতে? মায়া যদি রজ্জুতে সর্প ভ্রমবৎ অবিদ্যোৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞান হয় এবং তুমি ব্রহ্ম কেবল একমাত্র সত্য, তবে সৃষ্টিলীলা, ভৌতিক ক্রিয়া, এবং ব্যবহারিক মানবজীবন কি দৃষ্টিভ্রমমাত্র?

ব্রহ্ম। আমাকে বিকার হইতে বাঁচাইবার জন্য কেহ ঐ মায়াকে স্বপ্রকাশ নিত্য এবং কেহ বা পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিকে স্বয়ম্ভু রূপে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এ জগৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ মায়াও নহে, স্বয়ম্ভুও নহে; আমার নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার তুলনায় অসৎ, পরিবর্ত্তনশীল এবং ভঙ্গুর, এই মাত্র প্রভেদ। ফলতঃ ইহা আমারই পরাপ্রকৃতি, নিত্য সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রঙ্গভূমির চিত্রিত বিচিত্র পটের ন্যায় আমার নাট্য লীলার জন্য নানা ভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যদিও আমি এই ভৌতিক সৃষ্টির অতীত, কিন্তু আবার ইহার অন্তর্গত সর্ব্বব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি। আমার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব এবং ইচ্ছা শক্তি ভিন্ন ইহার অস্তিত্ব কল্পনা করা নিতান্ত ভুল। মায়া অন্ধশক্তি, তাহার হস্তে এই সুকৌশলসম্পন্ন উন্নতিশীল মহান বিশ্ব কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? মায়া যেমন সৃষ্টিপ্রসূতি নহে, তেমনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিও কোন এক স্বাধীন স্বতন্ত্র সৃজনী বা পালনী শক্তি নহে। আমার সৃষ্টি অনন্ত বিচিত্র, তাহার ক্রিয়াও অতি বিচিত্র, কিন্তু তাই বলিয়া আমি প্রকৃতি বা মনুষ্যের ন্যায় কোন ক্রিয়ার সহিত একীভূত, চঞ্চল বিকারগ্রস্ত কিম্বা কোন বিশেষ অবস্থার অধীন নহি। জীবোপাধি পুরুষও প্রকৃতির একান্ত অধীন নহে। এই যে সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ, এইরূপ শ্রেণীবিভাগও অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ এবং স্থূল। সত্ত্ব আমার জ্ঞান ও অভিপ্রায় প্রকাশক, রজোগুণের লক্ষণ ওজস্বীতা, উদ্যমশীলতা, তেজস্বীতা এবং তমোগুণ আবৃত, অস্ফুট বদ্ধ-

ভাবাপন্ন। আমি পূর্ণ স্বপ্রকাশ, এই তিন গুণের যেমন অতীত, তেমনি অন্তর্গত; কারণ, আমার ইচ্ছা শক্তি ব্যতীত দুইটী পরমাণু এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। যদিও আমি নির্লিপ্ত, কিন্তু আমার লীলাময়ী ইচ্ছাই নিত্য শক্তিরূপে প্রকৃতিকে ভাঙ্গে, গড়ে এবং তাহাকে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত করে।

জীব। জড় জীব, পুরুষ প্রকৃতি, স্রষ্টা সৃষ্টির পার্থক্য যদি বুঝিতে না পারি তাহা হইলে তোমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা জানিব কিরূপে? এবং জড় হইতে জীব, প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে বস্তুতঃ স্বতন্ত্র তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? প্রকৃতির সংসর্গে পুরুষ তাহার গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে, যখন সে সম্পূর্ণরূপে তাহাকে অতিক্রম করিবে তখনই তাহার মুক্তি হইবে, তার পর আর সে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিবে না; আদিতেও সে পুরুষ তোমারই অংশ, সুতরাং ত্রিগুণাতীত ছিল, তবে এই ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই? সকলি মায়ার খেলা? ভূতের লীলা? প্রকৃতির ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া? বিবেক ধর্ম্মজ্ঞান বিশ্বাস ভক্তি নীতির সাধনে তবে সার্থকতা কি? দেহীর যদি প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে কোন কালেইত তাহার মুক্তির সম্ভাবনা দেখি না। পুরুষের কোন মৌলিক অস্তিত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব নাই, মায়াবশতঃ সে আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা মন্তা বোদ্ধা মনে করে; সেই কর্ত্তৃত্ব বোধ চলিয়া গেলেই যদি তার মুক্তি হয়, তবে জীবাত্মার পৃথক্ দায়িত্ব থাকে কৈ? জন্মিবারই বা তাহার প্রয়োজন কি ছিল? কেহ যদি এক জন কর্ত্তা না থাকে, ক্রিয়া ও কর্ম্মকে ব্যবহার করিবে কে? তুমিও নিজে অকর্ত্তা নির্গুণ, নির্লিপ্ত, জীবাত্মাও আদি অন্তে তাই, কেবল মাঝখানে দিন কতক তাহার মায়াপ্রসূত মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভার মায়া আর প্রকৃতির হাতে গিয়া পড়িল। আর তোমাকে সগুণ ক্রিয়াশীল বলিলেই যদি তোমাতে বিকার দোষ আরোপিত হয়, তবে কি তুমি নিষ্ক্রিয় সত্তা মাত্র? স্বরূপ-বিহীন সত্তা বা গুণবিহীন পদার্থ, কর্ম্মহীন শক্তি, কিরূপে থাকিতে পারে? পদার্থ আছে, অথচ গুণ নাই, এ কি কথা? নির্গুণ পদার্থ কিম্বা পদার্থশূন্য গুণ উভয়ইত অসম্ভব মনে হয়?

ব্রহ্ম। স্বরূপ ও সত্তা, কিম্বা পদার্থ এবং গুণ দুই অবিভাজ্য, গুণের দ্বারা পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণীত হয়। প্রত্যেক জীবাত্মা স্বতন্ত্র, তাহার ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারিক জীবনের দায়িত্ব আছে, তাহা হইতে তাহার ধর্ম্ম পুণ্য মুক্তি দেবত্ব আরম্ভ এবং উন্নত হইবে। সৃষ্টি হইতে স্রষ্টা, প্রকৃতি হইতে পুরুষ, গুণ হইতে পদার্থ, জড় হইতে চৈতন্য বিয়োগ বিজ্ঞানের নিয়মে স্বতন্ত্র; অথচ যোগবিজ্ঞানে এক অখণ্ড। আমি এবং আমার সৃষ্টিকার্য্য অদ্ভুত অলৌকিক। উভয়ের যোগ-ক্রিয়াও অদ্ভুত। এই মাত্র কেবল সহজজ্ঞানে বিশ্বাস কর যে, বিশ্বের আদি ও অন্তমধ্যে আমি ওতপ্রোত ভাবে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছি। এত জ্ঞান কৌশল, মঙ্গল অভিপ্রায়, নিয়মনিষ্ঠা কি অবিদ্যা বা মায়ার কার্য্য হইতে পারে? তাহার কেবলমাত্র মোহিনীশক্তি আছে। অবিদ্যার বিদ্যাশক্তি কোথায়? বিশ্বকার্য্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, সৃষ্টি ও মানবলীলাকে যাহারা অবিদ্যোৎপন্ন মায়া বলে তাহারা নিজে এবং তাহাদের বিচার সিদ্ধান্তও তাহা হইলে মায়া।

জীব। আধুনিক জড়বাদমতাবলম্বীরা বলেন, প্রকৃতি হইতে রাসায়নিক ক্রিয়াফলের ন্যায় পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ভৌতিক দেহ ভঙ্গ হইলে জীব অনন্তে মিশিয়া যায়। আত্মচৈতন্যের তবে অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব, অমরত্ব এবং স্বাধীন ক্রিয়া কোথায়?

ব্রহ্ম। চূর্ণ হরিদ্রার মিশ্রযোগফল অথবা অন্য কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার সহিত দেহ আত্মার উপমা করিয়া তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব কেহ কি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে? জড়বাদী বা পরিণামবাদী যদি কোন যুক্তির সাহায্যে ইহা প্রমাণ করে যে জড় হইতেই চৈতন্য, কিন্তু ইহার মর্ম্ম তাহারা কি বুঝিল? জড়ের কোন্ অবস্থায় চৈতন্যের জন্ম হয়, কিরূপে হয়, জড় বস্তুতঃ কি তাহা কেহ বলিতে পারে না, কেবল আন্দাজী একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লয়।

জীব। দেহের জন্ম শৈশব যৌবন এবং বার্দ্ধক্যের সহিত আত্মাও সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দেহের নাশ হইলে আত্মারও আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না, এই সব দেখিয়াই লোকে ঐ রূপ বলে।

ব্রহ্ম। মুখে শুধু বলিলে কি হইবে? দেহের মূল উপাদান গুলি লইয়া তাহা হইতে কেহ আত্মা উৎপন্ন করিতে পারে কি? দেহের

সঙ্গে সঙ্গে এখানে আত্মার জন্ম হয় বটে, কিন্তু তাহার নাশে অমরাত্মার বিবেক বিজ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি লয় পায় না। যাহার সংযোগে বা সাহায্যে যে বস্তুর উৎপত্তি, উন্নতি, তাহার বিয়োগে সে উৎপন্ন বস্তুর বিয়োগ বা ধ্বংস হইবে না। জীবাত্মা দেহের সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়াও ক্রমশঃ বিকসিত হইয়া সে ভৌতিক দেহেন্দ্রিয় এবং বাহ্য প্রকৃতির উপরি ভাগে অধ্যাত্ম জীবনে আমাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবিত থাকে এবং উন্নত হয়। প্রকৃতির সহিত জীবাত্মার যোগক্রিয়া, ভ্রূণের জীবনী শক্তির আশ্রয়ে মনোবুদ্ধি বিবেক বিজ্ঞানের অভ্যুদয় এবং বৃদ্ধি, দেহীর সহিত পঞ্চ ভূতের সম্বন্ধ কীদৃশ, উন্নতির ক্রমবিকাশে ইহারা এক অপরের উপর কত পরিমাণে নির্ভর করে, তাহাদের উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার সীমা কোথায়, এবং জীবাত্মার প্রকৃতিনিরপেক্ষ বিকাশ কোন্ অবস্থায়, এ সমুদয় সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া যাহা ক্রমবিকাশ ইতিহাসের স্তরে স্তরে সংঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কার্য্যকারণসম্বন্ধ মানববুদ্ধির অগম্য। মূলতঃ জড় ও চৈতন্যের স্বরূপ কি, তাহাদের পরস্পর সংযোগ বিয়োগেরই বা ফল কিরূপ, কি গূঢ় প্রণালীতে আমি কার্য্য সম্পন্ন করি, আমি ভিন্ন অন্য কেহ তাহা জানিতে পারে না, পারিবার আবশ্যকতাও নাই। এই মাত্র জানিয়া রাখ যে, জড় চৈতন্য বা পুরুষ প্রকৃতির মূলগত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র স্বভাব আছে; আবার উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ পারস্পারিক অতি নিগূঢ় দুশ্ছেদ্য কার্য্যকারণসম্বন্ধও আছে।

জীবাত্মা অধ্যাত্ম জগতে যখন মহাযোগের গভীরতার মধ্যে অবতরণ করে, প্রেমমহাভাবের উচ্চাকাশে উড্ডীয়মান হয়, এবং যখন প্রত্যাদেশের স্রোতে সে ভাসিতে থাকে, তখন কোথায় বা প্রকৃতি, আর কোথাই বা শরীর! পক্ষান্তরে যত দিন সে দেহকে "অহম্" জ্ঞান করে, ইন্দ্রিয়গ্রামে দেহপুরে, বাসনাপাশে যে পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকে, তত দিন সে প্রকৃতির অধীন। কিন্তু এই স্বপ্নবৎ অনিত্য প্রকৃতি নিত্যজীবনের পরিপোষক এবং পরিচারিকা। ইহার ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান ও ভাব হইতে অতীন্দ্রিয় নিত্যজ্ঞান ও অমরত্ব সঞ্চিত হয়।

জীব নিজ প্রশ্নের গভীরতা অনুভব করিয়া বলিলেন, "দেব, এ

বিষয়ে আর আমার কিছুই বলিবার নাই। আমি যখন দেহরাজ্যে ইন্দ্রিয়-গোচর পঞ্চতন্মাত্রে জীবন ধারণ করিতেছি, দেহ হইতে আত্মার পৃথক্ সত্তা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি না, গূঢ় পরম তত্ত্বের মহিমা সে অবস্থায় কিরূপে বুঝিব? তুমি কি অদৃশ্য কারণপরম্পরা হইতে কি কার্য্য কর তাহা কেবল তুমিই বুঝিতে পার। পণ্ডিতেরা কেবল দার্শনিক মতামত লইয়া চির দিন বৃথা গোলযোগ করিয়া থাকেন। গতানুগতিক ও পল্লবগ্রাহী অজ্ঞ লোক তাই লইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে। অথচ যথার্থ তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না।”

জ্ঞানযোগ—৫ম অধ্যায়।

—০ঃ—ঃ০—

মানবতত্ত্ব।

জীব বলিলেন, “হে ত্রিকালজ্ঞ বিজ্ঞানাত্মা পরম পুরুষ, এই যে বিপুল বিশ্বরাজ্য, ইহার আদ্যন্তমধ্যে যাহা কিছু তৎসমুদয় নখদর্পণের ন্যায় তোমার জ্ঞানদৃষ্টির নিকট প্রতিভাত রহিয়াছে; এক্ষণে মানবজীবনতত্ত্ব এবং তাহার ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত ক্রিয়া বিভাগ কি তাহা আমাকে কিছু শিক্ষা দান কর।”

জীবের শিক্ষানুরাগ দর্শনে প্রসন্নাত্মা সর্ব্বজ্ঞ জগৎগুরু কহিলেন, “মনুষ্যের ভৌতিক শরীর কি কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া বহির্জ্জগতের কোন্ কোন্ উপাদানে সে বর্দ্ধিত রক্ষিত বলিষ্ঠ এবং অন্তিমে তাহাদের বিচ্ছেদে কিরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা শুনিয়াছ। পঞ্চভূতময় দেহ বলিয়াই ইহা প্রচলিত। কিন্তু স্থূল পঞ্চ ভূতের অন্তর্ভূত মৌলিক ভূত অর্থাৎ মূল উপাদান তাহার মধ্যে আরো অনেক গুলি আছে। নিরন্তর তাহাদের সংযোগ বিয়োগে দেহের জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় এবং রূপান্তর হইয়া থাকে। এই নরদেহ এক বিস্তীর্ণ রাজ্যবিশেষ। চর্ম্ম মাংসপেশী শিরা স্নায়ু মেদ মজ্জা

শোণিত নাড়ী অস্থি পঞ্জর হৃৎপিণ্ড প্লীহা যকৃৎ ফুস্‌ফুস্, দশেন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ইত্যাদি বহু অঙ্গে উহা রচিত। অতি সূক্ষ্ম সূত্রবৎ স্নায়ুজালে ইহার অন্তর বাহ্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। 'জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যত সব বাহ্য ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা স্নায়ুযোগে সম্পন্ন হয়। স্নায়ুগুলি যেন ঠিক তড়ি-দ্বার্ত্তাবহ তার, ইহার ভিতর দিয়া মন দৈহিক এবং বাহ্যিক সকল প্রকার অবস্থা এবং ঘটনা স্বভাবতঃ জানিতে পারে। স্থান এবং যন্ত্রভেদে এই স্নায়ু নানাবিধ বোধবিশিষ্ট। শারীরিক এবং মানসিক বহু প্রকার সুখ দুঃখের জ্ঞান ইহারা বাহ্য পদার্থ এবং কল্পনযোগে উৎপাদন এবং বহন করে। আবার আন্তরিক ভাব ও ইচ্ছার উত্তেজনা হইলে তৎসঙ্গে সমপরিমাণে উহা উত্তেজিত হইয়া উঠে। মনের সহিত স্নায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধ এমন ঘনিষ্ঠ এবং সমকালিক যে উভয়ের কার্য্যের আরম্ভ এবং শেষ কোথায় তাহা কেহ ধরিতে পারে না। বাহ্য জ্ঞানের অনুভূতি মাত্র কেবল মনেন্দ্রিয়ের কার্য্য, ইহা দৈহিক জীবনী শক্তির সচেতন ক্রিয়াফল। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত করা ইচ্ছাশক্তিশালী সাধীন পুরুষ কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হয়।

বাহ্যজ্ঞান অনুভবকারী মনের (Perception) ঠিক অব্যবহিত সন্নিধানে বুদ্ধি অবস্থিতি করে, সে মনের অনুভূত বাহ্যজ্ঞান সকলের একের সহিত অপরের সম্বন্ধ, কার্য্যকারিতা, উপযোগীতা, উপমা, যোগাযোগ, ফলাফল বিচারপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক কর্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ কৌশল এবং উপায় প্রণালী বলিয়া দেয়। এইরূপ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াযোগে বাহ্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরস্থ নিদ্রিত জ্ঞানবীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, পরে তাহা হইতে যাবতীয় বিজ্ঞান দর্শনসাধিকা বুদ্ধি পরিপুষ্ট ও মার্জ্জিত হয়। এই বুদ্ধি বাহ্য জ্ঞানের জ্ঞাতা কেবল নহে; মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্বোপরি পারমার্থিক পরম তত্ত্বেরও অভিজ্ঞাতা এবং বিচারক। ইহা সাধারণ এবং ফলাফল বিবেকের নামান্তর। ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ ক্রিয়াশীল পুরুষ দেহরাজ্য এবং মন আত্মা হৃদয় বিবেক ইচ্ছা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা। এই দেহী পুরুষ ইচ্ছাবল দ্বারা আবার আপনাকে নিষ্ক্রিয়ও করিতে পারে। ভাল মন্দ এবং নৈষ্কর্ম্ম, তিনই ইহার হাতে। পুরুষ এই ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় সকল

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপিণী ইচ্ছার সাহায্যে ভোগ বা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। বিবেকাধীন হইয়া ইচ্ছাময় পুরুষ যখন ঐ সমস্ত বিষয় ভোগ করে তখন তাহাকে ধর্ম্মানুগত প্রবৃত্তি বলা যায়। তদ্বিপরীত পথে গেলে কুপ্রবৃত্তি বা পাপ বলিয়া তাহা উক্ত হয়। জীবাত্মাই ইচ্ছাময় পুরুষ বা ব্যক্তি। নিজের উপর তাহার আত্মকর্তৃত্ব আছে; তদ্ব্যতীত সে অনেক সময় বহু পরিমাণে জ্ঞান, ভাব, প্রবৃত্তি ও মনাদি ইন্দ্রিয়ের অধীন। সুতরাং বিজ্ঞান বিবেক বিনা ইনি একটী অন্ধ শক্তিমাত্র। নানাবিধ সদসদ্বাসনা কুবুদ্ধির সাহায্যে ইহাকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতেছে। বিবেক মন্ত্রী এবং বিচার-পতি হইয়া তাহাকে সদসদ্বিষয়ের পার্থক্য জ্ঞান বুঝাইয়া দেন। কিন্তু তাহা করা না করা ইচ্ছাময় পুরুষের স্বাধীন কর্তৃত্বের উপর নির্ভর। তাহার আয়ত্তাধীন স্বার্থপর প্রবৃত্তিপ্রসূত অন্য এক প্রকার জ্ঞানও আছে। সে যাহা হউক, অন্তররাজ্যে বিবেকই এক মাত্র অভ্রান্ত জ্ঞানালোক, বিজ্ঞানবুদ্ধি পথদর্শক, ইচ্ছাময় পুরুষ পথিক; সে তদুভয়ের সহায়তায় গম্য স্থানে বা কর্ম্মক্ষেত্রে পদ সঞ্চালন করে।"

জীব। প্রাচীন কালের কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিতের মতে বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই মনের ভাবমাত্র। এক পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্গত মহাসত্তা সেতুস্বরূপ হইয়া অন্তরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারই সাক্ষাৎ যোগে বাহ্য ও আন্তরিক জ্ঞান সকল সঞ্চারিত হয়, তদ্ভিন্ন দুই স্বতন্ত্র যে আত্ম ও অনাত্ম, বাহ্য এবং আভ্যন্তরীন্ বিষয় তদুভয়ের যোগক্রিয়া সম্পাদনের অন্য উপায় নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, জড় উদ্ভিদ্ জীব প্রত্যেকের ভিতর ব্যক্তিত্বের আত্মজ্ঞান আছে, এবং এক সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আত্মজ্ঞানেরই তাহা প্রতিবিম্ব। আধুনিক প্রত্যক্ষবাদীরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা ভিন্ন অন্য অদৃশ্য কারণ কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক মনুষ্য এবং মনুষ্য জাতি ধর্ম্মতত্ত্ব, মনোতত্ত্ব সোপান অতিক্রম করিয়া পরিশেষে প্রত্যক্ষবাদতত্ত্বে উপনীত হয়। মানবের ঐতিহাসিক বিকাশ বা সামাজিক বিজ্ঞানকেই তাঁহারা জ্ঞানোন্নতির চরমাবস্থা বলেন।

ব্রহ্ম। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন ও আধুনিক জ্ঞানীদিগের নানাবিধ মতামত আছে তাহার বিচারে কোন ফল নাই। মূলেতে জীব ও জড় সত্তার অন্তরালে

আমি প্রাণরূপে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছি, ইহা সত্য। কিন্তু ব্যষ্টিগত ভাবে জড়ের সহিত চৈতন্যের যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াযোগ তাহা অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন। জড়ের ভিতর স্থূল সূক্ষ্ম বহুল অবস্থাভেদও আছে, চৈতন্যের মধ্যেও আছে। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ, জল মৃত্তিকা, আলোক উত্তাপ শৈত্য, বায়ু বিদ্যুৎ ইথার ম্যাগ্‌নিটিজম্‌, গতি শক্তি, আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং জীবনী ইত্যাদি দৃশ্যাদৃশ্য বিষয়ের সহিত দেহান্তর্গত ঐ সকল পদার্থ এবং শক্তির অতীব নিগূঢ় সম্বন্ধ অবস্থিতি করিতেছে। কতক সজ্ঞানে, কতক অজ্ঞানে ইহাদের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। হৃদয় মন জ্ঞান বিবেকের সঙ্গে আবার উহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ। ভৌতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক তিনটী রাজ্য এক সূত্রে গাঁথা। দেহী পুরুষ ইহাদের কর্ত্তা হইয়া আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে নিজদায়িত্বভার বহন করে।

জীব। বিবেক যদি তোমার অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রতিনিধি হয়, তবে উহা কি নিত্য পূর্ণ একটী স্বাধীন শক্তি, না ক্রমবিকাশপ্রণালীর অন্তর্গত?

ব্রহ্ম। অবশ্য ইহারও শৈশব, যৌবন ও পরিণতাবস্থা আছে। মনুষ্যের অন্যান্য জ্ঞান বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিকসিত এবং মার্জ্জিত হইতেছে; বহুদর্শন এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আরো হইবে। প্রকৃতার্থে ইহাকে সার দিব্যজ্ঞান কহা যায়।

জীব। অনেকানেক পণ্ডিতের মতে ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা, লাভ ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ক বহুদর্শনের ফল এই সদসদ্‌জ্ঞান বিবেক। ইহা মনুষ্যসৃষ্টির আদিমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাতি-সাধারণের পরীক্ষিত একটী ফলাফল জ্ঞান। যে দিকে স্বার্থ সেই দিকে বিবেকবুদ্ধি।

ব্রহ্ম। যদিও কার্য্য অনেক স্থলে পরিশেষে কারণরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে তাহার মূল কারণবীজ থাকে। সার্ব্বভৌমিক মূল নীতি এবং আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ মূল জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাস বহুদর্শন দ্বারা অবশ্য পরিমার্জ্জিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং হইবে। ফলাফলদর্শন বা পরীক্ষিত জ্ঞান যদিও এ সকলের উন্নতির পরম সহায়, তথাপি তাহা নিত্য কারণরূপে উহাদিগকে সর্ব্বথা কার্য্যে প্রবৃত্ত করে না। লাভ ক্ষতি, সুবিধা অসুবিধা, যদি

বিবেকের জনয়িত্রী হইত, তাহা হইলে ধর্ম্ম নীতির নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়তা থাকিত না। সত্য বটে, বিবেকাদিষ্ট কর্ত্তব্যের পরিণামফল মঙ্গল ভিন্ন আর কিছু নহে, কিন্তু সে মঙ্গল সুখ সুবিধানিরপেক্ষ, নিত্যশান্তিপ্রদ। প্রচলিত সার্ব্বভৌমিক নৈতিক জ্ঞান ব্যতীত সাক্ষাৎ প্রত্যাদিষ্ট অভিনব দিব্যজ্ঞানও বিবেক দ্বারা অনেক প্রকাশিত হয়। তাহা ব্রহ্মবাণী বা বেদবাণী বলিয়া জানিবে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ এবং ভবিষ্যদ্বক্তা মহাজনেরা সেই জ্ঞানে পৃথিবীতে যুগপ্রলয় সংঘটন করেন।

জীব। বিবেকের লক্ষণ এবং নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কি তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিষয় আমাকে শিক্ষা দান কর।

ব্রহ্ম। পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা যখন বিবেক দ্বারা চক্ষুষ্মান্ হন তখন তাঁহার বুদ্ধি ইচ্ছা হৃদয়, স্মৃতি ও শক্তি ক্ষমতা এবং তৎসঙ্গে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়গণ আমার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয়; অন্যথা সমস্ত অন্ধকার, স্বেচ্ছাচার, অন্ধতা, উন্মত্ততা। প্রেম স্নেহ দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি হৃদয়ের গুণনিচয় স্ব স্ব বিষয়ের সহযোগে এবং সংঘর্ষণে স্বভাবতঃ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, বিবেক তদ্বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া দেয়, বুদ্ধি দেশকালপাত্র, এবং কার্য্যপ্রণালী স্থির করে, ইচ্ছা তাহা দেহেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাধন করে। ইচ্ছাশক্তি এক অর্থে হৃদয়ের দাস, বিবেক ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে শাসন নিয়মে রাখিতে পারে না; আবার অন্য এক অর্থে সে দেহযন্ত্রের পরিচালক শক্তি ও যন্ত্রী, অন্তর্জ্জগতের তত্ত্বানুসন্ধান, চিন্তা ও বিচারকার্য্যের প্রবর্ত্তক এবং সংরক্ষক। অনেকানেক জ্ঞান এবং ভাব যদিও ইচ্ছানিরপেক্ষ, কিন্তু তাহাদের পোষণ, পরিবর্জ্জন কিম্বা ব্যবহার ক্রিয়া ইচ্ছাসাপেক্ষ। ইচ্ছার গতিশক্তি অন্ধ, অথচ সে স্বাধীন; ইচ্ছা করিলে আপনাকে আপনি সে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। সে যেন দ্বিধারবিশিষ্ট অসি। বিভিন্নাবস্থায় তাহার বিভিন্ন পরিমাণ আছে। কোন স্বার্থ বা প্রবৃত্তি যখন ঘনীভূত হয় তখন ইহার শক্তির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞান বিশ্বাস অনুরাগের প্রগাঢ়তা অনুসারে ইহার কার্য্য-শক্তির প্রাবল্য বা দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। কার্য্যে পরিণত না হইলে কোন একটি ইচ্ছার শক্তিমাহাত্ম্য বুঝা যায় না। আমার যোগে সজ্ঞানে যখন

ইচ্ছা কার্য্য করে তখন পর্ব্বত সমান বাধা বিঘ্নও ইহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় তথাপি ইচ্ছার বেগ প্রশমিত হয় না। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি নীচ বাসনার হাতে পড়িলে ইহা আবার নরকের দিকে তেমনি বেগে গমন করে। যদিও পরিণামে ধাক্কা খাইয়া শেষ ফিরিয়া আসিতে হয়, তথাপি পাপেচ্ছারও বল বিক্রম আপাততঃ অতি ভয়ঙ্কর। শরীর ইন্দ্রিয়, পার্থিব রূপ রস গন্ধ, এক সময় ইহার প্রভু এবং অন্য সময় ইহার যন্ত্রবৎ দাস। বিবেকী পুরুষ বিজ্ঞানবলে ইচ্ছার সাহায্যে ধরাতলে স্বর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

স্মরণশক্তি একটী আশ্চর্য্য জ্ঞানভাণ্ডার, পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞান সংস্কার এবং সুবহু ঐতিহাসিক ঘটনারাজী শব্দ শ্লোক গাথা লইয়া সে সর্ব্বদা জাগিয়া আছে; যখন কোন প্রয়োজনীয় কথা বা ঘটনা, জ্ঞান কিম্বা ভাবের আবশ্যকতা হয় তখন ইচ্ছাই তাহার ভিতর হইতে সে সকল খুঁজিয়া বাহির করে। অনেক সময় ভাবযোগের নিয়মে (একটা কোন বিষয় স্মরণ হইলে তৎসঙ্গে গ্রথিত দেশকালপাত্র সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ ঘটনাশৃঙ্খল মনে আসার নাম) স্মরণশক্তি সমুজ্জ্বলিত হয়। সৎজ্ঞান, সচ্চিন্তা, সৎকথা যত্নপূর্ব্বক এই ভাণ্ডারে রাখিলে কাজের সময় তাহা পাওয়া যায়। ভূত কালের সঙ্গে ইহার বিশেষ যোগ। ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানে ইহা জীবাত্মার পরম সহায়। বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, তপস্যা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় যদি স্মৃতিশক্তি জাগিয়া না থাকে। এই স্মৃতিই নিত্য চৈতন্য। আমি সর্ব্বদা সঙ্গে আছি, সর্ব্বজ্ঞরূপে সব জানিতেছি, ইহা ভুলিয়া গেলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম সব বিনষ্ট হইয়া যায়।

কল্পনা একটী শক্তি। ইহা পরিজ্ঞাত শ্রুত ও দৃষ্ট বিষয়কে নানাবর্ণ এবং অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া আপনার বাসনানুরূপ গড়িয়া তুলিতে পারে। দূরকে নিকট, ভূত ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমান, স্বর্গকে নরক, নরকের ভিতর আবার স্বর্গ রচনা, সমস্তই কল্পনার কুহক। বিশ্বাসগত অভ্রান্ত সত্যের পূর্ণ বিকাশও ইহা দেখিতে পায়। অনেক অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক আদর্শ বিষয় ইহা নির্ম্মাণ করিতে পারে। মানবাত্মা কল্পনার সাহায্যে কখন পশু কখন বা দেবতা হয়।

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেব, দেহ মন আত্মা তিনের পরস্পর যোগ, একের সহিত অপরের সম্বন্ধ, এবং তাহার পরিণাম ফল কি প্রকার?

ব্রহ্ম। প্রাগুক্ত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিতে একটী পূর্ণাবয়ব মানবদেহ। তাহারা এক শোণিত, এক জীবনী শক্তিতে জীবিত থাকিয়া এক অপরকে পরিপোষণ করে, এবং দেহীর ইচ্ছামাত্র নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই দৈহিক জ্ঞানেন্দ্রিয়, বহির্জ্জগৎ এবং আত্মচৈতন্য তিনে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তায় আমার পরোক্ষ কর্ত্তৃত্বাধীনে বহুবিধ জ্ঞান উপার্জ্জন ও কর্ত্তব্য সাধন করে। ইহা ভিন্ন অন্য আর এক প্রকার জ্ঞানপ্রস্রবণ আছে তাহা আমার প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বে উন্মুক্ত হয়। দেহের কোন পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই; ইন্দ্রিয়াদি যোগে যে পাপ বা পুণ্য কর্ম্ম কৃত হয় তাহার জন্য কোন ইন্দ্রিয় দোষী কিম্বা প্রশংসার্হ হয় না। বাহ্য বিষয়ের সংযোগে ইহাদিগের যে কার্য্য হয় মন তাহার সংবাদ মাত্র কেবল জানিতে পারে, কিন্তু সেও তজ্জন্য নিন্দনীয় বা প্রশংসার্হ নহে। বুদ্ধি সেই বাহ্য জ্ঞানের তত্ত্ব অবগত হইয়া বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; সেই বিজ্ঞান সুতীব্র বিবেকালোকে অনুরঞ্জিত হইলে তখন পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা। এ জন্য ইচ্ছাময় বিবেকী দেহী কেবল দায়ী, আর কেহ নহে।

এই মানবদেহ যে যে উপাদানে গঠিত বাহ্য জগতে জল বাতাস মৃত্তিকা এবং উত্তাপের মধ্যেও সেই সকল উপাদান আছে। পান ভোজন, নিশ্বাস প্রশ্বাস, পরিশ্রম, নিদ্রাদি ক্রিয়াযোগে যত দিন মৃত্যুমুখে ধাবিত দেহের সহিত বহির্জ্জগতের সমতা রক্ষা পায় ততদিন দৈহিক জীবন; তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই স্বাস্থ্যক্ষয়, তাহা পূরণ না হইলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। এক যোগে, এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইন্দ্রিয়গণ এক জনের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করে।

ইন্দ্রিয়দিগকে রিপুও বলে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ষড় রিপুর উহারা কার্য্যসাধক যন্ত্র। এই রিপু বা প্রবৃত্তি ছয়টী নিরাকার, ইন্দ্রিয়গণ সাকার; কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা ছয় জন নহে, এক জন; এবং শত্রুও নহে, মিত্র। অবৈধ বাসনা বা প্রবৃত্তি চরিতার্থজন্য যখন দেহী নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হয় তখন উহারা গৃহশত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এই

রিপুগণ এক পরিবারের অন্তর্গত, প্রতি জন প্রতি জনের সৎ বা অসৎ, বৈধ কিম্বা অবৈধ, পরিমিত বা অপরিমিত আচরণের সহায়। বাসনা এবং প্রবৃত্তির উদয় মাত্রে ইহারা ইচ্ছাসাহায্যে স্ব স্ব বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করে। বিজ্ঞান বিবেক যদি তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকে, ইচ্ছা আর তজ্জন্য অপেক্ষা করে না; কিন্তু যদি সে উভয় কর্ত্তৃক বাধা পায়, তাহা হইলে আর অগ্রসর হয় না। একবার প্রবৃত্তির অধীনে সে কার্য্য আরম্ভ করিলে সারথীবিহীন বাষ্পীয় যন্ত্র অথবা বেগগামী অশ্বের ন্যায় যেন দৌড়িতে থাকে। স্মৃতি, বুদ্ধি, বিজ্ঞান বিবেক সকলে মিলিয়া যখন তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় তখন ক্রমে ক্রমে তাহার গতি স্থগিদ হয়। কিন্তু তখন বাসনা প্রবৃত্তির রাগ অভিমান বিলাপ আর্ত্তনাদের আর অবধি থাকে না। অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহারা বালকের ন্যায় কান্না কাটি করে, গালাগালি শাপ দেয়, তার পর আপনিই থামে, এবং ক্রমে ভুলিয়া যায়। কোন একটা প্রবৃত্তি বিশেষতঃ প্রগাঢ় স্বার্থপ্রণোদিত উত্তেজিত প্রবৃত্তি এবং তাহার ইন্দ্রিয়ক্রিয়া, দুয়ের মাঝ খানে এত কম সময় থাকে যে অনেক সময় সে কালমধ্যে বিবেক বিজ্ঞান ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না। তাহারা আসিতে না আসিতে তৎকালমধ্যে কত দাঙ্গা ফসাদ খুন জখম পর্য্যন্ত হইয়া যায়। চকিতের মধ্যে প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় ইচ্ছাযোগে অর্থাৎ কার্য্যযোগে একাকার মূর্ত্তি ধারণ করে। ইচ্ছার সমগ্র বলকে সেই সময় শান্তি ও পবিত্রতার পথে মহাবেগে পরিচালিত করিতে না পারিলে পুরুষের পুরুষকার রক্ষা পায় না; তখন তিনি বন্দীর ন্যায় নিতান্ত অপদার্থ এবং অবস্থার অধীন হইয়া পড়েন।

অতঃপর সদ্‌গুরু পরব্রহ্ম অলৌকিক স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মানব-জীবন চারিতলা অট্টালিকার ন্যায়। প্রথম তলে বিষয়বেষ্টিত দেহেন্দ্রিয়, মন সেখান হইতে বাহ্যজ্ঞান সংগ্রহপূর্ব্বক দ্বিতলবাসী বুদ্ধিকে তাহা দেয়, বুদ্ধি সেই গুলিকে সংযোগ বিয়োগ, নিয়ম, কার্য্যকারণ, ফলাফল বিচার চিন্তাসহ সজ্জিত করিয়া তৃতলস্থ বিজ্ঞানবিবেকের হস্তে অর্পণ করে, পরিশেষে অবিদ্যাবরণমুক্ত দেহী পুরুষ তৎসমুদয়ের সার যে ভগবদ্ভক্তি

বিশ্বাস, প্রেম পুণ্য এবং তজ্জনিত নিত্য শান্তি তাহা সম্ভোগ করত ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় প্রকৃতির উপর পুরুষের একাধিপত্য। প্রথমোক্ত তিন অবস্থা মরণধর্ম্মশীল, চতুর্থ অবস্থা অক্ষয় অমর। এই অমরত্ব লাভের জন্য তুমি কর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগ সাধন কর।"

জীব। মনের অনুভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য ব্যাপারেই কি বুদ্ধির সমস্ত কার্য্য পর্য্যবসিত হয়?

ব্রহ্ম। না, প্রকাণ্ড অন্তর্জ্জগৎ, ব্রহ্মজগতও তাহার অধিকৃত। বাহিরের দৃশ্য স্পৃশ্য শ্রুত আঘ্রাত ঘটনার মধ্যে সে যেমন সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম এবং তাহাদের একের সহিত অপরের সম্বন্ধ এবং কার্য্যোপযোগিতা নির্দ্ধারণ করে, তেমনি মনের সহিত জড় উদ্ভিদ প্রাণীর, ও আপনার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। কেবল তাহাই নহে; অধ্যাত্ম এবং ব্রহ্মতত্ত্বের অনন্ত গভীরতার মধ্যে অবতরণ করিয়া তথায় যে সকল ঘটনারাজী বা ক্রিয়া সমুৎপন্ন হইতেছে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, জীবব্রহ্মের প্রভেদ এবং একতা, হৃদয়ের ভাব, বিবেকের আদেশ, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজজ্ঞান এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, দেশকালপাত্র সম্বন্ধে কর্ত্তব্য, এবং এই সমস্ত বিষয়ের অন্তর্গত অভ্রান্ত সাধারণ নিয়ম সমস্তই বুদ্ধির অধিকৃত বিষয়। চিন্তা ইহার এক প্রধান সহায়। কিন্তু আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সহজ ও সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানধর্ম্মনীতি যথা—তুমি, আমি, জগৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ভালমন্দ, ন্যায়ান্যায়ের মৌলিক প্রভেদ ভূমিতে যদি বুদ্ধি না দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে অন্ধভাবে যুক্তি বিচার ও অসীম তর্কতরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়, কিছুরই মীমাংসা করিতে পারে না। অতএব যেমন ইচ্ছা, তেমনি বুদ্ধি, উভয় শক্তিই পুরুষের নিত্য সঙ্গিনী।

জীব বলিলেন, "ঠাকুর, দেহী পুরুষের উপর যে তুমি সকল দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিলে এবং তাহাকেই সকলের কর্ত্তা বলিলে, কিন্তু তাহার তো পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। প্রকৃতির উপর তাহার কর্তৃত্ব থাকিলেও সে তাহার সম্পূর্ণ প্রভু নহে। প্রবৃত্তি এবং বাহিরে তাহার ভোগ্য বিষয়নিচয়, এবং নিজের স্বাভাবিক অভাব দুর্ব্বলতা তাহাকে প্রতি পদে প্রকৃতির অধীন করিয়া ফেলে। কার্য্যকালে স্বাধীনতা অপেক্ষা তাহার অনতিক্রম্য বাধ্যতাই তো অধিক দেখিতে পাই?"

ব্রহ্ম স্বর্গীয় বাণীতে তাহার এই উত্তর দিলেন যে, "পুরুষের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই সে পৃথিবীতে জন্মিয়া স্বর্গেরদিকে উত্থিত হয় এবং তথায় সে নিত্য কাল অমরত্ব ভোগ করে। প্রাকৃতিক অবস্থা সকল যতই কেন তাহার গতিরোধ করুক না, জীবাত্মার ভিতরে এমন এক আত্মসংশোধিনী দেবশক্তি আমি নিহিত করিয়া রাখিয়াছি, যে শক্তি প্রভাবে যাবতীয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে উর্দ্ধে অনন্ত উন্নতির সোপানে আমার অভিমুখে নিরন্তর অগ্রসর হইবে। আদিমাবস্থার পশু সমান অসভ্য লোকদিগের সহিত বর্ত্তমান সভ্য জ্ঞানী ভদ্র সাধুসমাজের তুলনা করিলে কি দেখিতে পাও? স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ কি নয়? কিন্তু কিরূপে কে ইহা সম্পাদন করিল? অন্তর নিহিত ঐ অমর শক্তি!"

জ্ঞানযোগ—৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ।

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সর্ব্বাত্মা অনন্ত গুণাকর হরি, আত্মা অতীন্দ্রিয় স্বতন্ত্র একটী জ্ঞান পদার্থ, দেহ এবং ভৌতিক জগৎ সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অনাত্ম অচেতন পদার্থ, অথচ দুইয়ের কার্য্যগত সম্বন্ধ এমনি ঘনিষ্ঠ যে মনে হয়, একের অভাবে অপরের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। শারীরিক জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য এবং তাহার শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ, আরাম ব্যারাম তৃপ্তি ও অভাববোধ ক্রিয়াগুলি যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? জীবাত্মা পরমাত্মজাত দেহাতীত, কিন্তু একটু জল বাতাস এবং উত্তাপ ও খাদ্যের উপর বড় বড় বিজ্ঞানী পণ্ডিতের জ্ঞান, মহাযোগীর গভীর যোগধ্যান, ভক্তের ভাবরস সমস্ত নির্ভর করিতেছে। আমরা সুখ দুঃখ, শান্তি তৃপ্তি, আনন্দ বিষাদ, যাহা কিছু অনুভব করি

তাহার কত টুকু শরীরসংক্রান্ত আর কত টুকুই বা আত্মার নিজের তাহার পার্থক্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহাকে আধ্যাত্মিক বলি তাহাও দেখি বহু পরিমাণে শারীরিক। উত্তমরূপ আহার নিদ্রা বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্য সম্ভোগ হইলেই "আঃ!" শব্দ মুখে বাহির হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই মহা আর্ত্তনাদ। পীড়ার সময় সামান্য কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগ ঔষধের গুণে নবজীবন পাই, তদভাবে মৃতপ্রায় হই। ক্ষুধা তৃষ্ণার কালে তেমনি ভোজ্য পানীয় প্রাণদান করে, তাহার অভাব ঘটিলে শরীরের সহিত আত্মাও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। এ সমস্তই তো শারীরিক ব্যাপার দেখিতেছি, আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব শক্তি তবে আর রহিল কৈ? দেহের স্বাস্থ্যবল ও জীবনীশক্তিই কি তবে সর্ব্বস্ব? ফলতঃ আমরা দেহ লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকি।"

ব্রহ্ম। জ্ঞানযোগ সিদ্ধির অবস্থায় যখন আধ্যাত্মিক বল বীর্য্য সমধিক সঞ্চিত হইবে তখন দুয়ের পৃথকত্ব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। আত্মার এক স্বাধীন রাজ্য আছে, তথায় তাহার আধ্যাত্মিক বৃত্তির জ্ঞানবলক্রিয়া লক্ষিত হয়। এখানেও কি তাহার স্বাধীন ক্রিয়া কিছু দেখিতে পাও না? অন্তরে শান্তি না থাকিলে দৈহিক সুখ সাস্থ্যের চরম উন্নতির অবস্থাতেও সুখশয্যা কেন কণ্টকশয্যা মনে হয়? বহু মূল্য বস্ত্রালঙ্কার, প্রচুর মানসম্ভ্রম, ভোগ্য পদার্থ অবস্থাবিশেষে কেন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে? পক্ষান্তরে শান্তচিত্ত যোগী অনাহার অর্দ্ধাহারে বৃক্ষতলে বসিয়া কেনই বা এত সুখী? দীন দরিদ্র কৃষক শ্রমজীবী সামান্য শাকান্নে কেন এত সন্তুষ্ট? আমার কার্য্যের গতি অতি সূক্ষ্ম এবং তাহা কুটিল রহস্যে আবৃত। আত্মার স্বাধীনতা কি প্রচণ্ড, এবং পরাক্রম কেমন দুর্জ্জয়, তাহা যদি জানিতে চাও, তবে প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির উপর স্বীয় ইচ্ছাবলের কর্ত্তৃত্ব শক্তি বৃদ্ধি কর। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-বর্জ্জিত বিদেহ আত্মার প্রভাব চিন্ময় রাজ্যে, বিজ্ঞান বিবেকের সাহায্যে তথায় সে চির উন্নতি লাভ করিবে। ঐহিক জীবন বহু পরিমাণে দৈহিক, তাহার সুখ স্বাস্থ্যের জন্য তাই আমি এতাধিক আয়োজনও করিয়া রাখিয়াছি। সমস্ত বিশ্বই শরীরের সেবক। অনুকূল প্রকৃতি, সুস্থ দেহ এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে আধ্যাত্মিক যোগবল এখন তুমি

সঞ্চয় কর, পরে যখন যে অবস্থা ঘটিবে তাহার অনুরূপ নিয়ম ব্যবস্থিত আছে। বিদেহ আত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব এখন দেহবাসী হইয়া সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবে না।

জীব। তথাপি সামান্য জ্ঞানালোকে যত টুকু সে বিষয় বুঝিতে পারি তাহা বুঝাইয়া অধ্যাত্ম বিষয়ে আমার লোভ উদ্দীপন কর। নশ্বর দেহসর্ব্বস্ব হইয়া আর আমি কত কাল ইন্দ্রিয়গ্রামে থাকিব ?

ব্রহ্ম। এ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য তোমার যে ঈদৃশ পিপাসা জন্মিয়াছে ইহা অতি শুভ লক্ষণ। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হউক! দেহ এবং আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা বলিতেছি তবে শ্রবণ কর।

মানবজীবন পাঁচ ভাগে বিভক্ত। (১) জড়াংশ। তেজ বায়ু জল মৃত্তিকাদির উপর তাহার পরিপোষণ নির্ভর করে। স্বভাবের নিয়মে প্রথমে অজ্ঞাতসারে, পরে সজ্ঞানে উহা নির্ব্বাহিত হয়। (২) জৈবাংশ। উদ্ভিদ্ এবং ইতর প্রাণীর সহিত ইহা এক ভাবাপন্ন। (৩) পশু ভাব। পশুজগতের মধ্যে আত্মপোষণ, অপত্যস্নেহ এবং বংশবিস্তার সম্বন্ধে যে সকল পাশব সংস্কার এবং অলঙ্ঘ্য নিয়ম অতিশয় প্রবল, মানুষের মধ্যেও তাহা আছে এবং তাহা অতিশয় প্রবলও বটে। (৪) মানসিক শক্তি। এই স্থান হইতে পশুর সহিত মানবের গভীর প্রভেদ। প্রথমা-বস্থায় যদিও উভয়ের মধ্যে কোন কোন শক্তি এবং বৃত্তির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু শেষে আর কিছুই দেখা যায় না। মানব মনের উন্নতি অনন্ত। নরশিশু যখন হাসিতে এবং কথা কহিতে শিখিল, তখনই বুঝা গেল সে একটী অন্য জাতীয় জন্তু। (৫) আধ্যাত্মিক দেবভাব। ইহা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের অধিকৃত। নীতি প্রীতি, শ্রদ্ধা ভক্তি, দয়া প্রেম, বিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদি উপাদানে আমার স্বরূপগর্ভে জন্মিয়া আমাতেই তাহা অনন্ত কাল পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সে জীবন আমার আত্মজাত এবং প্রতিকৃতি স্বরূপ; শরীরযোগে এখন ক্রিয়াশীল। মর্ত্ত্যলোকে শরীর তাহার প্রধান সহায় এবং এক প্রকার অঙ্গীভূত।

জীব। প্রথম চারিটী বিভাগের যে উদ্দেশ্য তাহা প্রকৃতি এবং শরীর-

সাহায্যে যথাযথরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে দেখিতে পাই, কিন্তু দেবাংশের বিকাশ তেমন কৈ? যাহা কিছু দেখি তাহাও সীমাবদ্ধ।

ব্রহ্ম। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষাভাবে দেবাংশের উন্নতি এখানে সচরাচর অধিক দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহার বীজ অমর। যে পরিমাণে সাধন করিবে সেই পরিমাণে ফল পাইবে। ভবিষ্যতে তাহা যাহাতে অঙ্কুরিত হয় এমন ব্যবস্থা আমি করিয়া রাখিয়াছি। দৈহিক জীবনের কয়েকটা বৎসর মানুষের শেষ সীমা নহে। ভগ্ন রুগ্ন দেহ যখন আত্মার বাসের অনুপযোগী হইবে তখন আত্মা মাতৃগর্ভস্থ শিশুর ন্যায় নীরবে কিছু কাল ঘুমাইয়া থাকিবে, অনন্তর যথা সময়ে পুনরায় সে জাগিয়া চৈতন্যরাজ্যে বিচরণ করিবে।

জীব। অবশ্য ভবিষ্যতে তাহার উন্নতির জন্য তুমি যে বিধান করিয়া রাখিয়াছ তদনুসারে কার্য্য হইবে, কিন্তু এখানে অধিকাংশের দেবজীবন আরম্ভই হয় না। জীবনপোষণ, এবং আত্মোৎপাদন এই যে দুইটী স্বতঃ-প্রবৃত্ত অনতিক্রম্য নিয়ম, ইহার শাসনে প্রায় সমস্ত জীবনই ফুরাইয়া যায়। মানবের ইচ্ছা জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির জন্য উহা অপেক্ষা করে না। জীবন-সংগ্রামে উন্মত্ত নরনারী দেহরক্ষা এবং বংশবিস্তারের জন্যই যেন ভবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রহ্ম। প্রজাপ্রবাহ রক্ষা এবং তাহার আশ্রয়ে আত্মোন্নতি, এই নিমিত্ত ঐ দুইটী বিশ্বপালক নিয়মের গর্ভেই ভাবী উন্নতির যাবতীয় বীজশক্তি আমি নিহিত রাখিয়াছি। প্রথমে স্বভাবের ভূমিতে নৈসর্গিক নিয়মে অজ্ঞাতসারে বিনাচেষ্টা এবং বিনাবিচারে উহা অঙ্কুরিত হয়, পরে যত্ন ও উৎকর্ষসাপেক্ষ।

জীব। মনুষ্য প্রকৃতি এবং অবস্থার অধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পরে অভ্যাসচক্রে চিরদিন অবশভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়; সেই ভাবেই তাহার অবশিষ্ট-কাল অতিবাহিত হয়। শিশু জন্মিবামাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সেই যে কাঁদিয়া উঠিল, তাহা আর থামিল না। তদনন্তর বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাকে শারীরিক অভাব মোচনের জন্যই কেবল সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। যৌবন ও স্বাস্থ্য বলের অবশ্যম্ভাবী ফল আবার পুনরুৎপাদন। যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে ভাবীবংশের দেহপোষণভার তাহার মস্তকে

চাপিয়া পড়ে। তাহার পর দেখিতে দেখিতে জরা বার্দ্ধক্য মৃত্যু আসিয়া ইহ জীবনের লীলা শেষ করিয়া দেয়। সুতরাং তাহার অধ্যাত্ম দেবজীবন বিকাশের অবসর কোথায়? কার্য্যতঃ তাই জীবের সুখ দুঃখ ভাল মন্দ এমন কি, ধর্ম্মাধর্ম্ম পর্য্যন্ত শরীরসংক্রান্ত বিষয়েই আবদ্ধ রহিয়াছে। কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা বলি, "ভাল আছি, অথবা ভাল নাই।" নিজের এবং আত্মীয় জনের দৈহিক সুখ দুঃখের প্রতি চাহিয়াই আমরা ঐ কথা বলি। বাল্যকাল হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত পরিবার, অভিভাবক এবং জনসমাজের সাহায্যে ঐ জ্ঞানটী মাত্র আমরা শিক্ষা পাই।

ব্রহ্ম। দেহসংক্রান্ত প্রাগুক্ত সর্ব্বজনীন নিয়মদ্বয়ের অভ্যন্তরে অমরাত্মা দেবশিশু ঘুমাইয়া থাকে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে যথার্থ ভাবে জীবনপোষণ, আত্মোৎপাদন, এবং সন্তান পালনার্থ পরার্থপরতা শিক্ষা হয় না। এ সম্বন্ধে কেবল মনুষ্যই দায়ী। প্রথমে মাতৃত্ব শক্তির ভিতরে দেবজীবনের আরম্ভ; তাহা হইতে সামাজিক মিলন সংঘর্ষণে ক্রমে নৈতিক দায়িত্ব, আত্মত্যাগ; পরিশেষে ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা পবিত্রতা ইত্যাদি উচ্চতর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সদ্যোজাত শিশু স্বর্গদূতের ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী পুরুষকে দাম্পত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে। মাংসপিণ্ডবৎ নরশিশুর কি মহিমা দেখ! মাতার মাতৃত্বেরও সে জন্মদাতা। কারণ, সন্তানত্ব হইতেই মাতৃত্বের বিকাশ। সন্তানবিহীনা নারী অপত্যস্নেহের মাধুরী কি তাহা জানে না। অবিবাহিত নরনারী স্বার্থপর আত্মম্ভরী, নিজের সুখ স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছু তাহারা বুঝিত না, ভাল সামগ্রী পাইলে একা আপনি তাহা খাইয়া ফেলিত। পরে যাই তাহাদের সন্তান জন্মিল, তখন আর ভাল সামগ্রী নিজে খাইতে পারে না, অন্যকে ভাগ করিয়া দেয়। পরিশেষে সমস্ত দিয়া আপনি কোনরূপে দিনপাত করে।

জীব। আহা! দয়াময়, কি তোমার চমৎকার কৌশল। অসহায় শিশুই বাস্তবিক প্রথম গুরু বটে। তাহার সুন্দর সুকোমল তনু খানি যেন ধর্ম্ম-নীতির মূর্ত্তিমান ছবি। তাই প্রেমিক কবি মহর্ষি যিশু শিশু সন্তানকে এত আদর সম্মান করিতেন। শিশুত্ব এবং মাতৃত্ব এই দুইটী বিশ্ববিজয়িনী

স্নেহময়ী ধর্ম্মশক্তির মাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে? উদ্ভিদ্ এবং ইতর প্রাণীর মধ্যেও এই পরার্থপরতা নীতি এবং আত্মত্যাগের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। তাহারা স্ব স্ব জাতীয় ভাবীবংশের জন্য আত্মপ্রাণ হারায়।

ব্রহ্ম। সৃষ্টির মূল উপাদানের অভ্যন্তরে মঙ্গলসঙ্কল্প রূপে উহার বীজ আমি নিহিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু মনুষ্যমাতা হইতেই এই পরার্থপরতা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে ওষধি বনস্পতির প্রাণে এবং পাশব সংস্কারের সহিত উহা মিশ্রিত ছিল। সন্তানের প্রতি মমতা বশতঃ অবিবাহিত আদিম নরনারী উদ্বাহবন্ধনে চিরবদ্ধ দম্পতীর ন্যায় এক সঙ্গে ঘরকন্না করিতে শিখিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহারা পশু সমান এবং যাযাবরের ন্যায় উদাসীন ছিল। অনন্তর নরনারী গৃহবাসী হইল। গৃহ পরিবার হইতে গ্রাম, গণ্ডগ্রাম; পরিশেষে নগর, জনপদ, মহানগর, সমাজ, রাজ্য, দেশ, মহাদেশ। এইরূপে এক সঙ্গে বহু পরিবার মিলিত হইয়া পরস্পর বিনিময়ে বংশানুক্রমে যথাকালে নৈতিক নিয়ম, রাজশাসন, ধর্ম্মবিধি, সামাজিক রীতি গঠন করিয়া তুলিয়াছে। অসভ্য অর্দ্ধসভ্য মানবপরিবারে ধর্ম্ম-জীবনের অঙ্কুরমাত্র দেখা যায়, কিন্তু তাহার উন্নতির সীমা কোথাও নাই। সংক্ষেপতঃ বিশ্বের বিশ্বজনীন মূল নিয়ম তিনটী। যথা (১) আত্ম-রক্ষার্থ সংগ্রাম বা আত্মপ্রতি। (২) অর্দ্ধাঙ্গ অন্বেষণচেষ্টা, বা পরপ্রীতি। (৩) ব্রহ্মপ্রীতি। শেষোক্ত নিয়মের অব্যর্থ শাসনে প্রথমোক্ত নিয়মদ্বয় সংশোধিত এবং নিয়মিত হয়। ইহাই অমর দেবজীবনের প্রাণ।

জীব। পৃথিবীতে মানবোন্নতির পরাকাষ্ঠা শিক্ষিত সভ্য সমাজ, আর ধর্ম্মসমাজ; কিন্তু তন্মধ্যেও চির উন্নতিশীল সরস দেবজীবন কৈ বড় ত দেখা যায় না। সাধক এবং ভক্তচরিত্রে যাহা কিছু দেখি তন্মধ্যে অধিকাংশেরই বদ্ধভাবাপন্ন মৃত ভাব। একটী সীমা আছে তথায় পৌঁছিয়া কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত চরিত্র, আর উর্দ্ধে উঠে না; বরং কালবশে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

ব্রহ্ম। আধুনিক সভ্য সমাজকেও এক প্রকার সুশিক্ষিত পশুসমাজ বলিয়া জানিও। এক অর্থে তাহা অমর দেবজীবনের সাংঘাতিক শত্রু। কিন্তু সভ্যাসভ্য উভয় সমাজেই "ব্রহ্মপ্রীতি" গোপনে এবং প্রকাশ্যে ক্রমে

বিকসিত হইতেছে। আর মৃত দেবতার যাহারা উপাসক, সেই সকল সাধকজীবনে দেবভাব অধিক দিন স্ফূর্ত্তি পায় না। কারণ, তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধভাবে দিন শেষ করে।

অতঃপর দেবাদিদেব পরম গুরু দেহাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহকারে বলিলেন, "গৃহাশ্রমনীড়ে দেহরূপ অণ্ডমধ্যে আত্মাবিহঙ্গকে আমি মাতার ন্যায় স্বীয় স্নেহপক্ষপুটে ঢাকিয়া পালন করিতেছি। নীড় এবং অণ্ড ভিন্ন তাহার পুষ্টি সাধন হয় না। অণ্ডমধ্যে আবৃত থাকিয়া পক্ষীশিশু কি রূপে গঠিত হয় এবং স্বাস্থ্য লাবণ্য বল সঞ্চয় করে তাহা কি কেহ দেখিতে পায়? শরীরযোগে প্রকৃতির সাহায্যে তেমনি প্রথমে আত্মা আমার ক্রোড়ে অজ্ঞানে বর্দ্ধিত হয়। পরে যথাসময়ে সে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিদাকাশে অনন্তধামে আমার সঙ্গে সজ্ঞানে মুক্তভাবে উড়িয়া বেড়াইবে। ইহলোকে সে প্রকৃতির পরিচর্য্যায় দেহগেহে থাকিয়া এখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানবল, বিশ্বাস, ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করুক, পরে দেহান্তে তাহার জন্য আমি অন্য রূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছি। পৃথিবীতে জ্ঞান সংস্কার লাভের পূর্ব্বে কে জানিত যে এখানে এমন এক সুখের সংসার আছে? লোকান্তরেও তেমনি সব প্রস্তুত দেখিতে পাইবে।"

জীব। তোমার সমস্ত কার্য্যই মঙ্গল কৌশলে পূর্ণ। আর বড় বড় যত কাজ, সব তুমি গোপনেই কর। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে প্রথম প্রথম আমাদের কেমন যেন বোধ হয়, তার পর কিন্তু দিবালোকের ন্যায় বেশ পরিষ্কার! দেহটী ঠিক যেন আত্মার দর্পণ। অন্তরের নিরাকার ভাব রস সাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কিরূপে এমন স্পষ্টীকৃত হয় বুঝিতে পারি না। ভাব চিন্তা জ্ঞান ইচ্ছার সহিত চক্ষু ও মুখমণ্ডল, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, স্নায়ু শিরা এবং মাংসপেশীর কি আশ্চর্য্য যোগ!

ব্রহ্ম। প্রকৃতিস্থ মানষের আন্তরিক ছবি শরীরের উপরে ভাসিয়া উঠে। আবার কপট ব্যবহারের এমন কৃত্রিমতা আছে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়।

জীব। হাঁ, তাও সত্য। কিন্তু সংযমের দ্বারা অন্তরের কু অভিপ্রায়

বাহির হইতে না দেওয়া কি ভাল নয়? অন্ততঃ কার্য্যে পাপ কৃত না হয় ইহা প্রার্থনীয়।

ব্রহ্ম। অবশ্য তাহা 'ভাল, কিন্তু সুযোগ অভাবে ভিতরে যদি বিষ কেহ পূরিয়া রাখে তাহা আরো ভয়ানক। রূপ, রস, গন্ধ, শরীর ও রজ, তমর উপর যাহাতে আত্মচৈতন্যের প্রভুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি হয় তাহা তোমার এক প্রধান কর্ত্তব্য। নিজে সর্ব্বদা অবিকারী থাকিয়া এই বিকারময় অবস্থাচক্র এবং ঘটনাতরঙ্গের ভিতর অবিচলিত চিত্তে সাক্ষীরূপে কেবল দেখ আর শেখ। কোন ঘটনা বা অবস্থাবিশেষ তুমি নহ, তুমিও আমার ন্যায় নির্লিপ্ত চিৎস্বরূপ। নরনারীর দেহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে আত্মার স্বরূপ এবং বিচিত্র বিকাশ নিরীক্ষণ কর।

জীব বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দে আমোদিত হইয়া বলিলেন, "নাথ, তুমি রসিকের শিরোমণি। বড় চতুর। মানুষকে আত্মবান দেবতা করিবার জন্য তোমার কি বিরাট আয়োজন! সর্ব্বাগ্রে মায়াজালে বদ্ধ করিয়া পরে তাহাকে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দাও। মৃগ যেমন ব্যাধের বংশীরবে মুগ্ধ হয় ঠিক তদ্রূপ। মানুষ প্রথমে সুখের লোভে মায়ার ফাঁদে গিয়া পড়ে, তার পর আর বাহির হইয়া আসিতে পারে না। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়েরা শিকারী হাতীর ন্যায় তাহাকে অল্পে অল্পে আগে ঘেরিয়া ফেলে। সেই সময়— শিকারীরা যেমন মদান্ধ বন্য হস্তীর পদে শিকল বাঁধে,—তেমনি তাহার স্কন্ধে অলক্ষিত ভাবে কর্ত্তব্যের গুরুভার তুমি চাপাইয়া দাও। শেষে আর সুখ স্বার্থ তাহার কিছুই থাকে না, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তবদত্ত ভার তাহাকে বহন করিতে হয়। বস্তুতঃ সংসারব্রত প্রথমে কষ্টকর জ্ঞান হইলে কেহ এ পথে আসিত না। যখন বুঝিতে পারে যে সে ধরা পড়িয়াছে, তখন আর তাহার নড়িবার যো থাকে না। মরি মরি কি তোমার প্রেমের চতুরালী! ধন্য দেব! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।"

———

জ্ঞানযোগ—৭ম অধ্যায়।

—০ঃ—ঃ০—.

সত্যশাস্ত্র।

চিদানন্দ পিতৃদেব প্রমুখাৎ জ্ঞানযোগের অভিনব তত্ত্ব সকল শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে বলিলেন, "পিতঃ! স্বয়ং ভগবানের মুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত বচনাবলী কি সুমধুর! আহা! আমার বড় ইচ্ছা হয়, শ্রীজীব মহাত্মার মত আমিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট সে সকল শুনিয়া কৃতার্থ হই। হায়! আমার কি তেমন সৌভাগ্য হইবে।"

বৃদ্ধ তপস্বী বলিলেন, "সন্তান! কেন তুমি সে জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ? সরল জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু নিষ্কাম ব্যক্তিমাত্রেরই এ অধিকার আছে। তোমার সাধু কামনা অপূর্ণ থাকিবে না। তাহার পরের বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।"

শ্রীজীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রচক্ষু, সকলেই কি যখন তখন এইরূপে তোমার নিকটে আসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিবে, না অন্য সহজ পন্থা আর কিছু আছে?

ভগবান। আমি যেমন করিয়া তোমাকে শিক্ষা দিতেছি এইটীই সহজ পথ এবং প্রকৃষ্ট উপায়। তবে স্থূল বুদ্ধি অশিক্ষিত চঞ্চল চিত্ত কিংবা বিকৃত শিক্ষালব্ধ সাধনবিমুখদিগের জন্য বাহ্য স্থূল উপায়ও আছে। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র আমার প্রেরিত জ্ঞানী এবং প্রত্যাদিষ্ট সাধকেরা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার শিক্ষা এবং অনুশাসনে এই বিশাল মনুষ্য পরিবার ধর্ম্মনীতির পথে স্থিতি করিতেছে। স্বেচ্ছাচার হইতে বাঁচিবার উপায় এই শাস্ত্র। আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান, তাহার ভিতর দিয়া প্রথমে সর্ব্বশাস্ত্রের অভ্যুদয় হয়। ভৌতিক নিয়মাধীন ঘটনা কিম্বা মানব সমাজের ইতিহাসের ভিতর দিয়া যে জ্ঞান শিখিবে তাহাও পরিশেষে আত্মস্থ করিতে হইবে। অনুমানের উপর চিরকাল নির্ভর করিয়া থাকিবে না। যাবতীয়

জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে পরিণত করাই জ্ঞানযোগ সাধনের চরম লক্ষ্য।

জীব। বেদ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতিতে যাহা কিছু বর্ণিত আছে তাহা কি সমস্তই প্রত্যাদিষ্ট অভ্রান্ত সত্য? প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পড়িয়া কোন একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন বোধ হয়। কারণ, এক শাস্ত্রের ভিতরেই পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। তদ্ব্যতীত প্রাচীন শাস্ত্রে এমন সকল সহজজ্ঞান-বিরুদ্ধ অযৌক্তিক কল্পিত কথা বর্ণিত আছে যে তাহাতে কিছুতেই বিশ্বাস জন্মে না। অভ্রান্ত ব্রহ্মবাণী বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহার সঙ্গে এ প্রকার অসঙ্গত কল্পনা কবিত্বের অবতারণা কি রূপে হইল? পাঁচটা ধর্ম্মের পাঁচ খান শাস্ত্রের মধ্যে কতই অনৈক্য দেখিতে পাই! অথচ প্রতিজনেই বলে আমাদের শাস্ত্র অভ্রান্ত। ইহার ভিতর কি একতার ভূমি নাই?

ভগবান। কেন থাকিবে না? তাহার ভিতর যে অংশে সহজজ্ঞানসিদ্ধ স্বভাবসম্ভূত সার্ব্বোভৌমিক সত্য আছে তাহাই কেবল আমার অভ্রান্ত-বাণী জানিবে, অন্য সমস্ত যাহা কিছু পরস্পরবিরোধী তাহা আবান্তরিক এবং মানবীয় কবিত্ব কল্পনার উচ্ছ্বাস। সত্যের রূপ সর্ব্বত্র একই। কিন্তু রূপক বর্ণনার অভ্যন্তরেও অনেক সার সত্য থাকে। তাহা সহজজ্ঞানে বুঝিয়া লইতে হয়।

জীব। তবে ঐ সকল শাস্ত্রান্তর্গত সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন করিব কিরূপে? শাস্ত্রীরা বিভিন্ন প্রকারে তাহা ব্যাখ্যা করেন, এক জনের মতের সঙ্গে অপরের ঐক্য হয় না। আবার টীকাকারদিগের মধ্যেও মতামতের কতই প্রভেদ! যাঁহার যেরূপ মত বিশ্বাস এবং জ্ঞান সংস্কার, তাঁহার টীকা ব্যাখ্যা তদ্রূপ।

ভগবান। সেই সকল বহুবিধ টীকা ব্যাখ্যারও আবার সটীক ব্যাখ্যা আছে। মূলশাস্ত্র কিংবা তাহার টীকা ব্যাখ্যার ভিতর হইতে আমি স্বয়ং তোমায় প্রকৃত অভ্রান্ত তত্ত্ব বুঝিইয়া দিব। তজ্জন্য তুমি একবারে আমার নিকট অব্যবধানে আসিয়া প্রার্থী হইবে। সর্ব্ববিধ পক্ষপাত, নীচ স্বার্থ কামনা, বদ্ধমূল সংস্কার এবং জ্ঞানবিকার বিবর্জ্জিত হইয়া আমার আলোক

অন্বেষণ করিলেই মীমাংসা শাস্ত্র অবগত হওয়া যায়। আমার যাহা মূলশাস্ত্র তাহা সর্ব্বত্রই সমান, জাতি বা ব্যক্তিবিশেষে তাহার কোন ভিন্নতা নাই। শাস্ত্রী পণ্ডিতগণের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে কদাপি বিভ্রান্ত চিত্ত হইও না। সাধক সিদ্ধ ভক্তাত্মাগণের নিকট তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিবে। কিন্তু তাহাও বাহ্য। উক্ত সাহায্য লইয়া উপাসনা গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমার সঙ্গে সমস্ত বিষয় মিলাইয়া লইবে।

জীব। তবে বেদ বেদান্ত পুরাণাদিতে যে সকল বিজ্ঞান বিচার, সাধনতত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ আছে তদনুসারে কি চলিব না?

ভগবান। চলিবে এবং চলিবে না; অন্ধের ন্যায় কোন পন্থার অনুসরণ করা উচিত নহে। দেশকালভেদে প্রতি জনের প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুসারে তদুপযোগী সাধন প্রয়োজন। যোগ ধ্যান জ্ঞান ভক্তি নীতি প্রেম বৈরাগ্য উপার্জ্জনের নিমিত্ত সংযম নিয়ম চিন্তা অধ্যয়ন সেবা পূজা ভজন কীর্ত্তন সাধুসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে সিদ্ধাত্মা মহাজনেরা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা যাহা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার কথা চর্ব্বণ না করিয়া ভাব ও সারবত্তা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে আপনাপন সময় এবং অভাবোপ-যোগী করিয়া লইতে হয়। ইহার ভিতরেও বহুবিধ অস্বাভাবিক মনঃ-কল্পিত সাধনপ্রণালী আছে, আমার ইঙ্গিতে তৎসমুদয় পরিহার করিবে। সাধনের যে সকল বিশুদ্ধ প্রণালী পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল দেশ কাল পাত্রবিশেষে তাহারও ভিন্নতা হইবে। কারণ, বিশেষ কোন স্থানে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ ব্যক্তির সাময়িক বিশেষ অভাবানুসারে যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র সকল সময়ে সকলের পক্ষে সংলগ্ন হইতে পারে না। সাধকের জ্ঞানোন্নতির তারতম্য অনুসারেও সাধনের বিভিন্ন অবস্থা আছে। অজ্ঞানদিগের জন্য সহজ সরল উপায় আবশ্যক, কিন্তু তাহাতে ভ্রান্তি কুসংস্কার অন্ধানুসরণ প্রশ্রয় পাইবে না। অজ্ঞানীও যাহাতে ক্রমে জ্ঞানের উচ্চ সোপানে উঠিতে পারে তদুপযুক্ত বিশুদ্ধ সাধন প্রণালী চাই। চিত্তশুদ্ধি, একাগ্রতা, যোগধ্যান এবং ভক্তিবিকাশ সম্বন্ধে স্বদেশে বিদেশের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে স্বভাবসঙ্গত সার্ব্বভৌমিক সাধন যাহা কিছু আছে তাহার সাহায্য কদাপি প্রত্যাখ্যান করিবে না।

জীব। শাস্ত্র, গুরু, পণ্ডিত, পুরাতন সাধনপ্রণালী যাহা কিছু, তোমার ইঙ্গিতানুসারে তাহাদের সাহায্য লইতে হইবে, এইটীই তবে শেষ কথা। তদ্ভিন্ন কোন শাস্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, গুরূপদেশও বুঝা যায় না। আচ্ছা তাহাত বুঝিলাম, অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে তবে এত সব ভুল ভ্রান্তি মিথ্যা কল্পনা কোথা হইতে আসিল ?

ভগবান। কালক্রমে পাঁচ জন মানুষের পাঁচ কাণ, পাঁচ মুখ এবং পাঁচ প্রকার বুদ্ধি ও রুচি প্রবৃত্তি ধারণা এবং পাঁচ ভাষা, পাঁচ হাত দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে এইরূপ ঘটে। আমিত সংস্কৃত আর্ব্বি পার্শী কিম্বা গ্রীক হিব্রু ল্যাটিন ভাষায় কাগজে লিখিয়া কোন ধর্ম্মপুস্তক কাহাকেও দিই নাই। আদিম যুগের স্বভাব কবি সরলাত্মা এবং পূর্ব্বতন ধর্ম্মপিপাসু তত্ত্বানুসন্ধায়ী জ্ঞানী কিম্বা প্রত্যাদিষ্ট ঋষি যোগী মহাজনদিগের আত্মায় যুগে যুগে দেশে দেশে আমি যে জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা প্রথমে মৌখিক ভাষাবলম্বনে শ্রুতিপরম্পরা লোকের মুখে মুখে অনেক দিন প্রচলিত ছিল, পরে লিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তদনন্তর যে যাহা ভাল মনে করিয়াছে তাহার সঙ্গে তাহা মিশাইয়া দিয়াছে ; এখন তাহাই অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকরূপে লোকসমাজে গৃহীত এবং সমাদৃত। এখন ভাবিয়া দেখ, কত অবস্থার ভিতর দিয়া উহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আর এক কথা এই, যাহা আমি আত্মার ভিতর সত্যজ্ঞান ভাবরূপে ব্যক্ত করিয়াছি তাহা যে মানুষের বুদ্ধি যুক্তি জ্ঞানের ধারণায় এবং মৌখিক বাক্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং সেই মৌখিক বচন বেদ শ্রুতি বেদান্ত স্মৃতিতে—এবং শ্রুতি-বাক্য ভাষাবদ্ধ গ্রন্থে—এবং ভাষার উন্নতি প্রবাহমুখে তাহা অবিকৃত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাও নহে ; বংশের পর বংশ, যুগের পর যুগ ভাবুক কবি জ্ঞানীরা উহাতে আপনাপন কল্পনামিশ্র জ্ঞান এবং কবিতা গাথা আখ্যায়িকা সংযোগ করিয়াছন। সুতরাং কোন গ্রন্থবিশেষের আদ্যোপান্ত অভ্রান্ত হইতেই পারে না।

জীব। তবে আমাদের এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা বেদ কোরাণ বাইবেল পুরাণাদি গ্রন্থকে এত মান্য করে কেন ?

ভগবান। তাহার মানে বদ্ধমূল প্রাচীন সংস্কার সকলেরই অতি প্রিয়।

কোন্ শাস্ত্রে কি আছে তাহা কেহ কিছুই জানে না, পুরুষানুক্রমে বাল্যকাল হইতে শাস্ত্র ব্রহ্মবাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে, কাজেই পাঁচ জনের দেখাদেখি তাই বলে। যে বিষয়ে যাহারা যত অনভিজ্ঞ সে বিষয়ে তাহাদের তত শ্রদ্ধা ভক্তি। ঋষিবাক্য অভ্রান্ত এই কেবল জানা আছে। কিন্তু শাস্ত্রলিখিত ঋষিবাক্যের কত টুকু সত্য কত টুকু বা কল্পনা কবিত্ব তাহা পড়িয়া এবং বুঝিয়া কেহ দেখে না। শাস্ত্র অধ্যয়নেরই বা প্রবৃত্তি কয় জনের আছে? বেদে প্রকৃতির পূজা হোম যাগ, উপনিষদে দ্বৈত এবং অদ্বৈত তত্ত্ব, বেদান্তে তদ্বিষয়ক দার্শনিক বিচার চিন্তা যুক্তি সিদ্ধান্ত; আর পুরাণে অবতারবাদ, আমার মর্ত্ত্য লীলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত; সংক্ষেপে বেদ বেদান্ত পুরাণের ইহাই তাৎপর্য্য। তার পর কত শত বেদ পুরাণ রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে কে তাহার সংবাদ লয়? আমি নিয়তই শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছি। প্রত্যেক নর নারীর জীবন আমার প্রণীত এক এক খানি বেদ পুরাণ। যেরূপ তোমাদের দেশে, তেমনি অন্যান্য দেশে; যেরূপ পূর্ব্বকালে, সেইরূপ এখনো। অতএব বৎস, তুমি আত্মতত্ত্ব এবং সমগ্র বিশ্ববিজ্ঞানগ্রন্থ আমূল অধ্যয়ন কর, তাহা হইলে মহাজ্ঞানে জ্ঞানী হইবে।

চিদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! বেদ যে নিত্য, ইহার অর্থ কি? বিশুদ্ধ সরলান্তঃকরণ একমাত্র তাহার প্রকাশ স্থান ইহা আমি এখন বুঝিতে পারিলাম। বস্তুতঃ বেদবাণী কোন বিশেষ দেশকালপাত্রে বা ভাষায় বদ্ধ নহে। ইতঃপূর্ব্বে আমার সংস্কার ছিল, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের পরপারে কিম্বা সরস্বতী নদীতীরস্থ ঋষিতপোবনে যে সকল আর্য্য পিতামহগণ বাস করিতেন তাঁহাদের ভিতরে কেবল বেদতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এ কালে আর তাহা হইতে পারে না। কিন্তু তাহা নিতান্ত ভুল মত। জীব বিবেককর্ণে বর্ত্তমান যুগে স্বয়ং ব্রহ্ম সদ্‌গুরুর মুখে যাহা শুনিয়াছেন এবং যাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এক্ষণে আমি শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার পূর্ব্ব সংস্কার সমস্ত ধৌত হইয়া গেল। কারণ, ইহা বেদ অপেক্ষাও মহাবেদ।"

সদানন্দ পুত্রের দিব্যজ্ঞানপ্রসূত বিশ্বাসবাক্য সকল শ্রবণে উৎফুল্ল চিত্ত হইয়া বলিলেন, "বৎস, এতক্ষণে ব্রহ্মগীতোক্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যা আমার সফল হইল। বেদতত্ত্ব বা দিব্যজ্ঞানের আদিমাবস্থা বুঝিতে পারিলেই সমস্ত

নিখিল বেদশাস্ত্র হস্তামলকবৎ প্রতীত হয়। বেদকে যে নিত্য বলা হইয়াছে তাহার গূঢ় অর্থই এই যে, যখন যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিভাবে ব্রহ্মাভিমুখী হইয়া নিষ্কাম অন্তরে তাঁহাকে ডাকিবে তখন সে তাঁহার আদেশ বাণী বা বেদবাণী শুনিতে পাইবে। ইহার সঙ্গে দেশকালপাত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেক মনুষ্য যাহারা পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল, কিম্বা পরে আবার জন্মিবে তাহাদের প্রত্যেকের জীবনবেদ অভ্রান্ত শাস্ত্র, স্বয়ং ব্রহ্ম তাহার রচয়িতা। তাহা যদি না হইত, এবং বেদ যদি কেবল সেই চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটী শ্রুতিমন্ত্র এবং কর্ম্মমীমাংসা যাহা চতুর্ব্বেদে পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহারই উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে এই বিশাল বিশ্বপরিবারের জ্ঞানধর্ম্মনীতি শিক্ষার আর কোন আশা ভরসা থাকিত না। বহু প্রাচীন কালের গুটিকতক ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক মন্ত্র আর নীতির অনুশাসন বিধি কি এই চির উন্নতিশীল জীবন্ত মানবসমাজের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে? কেবল ভূত কালে বেদতত্ত্ব দেববাণী প্রকাশ হইয়াছিল, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কি তবে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে? অতীত কালের পুরাতন বেদ যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভেও তিনিই আছেন ও থাকিবেন। অবশ্য প্রাচীন বেদগীত সকল গম্ভীর অর্থযুক্ত, সারগর্ভ এবং অতিশয় সুমধুর সন্দেহ নাই; মানব মাত্রেরই তাহা চিরদিনের শ্রদ্ধার বিষয়। পৃথিবীর আদিম সভ্যতার নিদর্শন এই পরমার্থ তত্ত্ব কাহার না হৃদয়কে স্পর্শ করে? ভবিষ্যতে ইহার ঔজ্জ্বল্য এবং গৌরব আরও বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই নিত্য পরব্রহ্মও পূর্ব্ববৎ জীবিত আছেন, তাঁহার সৃষ্ট মানবস্বভাবও সেই রূপই আছে, এবং তিনি এখনো বিবিধ আধারে নিত্য নব নব বেদ প্রকাশও করিতেছেন, তথাপি কেহ তাহা মানিতে চায় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বেদ, বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ গুলি যেন বেদের আরম্ভ এবং তাহাই বেদের শেষ। প্রতিজনের নিমিত্ত প্রতি সময়ে নিজ নিজ অবস্থোপযোগী নব নব বেদের প্রয়োজন, উহা জীবনের অন্ন পান স্বরূপ। সেই জন্য প্রতি আত্মাতে স্বয়ং অন্তর্য্যামী ভগবান সদ্‌গুরু রূপে নিয়ত বাস করিতেছেন।"

অতঃপর চিদানন্দ কহিলেন, "ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র বোধ হয় পরে আর হয় নাই, তাই লোকে নূতন অপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্রকে এত শ্রদ্ধা করে?"

সদানন্দ। কেন হইবে না? এখনো হইতেছে; পরেও হইবে। উৎ-কৃষ্টাপকৃষ্টের কথা নহে; যাহা সত্য তাহা চিরদিনই উৎকৃষ্ট এবং নিত্য। প্রাচীন বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি লোকের যে এত শ্রদ্ধা ভক্তি তাহার অনেক গুলি কারণ আছে। পৈতৃক সংস্কারবশতঃ পুরাকালের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণতঃ শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করে। আপ্ত বাক্য ও আদিম সভ্যতার প্রথম ফল বলিয়াও উহা ভাল লাগে। তদ্ভিন্ন কবিত্বপ্রধান যুগের সরল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, বাল্য বিশ্বাস, চেষ্টাবিহীন স্বভাবসম্ভূত বিস্ময় এবং ভক্তিরস অতীব মধুময়। তৎসঙ্গে সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য্য মধুরতা এবং তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা। কিন্তু তাই বলিয়া যে উহাতে সর্ব্বতত্ত্বের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, মনুষ্যের যত কিছু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা ঐ সকল শাস্ত্রে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা কে বলিবে? পৃথিবীর কোন বিষয়ই একেবারে পূর্ণরূপে বিকসিত হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়, ইহা ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ কথা, বিশ্বজনীন অলঙ্ঘ্য নিয়ম। অভিনব সত্য যদিও সাধারণ বিধি নিয়মের জন্য প্রতীক্ষা করে না, স্বয়ং ঈশ্বর তাহা শূন্য অন্ধকার মধ্যে প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহারও সময় আছে, উপযোগীতা আছে।

জ্ঞানযোগ—৮ম অধ্যায়।

দেবদেবী ও অবতার।

চিদানন্দ তাপসশ্রেষ্ঠ স্বীয় পিতৃদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণামান্তর বলিলেন, "ভগবন্! এই যে অপূর্ব্ব জ্ঞানযোগতত্ত্ব সকল আপনি বলিলেন, ইহাতে আমার গূঢ় সংশয় নিরাকৃত হইল। এরূপ আর কখন শুনি নাই।"

সদানন্দ বিস্ফারিত লোচনে উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "বৎস, এই নবীন ব্রহ্মগীতা যতই তুমি শুনিবে, উত্তরোত্তর ততই ঘনতর রস সম্ভোগে কৃতকার্য্য হইবে। তদনন্তর সর্ব্বগত ভগবান বাসুদেব শ্রীহরি দেবদেবী এবং অবতারবাদের যে ব্যাখ্যা করেন তাহাও বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে তুমি তাহা শ্রবণ কর।"

জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আদিদেব! এই যে সমস্ত অগণ্য অসংখ্য উপাস্য পদার্থ এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাই, ইহার উৎপত্তি বিবরণ কি? ইঁহারা কি বাস্তবিকই তোমার অংশাবতার এবং আমাদের উপাস্য? দেবতা কিম্বা অবতার বলিয়া কি কোন একটী স্বতন্ত্র জাতি আছে?

ব্রহ্ম। মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতির অবস্থাকেই দেবত্ব বলে। তাঁহারা সকলে সাধক সিদ্ধ মহাজন, মানবকুলসম্ভূত; উপাস্য বা পরিত্রাতা আমি ভিন্ন আর অন্য কেহ নাই। কি কারণে এ সমস্ত খণ্ড খণ্ড দেবদেবীমূর্ত্তি এবং সুবহু চেতনাচেতন পদার্থ পৃথিবীতে উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, মেঘ বৃষ্টি, বজ্র বিদ্যুৎ, কিম্বা ভূতলে ভূধর জলধি, নদ নদী, অগ্নি ওষধি, বনস্পতি এবং পশু পক্ষী মানব মানবীর মধ্যে যে সকল উদ্ভিদ্ প্রাণী, নর বা জড় ভৌতিক পদার্থকে উপাস্যরূপে প্রচলিত দেখিতে পাও ইহাদের উৎপত্তির কারণ এক দিকে মানবের অজ্ঞানতা, অপরদিকে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপিপাসা-সঞ্জাত ভাবান্ধতা। আদিমাবস্থায় স্বভাবের সন্তান অশিক্ষিত লোকেরা হৃদয়ের আবেগ বশতঃ যখন যাহাকে উপকারী, মহিমান্বিত এবং রমণীয় তৃপ্তিকর বলিয়া বুঝিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়াই স্বাভাবিক ধর্ম্মতৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়াছে। কোন একটী মহাশক্তিশালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা এবং রক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ মানব স্বভাবের ধর্ম্ম। তদনন্তর এক পুরুষের অবলম্বিত উপাস্য দেবতা পুরুষানুক্রমে পূজিত হইয়া আসিতেছে; প্রাচীন সংস্কার এক বার জাতীয় শোণিতে বদ্ধমূল হইলে বহু কাল যায় তাহা উন্মুলিত করিতে। প্রাকৃতিক ঘটনার অবতার স্বরূপ কিম্বা বিশেষ বিশেষ ভৌতিক পদার্থ বা বৈদিক দেবতা ব্যতীত যে সকল দেবমূর্ত্তি উপাস্য

দেখিতে পাও, ইহার মধ্যে অনেক গুলি ভয় ভক্তির কল্পনাপ্রসূত মূর্ত্তিমতী কবিতা বিশেষ; অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠতর অসাধারণ শক্তি কিম্বা গুণসম্পন্ন মানব মানবীর প্রতিকৃতি। ইহারা সকলেই রুদ্ররস, মাধুর্য্যরস, বীররস, করুণরসমিশ্র ধর্ম্মভাবের সাকার ছবি, এবং বিশেষ বিশেষ গুণ ক্ষমতা ও ভাবশক্তির অবতার;—নির্গুণ অরূপ মনোবৃত্তির সগুণ প্রতিমূর্ত্তি এবং ভাবকল্পনার বাহ্য আকার। কিন্তু মুক্তিদাতা উপাস্য ইহারা কেহ নহে। ইহার মধ্যে যে গুলি আমার প্রেরিত ভক্ত যোগী সিদ্ধ মহাজনগণের নামে প্রচলিত তাহা শ্রদ্ধা ভক্তি চিন্তা ধ্যান অধ্যয়নের বিষয় বটে; কিন্তু চিত্রিত পট কিম্বা অচেতন ছবি প্রতিমাদি জড় মূর্ত্তির মধ্যে সে সকল অমরাত্মার আবির্ভাব কিছুই থাকে না; তাহা কেবল স্বকপোলকল্পিত বাহ্য রূপের ছায়া মাত্র, আসল রূপও নহে। পরলোকগত সাধুভক্তের প্রকৃত দর্শন বা স্পর্শ সাধকের নির্ম্মল চরিত্রযোগে সম্পন্ন হয়। মূর্ত্তিমাত্রেই প্রায় কল্পিত। কারণ, যাঁহাকে যেরূপে লোকে গঠন করিয়া পূজা করে তাঁহাদের দেহের অবিকল ছবি কোন কালে কেহ চিত্রিত বা অঙ্কিত করে নাই; বহুকাল পরে কল্পনা দ্বারা তাঁহাদের ভাবানুরূপ মূর্ত্তি গঠন করিয়া লইয়াছে, তাহাই এখন প্রচলিত দেব দেবী।

জীব। ইন্দ্রিয়গোচর এই সকল নানালঙ্কারে সজ্জিত রমণীয় এবং দিব্য রূপ দর্শনের সঙ্গে যখন সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপক সুশ্রাব্য মন্ত্র শব্দগাথা সুমধুর গন্ধ এবং রস স্পর্শাদির একত্র সংযোগ হয়, তখন দেখিতে পাই, তাহা দ্বারা অতীন্দ্রিয় আত্মাকে বিবিধ প্রকারে ভাবান্তর করিয়া তুলে। নিকৃষ্টাধিকারীর জন্য ধর্ম্মের প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ইহা কি প্রয়োজন নহে? যদিও ইহা বহির্ম্মুখী ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার সাহায্যে কি অন্তর্ম্মুখে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে প্রবেশ করা যায় না?

ভগবান। অন্তর্ম্মুখে অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশের পক্ষে সমস্ত বিশ্বই উপায় হইতে পারে; চিত্রশালিকা, কুসুমকানন, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, পারিবারিক এবং সামাজিক উৎসবক্ষেত্র, পিতা মাতা, সন্তানকোলে স্বাধ্বী নারী, সাধু সন্ন্যাসী সকলেই এ পথের সহায়; কিন্তু মানবাত্মার জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা সম্বন্ধে যে গভীর অভাব এ সকলের দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবার নহে। তাহা

কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার যোগেতেই হয়। যোগ ভক্তি প্রেমের অনুভূতিও পরোক্ষ নহে, অপরোক্ষ। বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান যদিও ভাবের উদ্দীপক, কিন্তু ইহা আবার অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে দুরতিক্রমণীয় দুশ্ছেদ্য ব্যবধান। তত্ত্বজ্ঞানীরা এই সমস্ত সাকার নিদর্শনের বাহ্যাবরণের অভ্যন্তরে হৃদ্গত ধর্ম্মভাবের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হন, কিন্তু বাহিরের জড় প্রতিমা কেহ পূজা করেন না। লোকসন্তুষ্ট বা লোকশিক্ষার জন্যও এই ভ্রমাত্মক উপায় অবলম্বনীয় নহে। জীবাত্মার ব্রহ্মাভিমুখী গতি যাহাতে সাধিত হয় জ্ঞানী ভক্তেরা কেবল তাহারই পক্ষপাতী। তাহার জন্য অন্য সকল বিশুদ্ধ উপায় তাঁহারা জানেন এবং নিম্নাধিকারী অজ্ঞান নরনারীকে তাহাই অবলম্বন করিতে বলেন।

জীব। তাঁহাদের চক্ষে অর্চ্চনার্থ কল্পিত এই সকল মূর্ত্তি কি তবে ঘৃণার বিষয় এবং পাপজনক ?

ভগবান। তাঁহারা জ্ঞানকৃত ইচ্ছাপ্রসূত পাপ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থ কি কৃত্রিম বস্তুর প্রতি ঘৃণা দ্বেষ পোষণ করেন না ; বরং অজ্ঞানদিগের কৃত কল্পিত ঐ সকল দেবদেবীর অভ্যন্তরে শৈশব মানবের শৈশব ধর্ম্মের বিকাশ তাঁহারা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, এবং স্পষ্টরূপে দেখেন, সৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতে যুগে যুগে দেশে দেশে মানবস্বভাব ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এবম্বিধ কতই বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে। এই জন্য সে সকল ঘৃণার বিষয় নহে, অধ্যয়নের বিষয় ; কিন্তু এ প্রণালীতে আত্মোৎকর্ষসাধক যথার্থ উপাসনার কার্য্য হয় না। মানবের আত্মজ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা এবং হৃদয়ের ভিতর দিয়া আমার জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান কেবল তাহার উদ্দীপক সহায় মাত্র ; আমাকে জানিবার কিম্বা ভজনা করিবার পক্ষে তাহারা সাক্ষাৎ উপায় কদাপি নহে।

জীব। তবে অনেকানেক মহাত্মা পৌত্তলিকতাকে পাপ অধর্ম্ম বলেন কেন ? জনসাধারণের অজ্ঞানতা জন্য যে দোষ দুর্ব্বলতা অপূর্ণতা তাহা কি পাপের মধ্যে গণ্য ?

ভগবান। পাপের প্রকৃত অর্থ অভিপ্রায়মূলক। বিবেকবিহীন পশু কিম্বা জড় অবোধ বালক অজ্ঞ বা উন্মাদকে কেহ পাপী বলে না।

পাপপুণ্য সত্যমিথ্যা প্রভেদ বুঝিবার শক্তি প্রত্যেকেরই আছে;—কাহারো নিদ্রিত, কাহারো জাগ্রত। কিন্তু যাহারা স্বার্থের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধোৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া সে শক্তি পরিচালনায় অবহেলা করে তাহাদের অজ্ঞানতা এক অর্থে অপরাধ। পৌত্তলিকতাও সেই সেই স্থলে পাপ যেখানে যেখানে ইহা আমোদ এবং লৌকিক উৎসবার্থ কিংবা সামাজিক স্বার্থোদ্দেশে কপটভাবে গৃহীত হয়। আমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ইহা অস্বীকারপূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি দেশকালেবদ্ধ কোন বাহ্য পদার্থবিশেষ কিংবা পুত্তলিকাবিশেষকে আমার প্রতিরূপ মনে করে তাহারা ভ্রান্ত এবং অজ্ঞানান্ধ, সুতরাং সহজজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া তাহারাও অপরাধী হয়। বহু দেবোপাসকের চিত্ত বহু ভাগে বিভক্ত, এই জন্য একাগ্রতা সহকারে এক অখণ্ড অদ্বিতীয় দেবতা যে আমি আমাতে তাহারা আত্মা সমাধান করিতে পারে না।

জীব। আমাদের দেশে প্রচলিত রাম কৃষ্ণ, শিব দুর্গা, কালী প্রভৃতি এই যে সকল উপাস্য দেব দেবীর মূর্ত্তি, ইহা কি তবে আধুনিক?

ব্রহ্ম। অবশ্যই আধুনিক। বেদ বেদান্তের সময় এ দেশে এ সকল প্রচলিত ছিল না। জনসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের উন্নতির ইহা নিদর্শন। জনক যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বাল্মিকী ব্যাস প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন ঋষি মহর্ষীদিগকে হিন্দুরা আচার্য্য গুরু বলিয়া মানেন তাঁহারা ঈদৃশ মূর্ত্তির পূজা করিতেন না। তত্ত্ববিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্যগণ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা ধ্যান করিতেন। অপর জনসাধারণ তখন শস্য ও গোধনপ্রদাতা মিত্র বরুণ চন্দ্র সূর্য্য মরুদ্গণ এবং বৈশ্বানরের উপাসক ছিলেন। অগ্নিপূজার্থ হোম তৎকালকার প্রধান অনুষ্ঠান।

জীব। বৈদিক ও পৌরাণিক সময় হইতে এইরূপ বংশপরম্পরা যাহারা সাকার দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছে তাহারা তুমি যে নিরাকার বিশুদ্ধ চৈতন্য, তোমাকে কি রূপে উপাসনা করিবে?

ভগবান। আমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছি, অথচ কোন একটী বিশেষ সৃষ্ট পদার্থ আমি নহি; এই সহজজ্ঞান ধরিয়া জপ তপ ধ্যান চিন্তা নাম গান দ্বারা ভক্তিযোগে ক্রমশঃ আমার চিদানন্দঘন রূপের দর্শন লাভ হয়। এক অদ্বিতীয় নিরাকার দেবতা পূজার দৃষ্টান্ত ইহুদি এবং মুসলমানদিগের

আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাঁহারা এবং অন্য সকল সম্প্রদায়ের জ্ঞানীরা বাহ্য মূর্ত্তির আবশ্যকতা কেহ অনুভব করেন না। অতএব জ্ঞানসঙ্গত রূপে পরমাত্মার ধ্যান ধারণা, পূজা অর্চ্চনার জন্য যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান উপযোগী, সমাজপতি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সেই রূপ বাহ্যানুষ্ঠান নিম্নাধিকারীদিগকে শিক্ষা দিবেন।

জীব। সেই নিম্নাধিকারী স্ত্রী শূদ্র অজ্ঞদিগকে ধর্ম্মপথে ঠিক রাখিবার জন্যইত প্রাচীন আচার্য্যেরা বিবিধ প্রকার বাহ্যপূজার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহাতে জনসাধারণকে ধর্ম্মের পথে সহজে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। পূজার প্রণালী এবং বহুবিধ অনুষ্ঠান, অঙ্গ এবং ভূতশুদ্ধির মন্ত্র, ন্যাস, ধূপ ধূনা, চন্দন পুষ্প, নৈবিদ্যাদি উপকরণ, উপবাস সংযম, বলি ভোগ আরতি, চণ্ডীপাঠ, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রভোজন, দরিদ্রকে দান, শঙ্খ ঘণ্টার বাদ্যনিনাদ, এই সমস্ত গুলি মিলিয়া প্রতিমোপাসকের হৃদয়ে এক প্রকার ভক্তি ভাব উদ্দীপিত করে; যদিও তাহারা শাস্ত্রোল্লিখিত মন্ত্রের অর্থ, কার্য্য প্রণালীর মর্ম্ম জানে না, তথাপি ইহা দ্বারাই তাহাদের ধর্ম্মতৃষ্ণার চরিতার্থতা হয়; কাহার কি অর্থ ইহা জানে না বলিয়াই তাহাদের ভক্তি আরো বেশী দেখিতে পাই। যেমন তাহাদের শিক্ষা সংস্কার মানসিক অবস্থা, ঠিক তাহার উপযোগী ঐ সকল ধর্ম্মকর্ম্ম। এই জন্য বেদের ব্রাহ্মণ এ মন্ত্র বিভাগ অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা অনুসারে প্রথমে এই সকল অনুষ্ঠান, তদনন্তর বেদান্ত উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

ভগবান। উহা যদি মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের পথ প্রমুক্ত রাখিত, তাহা হইলে সে কথা বলিতে পারিতে। উন্নতিশীল মানবাত্মার পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া বাহ্যানুষ্ঠানে চির দিন প্রবৃত্ত রাখা কি বিচারসঙ্গত? দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত্ত প্রকৃতিপুঞ্জ দুষ্পাচ্য কুভক্ষ্য বস্তু ভোজন করে বলিয়া কি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহা শাস্ত্রানুমোদিত বলিবেন?

জীব। কেন, তাহারা ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া বিশুদ্ধ উপায় কি কি তাহা পরে বুঝিয়া লইবে? তৎপূর্ব্বে কর্ম্মজনিত কিছু ভক্তিভাবের উৎকর্ষ হয় ইহা কি প্রার্থনীয় নহে? এবং সে গুলি কি বলপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বন্ধ

করা উচিত? যখন তাহাদের জ্ঞান জন্মিবে তখন আপনি সে সব মিথ্যা জানিয়া ছাড়িয়া দিবে।

ভগবান। শিক্ষাপ্রণালীর দোষে, সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়াভাবে যদি জ্ঞানের পথ চিরকাল বন্ধ থাকে, তাহা হইলে সে ভক্তি চির দিন অন্ধ হইয়া রহিল। বস্তুতঃ অনেকের তাহাই হয়। পুরুষানুক্রমে কত কত নর নারী বাহ্য পূজা প্রণালী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহারা জ্ঞানরূপ ছাদে উঠিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের ভক্তিরও অন্ধতা দূর হয় না। শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অন্তর্ম্মুখ সাধন চাই। অধিকারভেদ চির দিনই আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, কিন্তু যাহার যেমন অধিকার তাহাকে তদনুযায়ী বিশুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী করিতে হইবে। জপ ধ্যান চিন্তা পাঠ সংকীর্ত্তন সংযম নিয়ম, সাধুসেবা, প্রার্থনা স্তব, বন্দনা প্রণিপাত. উপাসনালয়সন্মার্জ্জন, এবং সজ্জিত করন, হরিলীলা কথা শ্রবণ, গাত্রশুদ্ধি, শুদ্ধ আসনে উপবেশন, পবিত্র বসন পরিধান, সাত্ত্বিক ভোজন, শুদ্ধাচার ইত্যাদি অনুষ্ঠান জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই উপযোগী। ইহাতে চিত্ত শুদ্ধি হয়; চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

জীব ভগবদ্বচনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বলিলেন, "দেব, এরূপ বাহ্যাবলম্বন ভক্তি ভাবের উদ্দীপক, অথচ জ্ঞানোন্নতির প্রতিবন্ধক নহে। নিম্ন এবং উচ্চাধিকারী সকলেই ইহার সাহায্য লইতে পারে। বস্তুতঃ যাহারা অজ্ঞান মূঢ়, কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকা অথবা নদী পর্ব্বত বৃক্ষ এবং অগ্নি ও সূর্য্য ইত্যাদির পূজা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী এবং জ্ঞানসঙ্গত সাধন প্রবর্ত্তিত না থাকায় তাহাদের এই অজ্ঞানতা দোষ মার্জ্জনীয়; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানী বিচারনিপুণ ধর্ম্মযাজক ও যজমানগণ যে লোকশিক্ষাদানের ভান্ করিয়া নিম্নাধিকারীর অবলম্বিত প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করেন ইহা ক্ষমার অযোগ্য।

ব্রহ্ম। অবশ্য তাহাদিগকে কৃপার পাত্র বলিতে হইবে। কারণ, তাহারাও দিব্যজ্ঞানাভাবে এক প্রকার অজ্ঞানবৎ এবং সংসারাসক্তিবশতঃ মোহান্ধ। সামান্য স্বার্থানুরোধে জড় পূজায় প্রশ্রয় দিয়া তাহারা গুরুশিষ্য উভয়ে জড়বৎ হইয়া যায়।

জীব। আচ্ছা, প্রচলিত দেবদেবী সকল যদি হইল কল্পিত, তবে অবতারগণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহারাও কি উপাস্য নহেন?

ব্রহ্ম। মানবকুলের উদ্ধারার্থ তাঁহারা আমার প্রেরিত দূত স্বরূপ, যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, জীবসাধারণের দর্পণ বিশেষ। তাঁহাদের স্বচ্ছ পবিত্র ভক্ত-চরিত্রের ভিতর আমার স্বভাব ও অভিপ্রায় প্রতিবিম্বিত হয়। তোমাদের তাঁহারা শিক্ষক এবং অনুকরণীয় আদর্শ, সাধনের সহায়, পথপ্রদর্শক; কিন্তু মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান, কিংবা উপাস্য পরিত্রাতা কেহ নহেন।

—— ——

জ্ঞানযোগ—৯ম অধ্যায়।

—:০—:০—

সাধনকৌশল।

জীব বলিলেন, "হে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, আধ্যাত্মিক যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সাধনের পক্ষে বাহ্য প্রকৃতি ও শরীরকে এক প্রধান প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হয়। ভৌতিক পদার্থ এবং অবস্থার সহিত পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ বশতঃ দেহের অবস্থান্তর এবং ভাবান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তেরও ভাবান্তর ঘটে, এই জন্য অবস্থানির্ব্বিশেষে অন্তঃকরণের সাম্য রক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠে। দৈহিক দুঃখ বেদনা এবং মানসিক বিকার চাঞ্চল্য দূর করিবার কোন সাধনকৌশল আছে কি?

ব্রহ্ম। কিয়ৎ পরিমাণে আছে। এই জন্য প্রাণায়াম সাধন, শম দম বৈরাগ্য বিচার এবং শীতোষ্ণদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতার কথা সাধকেরা এ দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে বার বার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রোমান কাথলিক সন্ন্যাসী, ষ্টোয়িক ও সক্রেটিস্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা এবং ভরতাদি যোগী তপস্বীরা প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহকে আত্মবশীকৃত এবং সর্ব্বসহিষ্ণু করিবার জন্য অতিশয় কঠোর সাধন করিতেন, ভোগ সুখ বিলাস বাসনাকে বিসর্জ্জন দিতেন,

তিতিক্ষা সন্তোষ যোগ সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। সাংসারিক মোহ এবং শরীরকে অধিক প্রশ্রয় দিলে যোগভ্রষ্ট ও শান্তিহীন হইতে হয়। পরিবার পালন এবং দেহ পোষণের জন্য নিতান্ত যে সকল বস্তুর প্রয়োজন তন্মাত্রই আহরণ করিবেক; পৃথিবীতে তাহার প্রচুর পরিমাণে সমাবেশ ও বৈধ ভোগের ব্যবস্থাও আছে। সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম্মানুরাগের গুণে অবস্থাবিশেষে তাহারও সঙ্কোচ সাধন করা যায়। দেহের উপর আত্মার এতাধিক প্রভুত্ব আছে যে তদ্দ্বারা সমস্তই সহ্য হইতে পারে। এ জন্য আধ্যাত্মিক বীরত্ব এবং পুরুষকার বলের অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য নিতান্ত প্রয়োজন।

জীব। বর্ত্তমান সময়ের মনুষ্য সকল এ বিষয়ে অতিশয় কৃপাপাত্র। শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম এবং অপরাপর ভোগ্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন, অন্ততঃ অভ্যাসগত অভাবোপযোগী বস্তুসকল আয়ত্তাধীন থাকিলে মনে তাহাদের বেশ কৃতজ্ঞতা ও ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হয়, কিন্তু একটু অসুবিধা ঘটিলেই রাগ দ্বেষ বিরক্তি অসন্তোষ অভিমানে চিত্ত বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠে। এ বিষয়ে কি মানুষের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ কিছু আছে?

ব্রহ্ম। অভ্যাসের গুণে এবং কালবশে শরীরের সুখ দুঃখ আত্মার সুখ দুঃখ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা পরিণামে স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণ্য হয়। কিন্তু ভোগ্য বস্তু যথেষ্ট আছে বলিয়া যাহারা তাহাতে জীবন ঢালিয়া দেয়, এবং ইহা চাই উহা চাই, এ সকল না পাইলে আমার কিছুতেই চলিবে না, এইরূপে যাহারা দাবি দাওয়া করে, তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, প্রবৃত্তির বশীভূত; আমার ধর্ম্মবীর কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানেরা তাহাদিগের দুর্গতি অসহিষ্ণুতা দেখিয়া দুঃখিত হন। আমার দিকেই যাহার স্থির লক্ষ্য, সে আমার অনুরোধে সমস্তই সহ্য করিতে পারে। এবং আমার প্রসাদে তাহার সকলপ্রকার ক্ষতি পূরণ হইয়া যায়। কারণ, আমার একটী নাম ক্ষতিপূরণ।

জীব। তা সত্য, কিন্তু পরীক্ষাকালে কি তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল হয় না? রোগ যন্ত্রণা শোক সন্তাপ বেদনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, এবং অনিদ্রায় তাঁহারা কি ক্লেশানুভব করেন না? সেই পরিমাণে কি তাঁহাদের চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে না? এবং কোন প্রকার ইন্দ্রিয় প্রলোভন কি তাঁহাদের প্রবৃত্তি-বিশেষকে বিকারগ্রস্ত এবং চঞ্চল করিতে পারে না?

ব্রহ্ম। দৈহিক সুখেচ্ছা ও অভাববোধ বহু পরিমাণে অভ্যাসের অধীন, সাধকদিগের সে অভাব অনেক কম, তাঁহারা কোন রূপ অপ্রয়োজনীয় অভ্যাসের দাস হইতে চান না; এই জন্য বিক্ষেপের সম্ভাবনাও তাঁহাদের অতি অল্প। এ সম্বন্ধে যতই কেন অভাব কষ্ট হউক না, এক বৈরাগ্য এবং ভক্তিবলে তাহা প্রশমিত হয়। বৈরাগ্যের স্বাধীনতা বীরত্ব সম্রাট-দিগকেও পরাভূত করে।

জীব। কম হইলেও তাহার একটা সীমাত আছে? কোন কোন স্বাভাবিক অভাব পূরণ, এবং ক্লেশ বেদনা সন্তাপ দূর করিতেই হয়। শরীর ধর্ম্মত তোমারই অব্যর্থ নিয়মাধীন, তাহার স্বাভাবিক অভাববোধ আরত একবারে সমূলে ধ্বংস হইতে পারে না। বলপূর্ব্বক তাহার নৈসর্গিক ক্রিয়া বন্ধ করিতে গেলে ফল বিপরীত হয়; অস্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও আছে। স্বাভাবিক অভাব এবং তাহা মোচনের সঙ্গে ধর্ম্মের আবার অচ্ছেদ্য যোগও দেখিতে পাই।

ব্রহ্ম। তাহা সত্য। কিন্তু সাধনের প্রবল পেষণে, মুখ্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে দেহধর্ম্ম বহু পরিমাণে আত্মার অধীন হইয়া চলে। যোগবলের প্রভূত ক্ষমতা, তাহার ভিতর অনেক অলৌকিকত্ব আছে। অলঙ্ঘ্য দৈহিক ও ভৌতিক নিয়ম যদিও সাধু অসাধু সকলের দেহে আধিপত্য করে, কিন্তু সাধকদেহে তাহার একাধিপত্য নাই; ভক্তের ভাগবতী তনু আমার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বে রক্ষিত এবং কার্য্যক্ষম হয়। ব্রহ্মতেজে বীর্য্যবান্ কত ভক্ত অম্লান বদনে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

জীব। হাঁ শুনিয়াছি বটে, এবং নিজজীবনেও কিছু কিছু তাহার পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের অতীত। সকলের পক্ষে তাহা খাটে না।

ব্রহ্ম। যাহার যেমন সাধনানুরাগ সে তত পরিমাণে শীতোষ্ণদ্বন্দ্বসহিষ্ণু। অল্পাহার অনাহার অল্পনিদ্রা প্রভৃতি সহগুণ বহু পরিমাণে অভ্যাসসাপেক্ষ; সুতরাং তদ্বিষয়ক অসাধারণ ক্ষমতাকে সাধুতার পরাকাষ্ঠা বা উচ্চতর লক্ষণ মনে করিও না। এক জন দৈহিক কষ্ট অনেক সহ্য করিতে পারে, কিন্তু একটী অপমান বাক্যের যন্ত্রণা সহিতে পারে না। কেহ বা অত্যাচার

নির্য্যাতন কুটিল ব্যবহার কতক দূর সহ্য করিয়া শেষ অধৈর্য্য এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ক্ষমা শান্তি সহিষ্ণুতা যাহার যত বেশী তাহাকে সেই পরিমাণে বীর পুরুষ বলা যায়। দিব্যজ্ঞানের বিচারে যে বুঝিয়াছে, দেহাদিতে আত্মবোধ অবিদ্যার খেলা, সুতরাং সুখ দুঃখ, রোগ বেদনা, বিলাস বিহার কি স্তুতি নিন্দা সমস্ত মিথ্যা স্বপ্ন সমান; সংসার বা শরীর সংক্রান্ত কোন অভাব কষ্ট তাহার মোক্ষ প্রাপ্তির অন্তরায় হইতে পারে না। রোগ উপশমের আশায় যেমন অঙ্গবিশেষের ছেদন ভেদন লোকে সহ্য করে, তেমনি নিত্য শান্তি সম্ভোগ লালসায় সাধক দৈহিক সর্ব্ব প্রকার কষ্ট বহনপূর্ব্বক যোগে চিত্ত সমাধান করিবার জন্য ব্যাকুল হন। পরমার্থত বহু দূরের কথা, সামান্য অর্থের জন্য সৈনিকেরা কি না সহ্য করিয়া থাকে? অনুরাগের বস্তুতে আসক্তি ঘনীভূত হইলে তল্লাভার্থ কোন কষ্টেই কষ্ট বোধ হয় না। সহিষ্ণুতা এবং বেদনা সে স্থলে সমান বলশালিনী হইয়া পড়ে। আমার অনুরোধে কষ্ট যন্ত্রণা, ত্যাগস্বীকার অনেক সময় উৎসাহ আনন্দে পরিণত হয়।

জীব। তবে কি রেচক পূরক কুম্ভক এবং পঞ্চতপ প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধন এ জন্য আবশ্যক নহে? তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদিতে অভ্যাস হইবারত কোন উপায় দেখা যায় না।

ব্রহ্ম। ধর্ম্মানুরাগ, যোগ ভক্তি বৈরাগ্য বৃদ্ধির জন্য বলপূর্ব্বক দেহ নিগ্রহের নিমিত্ত কোন দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর কৃত্রিম সাধনের প্রয়োজন নাই। আমি জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে তৎ সমুদায়ের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, বিশ্বাস এবং ধৈর্য্য সহকারে তাহা বহন করিতে পারিলেই তপস্যার ফল পাইবে। স্বভাবের নিয়মে, অবস্থারগতি-স্রোতে কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাপনি যখন যে বিপদ পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইবে, জয় ব্রহ্ম জয়! বলিয়া তাহা মস্তক পাতিয়া লইও। ইচ্ছাশক্তির বীরত্ব থাকিলেই সব দুঃখ তাপ নিবারণ করা যায়। প্রতি জীবনে ইহার পরিমাণের ভিন্নতা আছে। আমাতে যাহার পূর্ণ বিশ্বাস নির্ভর সেই কেবল এই শক্তি লাভ করিতে পারে। পঞ্চতপঃ কিংবা প্রাণায়াম প্রভৃতি কৃত্রিম সাধন দ্বারা কেহ দৈববলে বলী কিম্বা আমার ইচ্ছযোগে যোগী হইতে পারে নাই।

কেবল ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে স্থাণুর ন্যায় জীবন যাপন আমার অভিপ্রেত নহে। নির্ব্বিকল্প সমাধি কিংবা যোগে লয় হইবার জন্য যাহারা ইন্দ্রিয়দিগকে একবারে সংহার করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় তাহারা এক প্রকার আত্মঘাতী। তাহা বস্তুতঃ যোগ নহে, বিয়োগ। যোগের অর্থ দুই বস্তুর মিলন। যে আমার যোগে যুক্ত হয় সে অনন্ত জীবন পায়। আমি যেমন চির জীবন্ত কর্ম্মশীল, যোগী আত্মাও তদভাবাপন্ন। নিষ্কর্ম্মা নির্ব্বিকল্প নির্গুণ ব্রহ্ম যাহাদের জীবনাদর্শ তাহারা নির্ব্বিকল্প সমাধিকে চরমধর্ম্ম মনে করে। বার্দ্ধক্যে যখন কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল বিকল হয় তখন যোগে চিত্ত সমাধান প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু তাহাও নিদ্রা কিম্বা নির্ব্বাণ নহে। জ্ঞান পদার্থ কোন কালে নির্ব্বাপিত হয় না। বাহ্যযোগ রহিত হইলেও অন্তরযোগে আমার শান্তিবক্ষে সাধক বিহার করে। যত দিন দেহ মন কার্য্যক্ষম থাকিবে তত দিন আমার ইচ্ছাযোগ তুমি সাধন করিবে, পরে দেহভঙ্গ হইলে আধ্যাত্মিক নিত্যযোগে যুক্ত থাকিবে। বলপূর্ব্বক নিশ্বাসরোধ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে যে যোগানুষ্ঠিত হয় তাহা আমার সহিত বিয়োগ বিচ্ছেদের কারণ। অতএব সংসার, পরিবার এবং জনসমাজে থাকিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা শক্তি অনুসারে জীবদ্দশায় জীব আমার আদেশ পালন করিবে। সময়ে সময়ে কেবল বিজন বনে কিম্বা পর্ব্বত শিখরে আত্মদর্শন ও গভীর ধান ধারণা শিক্ষার্থ অবস্থিতির প্রয়োজন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষা প্রলোভন প্রতিবন্ধক রাশির মধ্যে থাকিয়া যে শান্তি, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা সন্তোষ এবং ব্রহ্মযোগের উপলব্ধি হয় তাহাই নিত্য সিদ্ধি। সে জ্ঞান, সে ভাব, নিরাপদে বনে বসিয়া লাভ করা যায় না। শান্তি এবং সিদ্ধি লাভের প্রার্থী অনেক ব্রতধারী পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়মের প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ ক্রমে বহু বহু নিয়ম বিধি বাহ্যানুষ্ঠানে চিত্ত বিভক্ত, এবং মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তখন উপায় গুলিই উদ্দেশ্য হইয়া উঠে, প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আমাতে ঐকান্তিকতা তাহা আর মনেও থাকে না। আমার প্রদর্শিত পথ সমস্ত স্বভাবের ভিতর দিয়া, কৃত্রিম কৌশল তাহাতে নাই। যোগে চিত্ত নিমগ্ন হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি আপনি মন্দীভূত হইয়া আইসে, মনাদি ইন্দ্রিয়গণ তখন শাসনে থাকে,

তাই বলিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ, ইন্দ্রিয় বিনাশ যোগমার্গ আরোহণের প্রকৃত পন্থা নহে। নেতি ধৌতি, রেচক পূরক কুম্ভক ইত্যাদি রাজ যোগ হটযোগ, এবং কৃচ্ছ্র সাধনে যাহারা অনুরাগী তাহারা উহা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, আমার অব্যবহিত সন্নিধানে' পৌঁছিতে পারে না। যে যে কারণ দ্বারা যে যে কার্য্য সিদ্ধির ব্যবস্থা আমি করিয়াছি তাহা মূলতঃ আমার ইচ্ছাসম্ভূত, কেবল উপাদান কারণ তাহা নহে; কিন্তু প্রাকৃতিক এবং নৈসর্গিক নিয়মের ক্রিয়াপ্রণালী এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখিয়া লোকে যে বুদ্ধি শক্তি কৃত্রিম কৌশল, ব্যতিরেক সাধন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহার অনুকরণ করে তাহার ফল তাদৃশ পুষ্টিকর এবং সুস্বাদ নহে। যদিও স্বভাবের অভাব তাহা দ্বারা কতক পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু বালুকাসংযোগে পর্ব্বত শৈল, উত্তাপরহিত সলিল দ্বারা অনন্ত হিমানী এবং বাষ্পসংযোগে মেঘ বৃষ্টি কি কেহ উৎপন্ন করিতে পারে? সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংহার বা নিশ্বাস রুদ্ধ প্রণালীতে চিত্ত স্থির যদিও হয়, কিন্তু জীব ব্রহ্মের ইচ্ছাযোগ তাহাতে সম্পন্ন হয় না। দেহরক্ষার্থ প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আমি নিরন্তর প্রাণ সঞ্চার এবং অসীম বায়ুসাগরে এই জীবনতরী পরিচালিত করিতেছি। ইহার তুল্য সাধনের সহজ সূক্ষ্ম এবং নিকটস্থ উপায় আর নাই। একাগ্র চিত্তে তৎ সঙ্গে যখন তখন কেবল "হরি ওঁ" মহামন্ত্র জপ করিবে।

জীব। মানবীয় বল বুদ্ধির কার্য্যকে কি স্বভাবের অন্তর্গত বলা যায় না? তদ্দ্বারা স্বভাবের অভাব পূর্ণ না হউক, মানুষের অনেকানেক আশু উপকার হয়। যেমন কলের বরফ, কাঠের পা, মিনারেল্ টিথ্, কাচের চোখ ইত্যাদি। প্রকৃতির অন্ধ শক্তি এবং পুরুষের জ্ঞান শক্তির মূলে ত তুমিই বর্ত্তমান আছ।

ব্রহ্ম। তাহাতে আর সন্দেহ কি। উভয়ের সাহায্যেই সৃষ্টির ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে। একা অন্ধ শক্তি দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক এবং কৃত্রিমতার কার্য্যফলের মধ্যে গভীর তারতম্য আছে। মানববুদ্ধি উপাদান কারণপরম্পরার বিচিত্র বিমিশ্র সংযোগ বিয়োগে অনেকানেক কার্য্যফলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। তাহারা

বন্য ফল ফুল শস্য, জীব জন্তুর অন্তর নিহিত বিকাশ শক্তিকে চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম এবং বুদ্ধি কৌশলে বিকসিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে আত্মোন্নতি, যোগসিদ্ধি, ভক্তি প্রেম বৃদ্ধি বিষয়ে কোন কৃত্রিম কৌশল খাটে না; এখানে জীবাত্মার বিশ্বাস নির্ভর এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাদেশ এবং কৃপাশক্তিতে যাবতীয় কার্য্যফল সমুৎপন্ন হয়। তবে আমার প্রত্যাদিষ্ট সাধন এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিকৌশলও আছে। সে শুভ বুদ্ধিও আমার সাক্ষাৎ প্রেরণার নামান্তরমাত্র জানিবে।

জীব। ধর্ম্মজীবনের পতনোত্থানের অবস্থায় এক একবার এমন জ্ঞান হয় যেন আমার কোন শক্তি সামর্থ্য আশা ভরসা নাই, সর্ব্বতোভাবে আমি যেন অবস্থার দাস।

ব্রহ্ম। তাহা ভ্রমাত্মক জ্ঞান। কোন অবস্থাতেই মনুষ্য শক্তিশূন্য নহে। নিদ্রিত নির্জ্জীব আত্মোদ্যম চেষ্টা দ্বারা সে পুনঃ পুনঃ সজীব হয়। মানবাত্মা সময় বিশেষে মৃতবৎ হইলেও তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়। ভস্ম ঝাড়িয়া ফেল, ভিতর হইতে জ্বলন্ত অগ্নি বাহির হইয়া পড়িবে। বিকৃতির অবস্থায় কেবল তাহাকে বার বার নাড়া চাড়া করিতে হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত বাহকেরা মাঝে মাঝে গীত গায়, হুঙ্কার শব্দ করে কেন? তাহা দ্বারা নববলে তাহারা নবীভূত হয়। আমি স্বয়ং সাধকের বল শক্তি, সে ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগৎ দর্শন করে। এই দৃষ্টিই স্বর্গ, এবং দৃষ্টিই নরক। প্রতি জীবে ও পদার্থে যে আমাকে দেখে তাহার আর ভয় প্রলোভনের সম্ভাবনা কোথায়? পাপাত্মার চক্ষে যাহা পাপোত্তেজক, বিশ্বাসী সাধকের চক্ষে তাহা পুণ্যের প্রস্রবণ; এই জন্য সে সর্ব্বদা আমার বলে বলীয়ান্।

জ্ঞানযোগ—১০ম অধ্যায়।

—০ঃ—ঃ০—

অলৌকিক ক্রিয়া।

তত্ত্বরসপিপাসু মহাত্মা শ্রীজীবের অন্তরের অন্তরতম গূঢ় বিজ্ঞানময় কোষ যখন উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, তিনি তখন আপনাকে একটী পুঞ্জীভূত অতি বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডাররূপে উপলব্ধি করিলেন। অতঃপর পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের সহিত নিখিল বিশ্বের সম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান হইল যেন এক অদ্ভুত ভোজবাজীর বিশাল তরঙ্গের মধ্যে তিনি ভাসিতেছেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিচিত্রকর্ম্মা মহাপুরুষ, তোমার কীর্ত্তি সকল অতীব আশ্চর্য্য অলৌকিক। তোমারই প্রসাদে শুনিয়াছি মুক্তাত্মা সাধুরা অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য করেন, সে কিরূপ?

ভগবান। যাহা অলৌকিক তাহাও বিশ্বজনীন গুপ্ত নিয়মের অন্তর্গত। সচরাচর তোমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর বলিয়া মনে কর তাহার ভিতরেও অনন্ত রহস্য আছে।

জীব। তাইত দেখিতেছি! কোথায় সেই তরল বাষ্পরাশি, আর কোথায় এই আধুনিক জ্ঞানোন্নত সুসভ্য মানব সমাজ! কোথায় সেই আদিম অশিক্ষিত মানব পরিবারের অস্ফুট ভয়মূলক নীতির আভাস, আর কোথায় এই সমুন্নত ধর্ম্মমণ্ডলী, পবিত্র প্রেমপরিবার, দেবচরিত্র সাধু জীবন! আমরা সচরাচর কারণানুসারে কার্য্যফল মিলাইয়া দেখি, কিন্তু কারণের ভিতরকার নিগূঢ় অব্যক্ত কারণগুণ কিছুই বুঝি না।

ভগবান। তুমি নিজ সীমামধ্যে থাকিয়া অনন্ত বিশ্বরাজ্যে শিশু বালকবৎ সুখে বিচরণ কর, ক্রমশঃ আরো অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবে।

জীব বলিলেন, "হে গুণধাম, আশ্চর্য্য দেবতা, আমাকে আশ্চর্য্য

ক্রিয়ার গূঢ় তত্ত্ব কিছু বুঝাইয়া দাও। সচরাচর স্বভাবের নিয়মে যাহা ঘটিতেছে তাহা সকলেই জানে এবং জানিবার অধিকারী, কিন্তু বড় বড় ভক্ত মহাজন ও সিদ্ধ পুরুষেরা তাহা ছাড়া বহুবিধ অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া থাকেন, সে গুলি কি বিশ্বাস ভক্তির ফল? না তাহার অন্য কোন কৌশল আছে? তোমার সৃষ্টির নৈসর্গিক নিয়ম সকল যদিও অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য, কিন্তু ধর্ম্মজগতে শক্তিসঞ্চার ব্যতীত কেবল নৈতিক নিয়ম, সাধন বিধি, শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রচার আচারে চিরদিন কাহারো কৌতূহল বিস্ময়রস দৈবভাব উদ্দীপন করিতে পারে না।

ভগবান। অলৌকিক ক্রিয়া তুমি কোন্ গুল মনে কর?

জীব। এই যেমন, দুশ্চিকিৎস্য উৎকট কোন ব্যাধি মন্ত্রবলে রাতারাতি ভাল করা। যে ছিল অন্ধ বধির কিম্বা মূক খঞ্জ, সাধুর অঙ্গস্পর্শে তাহারা দেখিতে শুনিতে চলিতে বলিতে পারিল। মূর্খ জ্ঞানী এবং দুঃখী হঠাৎ ধনী হইল। কেহ বা ভবিষ্যতের এবং মনের কথা বলিয়া দিলেন। যে ছিল সন্তানহীনা বন্ধ্যা মন্ত্রৌষধ বলে তাহার সন্তান জন্মিল, মৃত ব্যক্তি জীবন পাইল। অজানিত ভাষায় কথা কওয়া, রূপান্তর হওয়া, আকাশে উঠা, সহস্র বর্ষ জীবিত থাকা ইত্যাদি অসাধারণ শক্তি যাহাদের আছে, বিশেষতঃ যাহারা দুরারোগ্য ব্যাধি দৈববলে ভাল করিয়া দিতে পারে তাহাদের প্রতি লোকের সহজেই ভক্তি হয়। এ সকল কৌশল শিক্ষার কি কোন উপায় আছে?

ব্রহ্ম। তুমি কি এই সকল কৌশল শিখিয়া শিষ্য বৃদ্ধি করিতে চাও?

জীব। আজ্ঞে না ঠাকুর, গুরু হবার আমার সাধ নাই। তুমি পরম গুরু, ইহাই যথেষ্ট। তবে কি না কথাটা এই যে, এ যুগের লোক বিশেষতঃ শিক্ষিত চতুর লোকদিগকে বুদ্ধি যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া সাধনের পথে আনা বড় কষ্টকর, তাহাতে ফলও বড় দেখিতে পাই না, কিন্তু একটা কোন রকম অলৌকিক কার্য্য দেখাইতে পারিলে অচিরে তাহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধন করা যায়। তাহাতে সহজে বিশ্বাস ভক্তি বাড়ে এবং চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটে। অনেক হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবেরা এই রূপ দৈবক্রিয়া দেখিয়া

সাধু মহান্ত হইয়া গিয়াছেন এবং পরে তাঁহারা নিজেরাও আবার অনেক অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছেন।

ব্রহ্ম। আমার যাহারা ভক্ত, যাহারা কেবল আমারই জন্য তৃষিত, তাহাদের এ প্রকার কোন স্পৃহা থাকে না। নিষ্কামা ভক্তি সহকারে তাহারা চির দিন আমাকেই চায় এবং আমাতেই তৃপ্তকাম হয়। যাহারা বিভূতি যোগ কিম্বা যোগাষ্টসিদ্ধি লাভের প্রয়াসী তাহারা আপনাপন গূঢ় স্বার্থ সিদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্যই সর্ব্বদা লালায়িত। সুতরাং লোভ ও অহঙ্কার বশতঃ পরিণামে তাহারা মহা বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। তবে আমার শরণাগত বিশ্বাসী ভক্তগণের অন্য বিধ অলৌকিকী ক্ষমতা থাকে। তাঁহারা যে সকল আশ্চর্য্য কার্য্য মৎকৃপাবলে সম্পাদন করেন তাহা দেবগণের পক্ষেও বিস্ময়কর। তাহার কর্ত্তা আমি স্বয়ং।

জীব। আমি যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা বলিলাম তাহা অপেক্ষাও আর কি কোন প্রকার অলৌকিক কার্য্য আছে?

ভগবান। তুমি যাহা বলিলে, তাহাত আজ কাল মূক, অন্ধ এবং বধির বিদ্যালয়ে, চিকিৎসালয়ে বিজ্ঞানবলে কতই হইতেছে! টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, টেলিফোঁ, টেলিপ্যাথি, ফনোগ্রাফ এবং বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে শত বর্ষ পূর্ব্বে কি তাহা নিতান্ত অসম্ভব দৈবকার্য্য বলিয়া লোকের মনে হইত না?

জীব। প্রকৃত ভক্তগণ কর্ত্তৃক তবে কিরূপ অলৌকিক কার্য্য হয়?

ভগবান্ স্মিত মুখে দেবভাষায় বলিলেন, "বৎস শ্রীজীব, মানুষ যাহা বিজ্ঞানকৌশলে বুদ্ধিচাতুর্য্যে সম্পন্ন করিতে পারে তাহা মানবীয়; দৈবক্রিয়া বিশ্বাসবলে অধ্যাত্মজ্ঞানে সম্পন্ন হয়। আমার যাহারা পরম ভক্ত তাহারা বিদ্যালয়ে শিখিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করে না, ধন জন ছল কৌশল তাহাদের নাই। কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্য অসহায়তা নির্য্যাতন অবমাননা ইত্যাদি তাহাদের অঙ্গের ভূষণ। অথচ সুসময়ে শুভযোগে যখন তাহাদের মুখ হইতে একটী সত্য উপদেশ, বা অভিনব তত্ত্ব বাহির হয় তদ্দ্বারা জগতে মহাযুগপ্রলয় ঘটে। অর্থাৎ আমার ইচ্ছার অধীন যে ব্যক্তি, এক দিকে সমস্ত প্রকৃতি তাহার অনুকূল। ভক্তগণ আমার

ইচ্ছাযোগে ভক্তিবলে হনুমানের ভিতর হইতে মনুষ্য, মনুষ্যের ভিতর হইতে দেবতা বাহির করেন। কল্য যে ছিল নরাধম পাষণ্ড, ধর্ম্মকে যে পরিহাস করিত, অদ্য সে সাধুসঙ্গগুণে নিজ অপরাধ স্মরণ করত কাঁদিয়া ভূমি লুটাইতেছে, পূর্ব্বের সমস্ত পশু ভাব ছাড়িবার জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছে। তখন তাহার চক্ষের এক এক বিন্দু অনুতাপ অশ্রুতে যেমন রাশি রাশি পাপ ধৌত হইয়া যায়, তেমনি সেই সঙ্গে তাহার ভিতর হইতে দেবশ্রী সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে; ইহা কি অতিশয় আশ্চর্য্য ক্রিয়া নহে ?”

জীব। হাঁ ঠাকুর, ইহার তুল্য আশ্চর্য্য আর কিছু নাই। তোমার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। আমারও ইচ্ছা হইতেছে, অমনি করিয়া আমিও কাঁদি। আহা! তোমার বিরহে ভক্ত যখন নিতান্ত ব্যাকুল হন, আর পাপ স্মরণ করিয়া মুক্তির জন্য যখন পাপীরা কাতর হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করে, তখন তাহাদের চক্ষের সেই এক এক ফোঁটা জল যেন স্বর্গের অমৃত। পার্থিব সুখভোগী বিলাসী বদ্ধ জীবের অট্ট হাসি অপেক্ষা অনুতপ্ত পাপীর কিম্বা দর্শনবিরহে ব্যাকুল সাধকের ক্রন্দন আমার পরম প্রার্থনীয়।

ভগবান পুনরায় মৃদু গম্ভীর নাদে বলিতে লাগিলেন, “হে সাধু যুবা দৈবশক্তির মহিমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করিলে, তবে আরো বলিতেছি শ্রবণ কর। বুদ্ধিকৌশলে, অর্থবিত্তে, প্রচুর ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে কিম্বা পার্থিব ক্ষমতা শক্তিতে অন্তরের যে অভাব অশান্তি দূর হয় না, নিমেষমধ্যে ভক্তের একটী সরল প্রার্থনা দ্বারা তাহা হইয়া থাকে। মানবহৃদয়ে আমি ভিন্ন শান্তি দিতে আর কেহ পারে না। পতিপুত্রশোকে যে নারী উন্মাদিনী প্রায় কাঁদিতেছিল সে আমাকে ডাকিয়া শোক বেদনা ভুলিয়া শেষ দেখিল, মৃত্যু অমৃতেতে পরিণত হইয়াছে। এবং তাহার প্রিয় প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমাতে স্থিতি করিতেছে। আশাহত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে মানুষ আপনার পূর্ব্বকৃত পাপ দুর্গতি স্মরণপূর্ব্বক ভগ্ন হৃদয়ে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, আমার ভক্তের মুখে একটী সুমিষ্ট আশা বাক্য শুনিয়া সে পরম সান্ত্বনা লাভ করিল। তখন সে বলে, আর আমার সুখৈশ্বর্য্য মান সম্ভ্রমে, কুটুম্ব

স্বজনে কাজ নাই, আমি বৃক্ষতলে বসিয়া হরিগুণ গানে চিরসুখে জীবন কাটাইব। উৎকট ব্যাধিতে যে দিন রাত্রি হাহাকার করিত, কবে মরিব এই কেবল যাহার একমাত্র ভাবনা এবং আশা প্রত্যাশা ছিল, সে একবার দৈবপ্রভাবে যাই বলিল, "মাগো জগদম্বে! রক্ষা কর মা।" অমনি তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া গেল। এক জন বহু দিন সাধন করিয়াও অকৃতার্থের ন্যায় কাল হরণ করিত; দৈবের কোন ক্ষমতা নাই, জপ তপ সাধন ভজনে পাপ যায় না, সিদ্ধি মুক্তি লাভ হয় না এই ভাবিয়া পুনরায় শেষ অবিশ্বাস এবং পাপকূপে পড়ে পড়ে এমন সময় তাহার স্ত্রী এবং এক মাত্র পুত্রের মৃত্যু হইল। তখন সেই দুর্ঘটনা হঠাৎ তাহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। তখন আমার পুরাতন সাধক আত্মবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক ভূমি লুটাইয়া বলিতে লাগিল, "দয়াময়, এইবার ঠিক হইয়াছে, এখন তুমি আমাকে নূতন করিয়া গঠন কর এবং চিরদাসত্বে বাঁধিয়া শ্রীচরণে স্থান দাও।"

শ্রীজীব এই সকল লোমহর্ষণ হৃদয়ভেদী মহাবাক্য শুনিয়া সচকিত এবং স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, যথেষ্ট হইয়াছে, আর আমি শুনিতে চাই না।" এই বলিয়া ব্রহ্মপদে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন, এবং বুঝিলেন, ইহা অলৌকিক বটে।

ভগবান বলিলেন, "শুন শুন, আরো বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যে ভক্ত আমাতে আত্ম সমর্পণ করে, তাহার কোন সাধু কামনা অপূর্ণ থাকে না। আমি ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের যাহা কিছু অভাব হয় সে সমস্ত আমিই পূর্ণ করিয়া থাকি। কত পথের ভিখারী কাঙ্গাল জনের প্রার্থনায় জগতে কত কত মহৎ কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা কি জান? ভক্তেরা নিজে দরিদ্র হইয়া কত রাশি রাশি ধন বিলাইয়া গিয়াছেন। যাহার একটী কপর্দ্দক সম্বল ছিল না আমি তাহার হস্তে নরপতি সম্রাটের প্রচুর ধনভাণ্ডারের চাবি দিয়াছি। যাহারা ছিল নিরক্ষর তাহাদের এক একটি প্রত্যাদিষ্ট বচনে পৃথিবীতে শত শত জ্ঞানশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। যাহারা ছিল ফকির তাহারা এখন রাজার রাজা আমির। অধিক কি, আমার যে ভক্ত, যে আমার জন্য সর্ব্বস্ব

ত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহার আহার অন্বেষণ করিয়া আনি, এবং নিজে তাহা তাহার মুখে তুলিয়া দিই; শিশুর মত সে আমার কোলে মানুষ হয়। এক সময় যে পরিত্যক্ত ঘৃণিত ছিল. অন্য সময় সে আবার জগতের মৎ সদৃশ পরমপূজ্য। আমার যে দৈবী মায়াশক্তি তাহার প্রভাব অনতিক্রমণীয়। বড় বড় বীরপুরুষ, মহামহা জ্ঞানী ঋষি তপস্বী পর্য্যন্ত পার্থিব রূপ রসের প্রভূত পরাক্রম, এবং প্রলোভনে পরাস্ত হয়, কিন্তু আমার নিবৃত্তি মার্গের যোগী সাধকের যোগদৃষ্টিতে তৎসমুদায় অতীব হেয় অপদার্থ। সাধারণ বদ্ধজীবগণ যে মায়ার প্রভাবে ক্রীড়া পুত্তলির ন্যায় হাস্য ক্রন্দন করে, জ্ঞানবৃদ্ধ সিদ্ধপুরুষেরা তাহার উপরে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হন; ভবসমুদ্রের তরঙ্গ তুফানে তাঁহাদিগকে বিচলিত করতে পারে না। আমার নিত্য নির্ব্বিকার স্বরূপে স্থিত ঈদৃশ মহাত্মাদিগকে সমস্ত বিশ্ব পরিচারিকার ন্যায় পরিচর্য্যা করে।

শ্রীজীব অবাক্ হইয়া এই সকল কথা শুনিলেন এবং নিজের অজ্ঞানতা এবং অল্প বিশ্বাসের জন্য অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হইলেন। পরে বলিলেন, "বাস্তবিক অস্বাভাবিক অলৌকিক ক্রিয়া কি কিছু আছে? না দৃষ্টিভ্রমবশতঃ এইরূপ মনে হয়?

ব্রহ্ম। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া এক জনের প্রতি একবার বিশ্বাস জন্মিলে সে যাহা বলে, যাহা করে অন্ধানুগতদিগের নিকট তাহাই আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। ঈদৃশ বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য লোকে প্রথমে উদ্ভট বেশ ভূষা ধারণ করে, দেহ এবং ইন্দ্রিয়দিগকে কৃত্রিম কৌশলে স্বভাব-বিরুদ্ধ কোন কোন কার্য্য শিক্ষা দেয় এবং অঙ্গভঙ্গী বাক্‌চাতুরী দ্বারা তার পর দুই একটা বুজরুগি দেখায়, তৎসঙ্গে দুর্ব্বোধ ভাষায় কথা কয়; এইরূপে শেষে সে অল্প বুদ্ধি লোকদিগকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করে। আমার নাম লইয়া এইরূপ তাহারা করিয়া থাকে। ইহার ভিতর আত্মপ্রবঞ্চনা, লোকপ্রতারণা, লোভ দুরভিসন্ধি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবে।

জীব। এরূপ উপায়ে যদি অবোধ জনসাধারণ কিম্বা সর্ব্বসংশয়ী অবিশ্বাসী জ্ঞানীসমাজকে ধর্ম্মপথে আনা যায় তাহাতে কি কোন দোষ আছে?

ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি আমার নিকট তাহাদিগকে পৌঁছিয়া দিবার জন্য বাস্তবিক ব্যাকুল হয় সে আমার প্রদত্ত কৃপা সাহায্যেই তাহা করিতে পারে। সয়তানের কুটিল বুদ্ধিতে স্বর্গরাজ্য সমাগত হয় না। যাহারা বুজরুগি দ্বারা লোক বশীভূত করে, তাহারা আমাকে সর্ব্বাগ্রে বিদায় করিয়া দেয়, তার পর সশিষ্যে নরকে ডুবিয়া মরে।

জ্ঞানযোগ—১১শ অধ্যায়।

দ্বৈতাদ্বৈত বিভেদ।

জীব পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করত উচ্ছ্বসিত ভাবাবেশে উৎফুল্ল অন্তরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সর্ব্বভূতময় শ্রীহরি, এক এক বার ভাবি, বস্তুতঃ তুমি আর আমি একই; ব্যবহারিক এই যে অহংজ্ঞান ইহা কেবল সাক্ষী গোপাল মাত্র উপলক্ষ। আবার অন্য সময় তোমার লীলারহস্যের ভিতর দ্বৈতভাবের সুস্পষ্ট আবির্ভাব দেখিতে পাই। দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং উভয়ের একতা ও পার্থক্য কিরূপ তাহা আমায় বুঝাইয়া দাও।

ব্রহ্ম। দুইই সত্য, এক হইতে দুই এবং দুইয়ের জ্ঞান ও ইচ্ছার মিলনে পরিণামে এক। মূলেতে এক ভিন্ন কিন্তু দ্বিতীয় নাই। লীলাতে দ্বৈত, নিত্যেতে অদ্বৈত, ইহাই সার সিদ্ধান্ত। তোমার ঐ যে স্বাতন্ত্র্য বোধ, উহার আদি অন্ত মধ্যে মূল কারণ ও শক্তিরূপে আমার চিরবিদ্যমানতা প্রতিষ্ঠিত আছে। দেশ কাল ছাড়া যেমন কোন জ্ঞান দাঁড়াইতে পারে না, আমাকে ছাড়িয়াও তেমনি কোন জ্ঞানক্রিয়া হয় না। জীবনের স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তিকে নিয়মিত শিক্ষিত এবং যথার্থ পথে পরিচালিত করিবার জন্য কতক ভার তোমার বুদ্ধিবিবেকবিশিষ্ট স্বাধীন ইচ্ছার হাতে দিয়া রাখিয়াছি। সেই স্থলে কেবল দ্বৈত ভাব।

জীব। সে স্বাধীনতাও আবার তোমার ইঙ্গিতে পরিচালিত না করিলে পদে পদে ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হয়। দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়ার উপর আমার স্বাধীনতা অতি অল্পই। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপরেই বা আমার কর্তৃত্ব কৈ? বরং মন্দ ইচ্ছাগুলি সাধ্যায়ত্ত, যখন তখন অনায়াসে তাহাদের সাহায্যে শরীর ইন্দ্রিয় বুদ্ধি জ্ঞান, এমন কি বিবেক ধর্ম্মবিশ্বাস পর্য্যন্ত আত্মবশে আনিতে পারি;—সে অবস্থায় "যা তুমি করাচ্ছ তাই আমি কচ্ছি" ইহা বলিয়া কে আপনাকে নিষ্পাপ মনে করিতে পারে?—কিন্তু পবিত্রতা সাধুতা ভক্তি প্রেম ক্ষমা বৈরাগ্য দিব্য জ্ঞান ইহারা আমার হাতে কেহই নাই।

ব্রহ্ম। সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা তোমার আছে, ব্যক্তিত্বের বিশেষ অধিকার ও দায়িত্বও আছে, আবার তদতিরিক্ত আমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা তোমার জীবনের মূলে, অন্তে, সমস্ত বিভাগে প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা যথার্থ কর্ম্মযোগী তাহারা স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা সজ্ঞানে ইচ্ছাযোগে আমার ইচ্ছার অনুগমন করে।

জীব। কিন্তু আমার এই যে ব্যক্তিত্ব বা স্বতন্ত্রতা ইহা কি কতক গুলি বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য পালনেই বদ্ধ নহে? তাহা যদি হয়, তবে কাজগুলি ফুরাইলে, দেহভঙ্গ হইলে আমার আর থাকিবে কি? যখন আমি ব্যাধির আক্রমণে মূর্চ্ছিত কিম্বা নিদ্রায় অচেতন থাকি, কিম্বা যখন বার্দ্ধক্য বশতঃ একবারে নিষ্কর্ম্মা হইব, অথবা দেহ ত্যাগ করিব, তখনকার ব্যক্তিত্বের অবস্থা কিরূপ?

ব্রহ্ম। দৈহিক জীবনের ইন্দ্রিয়ক্রিয়া এবং মানসিক ক্রিয়া রহিত হইলেই ব্যক্তিত্বের লয় হয় না। আমার নিত্য সত্তায় যোগ ভক্তিতে সাধকের যে লয়প্রাপ্তি তাহার অর্থ স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ নয়, ইচ্ছার একতা বা একাত্মতা। দৈহিক ক্রিয়াদির কর্তার যে ব্যক্তিত্ব তাহা একটী সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব, ইহা কি তুমি অনুভব কর না?

জীব। করি বটে, কিন্তু দেহেতে এখন আছি বলিয়াই করিতে পারি। পরে যখন দেহ লয় হবে তখন তাহার উপলব্ধি কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি না।

ব্রহ্ম। দেহান্ত না হইলে সে অবস্থার জ্ঞানের ধারণা এখন কিরূপে সম্ভব হইবে?

জীব। স্বপ্ন সুষুপ্তি রোগজনিত দৌর্ব্বল্য বা মূর্চ্ছার সময় পুরুষের কৈ কিছু কর্ত্তৃত্বত দেখিতে পাই না?

ব্রহ্ম। আমাতে জীবাত্মার জন্ম স্থিতি অমরত্ব ইহা যদি তুমি বিশ্বাস কর, তবে তাহার অশরীরি স্বাধীন ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে। নিদ্রাকালেও দেহীর চৈতন্য থাকে,—যদিও তাহা শ্রান্ত দেহের সহিত নিদ্রাচ্ছন্ন। গাঢ় নিদ্রাকালে অনন্ত চৈতন্যের কোলে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর ন্যায় জীবচৈতন্য অজ্ঞানে স্থিতি করে। তার পর আবার সে জাগিয়া উঠে। এই রূপে তাহার জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন প্রতিদিন আমাতেই সংঘটিত হইতেছে। আমি মাতার ন্যায় তাহাকে ঘুম পাড়াই এবং যথাকালে জাগাইয়া দিই। আমি চির জাগ্রত অনন্ত চৈতন্য। মরণের পর এইরূপ আবার এক জীবন আছে।

জীব। তা ঠিক। কিন্তু দেহান্তে পরলোকে কিরূপে থাকিব? তথায় ব্যক্তিত্বের কার্য্যই বা কিরূপে সাধিত হইবে? প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত আছে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সংযোগে পুরুষের বাসনাময় স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব বোধ জন্মে; পরে সেই বাসনাই দেহান্তে পুনরায় জন্ম প্রাপ্তির কারণ হয়, তখন আবার জীব নূতন দেহ ধারণ করে। তদনন্তর বহু জন্মের পর বাসনাবিরহিত হইলে তাহার আর জন্ম হয় না। সুতরাং প্রকৃতির সংসর্গ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকে কৈ?

জীবকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিলেন, "ব্যক্তি মানেই তুমি, অর্থাৎ মনুষ্যাত্মা; এক উপাদানসম্ভূত প্রতি শরীরের গঠনে যেমন বিশেষত্ব স্বাতন্ত্র্য আছে তেমনি প্রত্যেক চিদাভাস আত্মাও বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট স্বতন্ত্র এবং পৃথক্ পৃথক্। প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষোত্তমেরা নিজ নিজ জীবনের বিশেষ লক্ষণ ও উদ্দেশ্য সহজে আত্মজ্ঞানালোকে বুঝিতে পারেন। দেহের কোন ব্যক্তিত্ব বোধ নাই, আত্মচৈতন্যেরই কেবল তাহা আছে; ঐহিক জীবনে দেহেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া সেই ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণ লক্ষণ বাহ্য-ক্রিয়া যোগে বাহিরে প্রকাশ পায় মাত্র। তোমরা যে বলিয়া থাক, অমুক

ব্যক্তি বড় বিনয়ী, অমুক বড় প্রেমিক, অমুক বড় বিচক্ষণ জ্ঞানী, সৎসাহসী বিশ্বাসী বৈরাগী; এ সকল বিশেষ বিশেষ গুণ অবশ্য শরীরের নয়, আত্মারই। গুণক্রিয়া প্রকাশের বাহ্য প্রতিবন্ধক ঘটিলেও বস্তুর বিনাশ কল্পনা করিতে পার না। দেহ পার্থিব উপাদানে নির্ম্মিত এবং তাহাতেই আবার সে পরিণাম প্রাপ্ত হইবে; আত্মা সকল আমার স্বরূপে নির্ম্মিত এবং তাহাতেই সে চিরকাল জীবিত থাকিবে। দৈহিক জীবনীশক্তির সহিত তৎপোষণক্ষম বাহ্য উপাদান সমূহের সমতা রক্ষা না হইলে দেহের মৃত্যু হয়, ইহাই তাহার নিয়তি। কিন্তু আমার স্বরূপ সকল নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়; তাহা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অভেদ্য অবিভাজ্য অক্ষয় অব্যয়, সুতরাং তাহাতে সঞ্জাত, পরিপোষিত জীবাত্মাও তদ্‌গুণবিশিষ্ট; আমার স্বরূপ সকল অনন্ত, সুতরাং তদ্দ্বারা সুরক্ষিত জীবাত্মা সকল অনন্ত উন্নতিশীল। দেহের সহিত তাহার জন্ম আরম্ভ বটে, এবং দেহেন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতের সাহায্যে তাহার অধ্যাত্ম জ্ঞানের উন্মেষ হয় সত্য; তথাপি সে অমর দেহাতীত এবং অনন্ত উন্নতিশীল।”

মহান্ অর্থযুক্ত এই ব্রহ্মবাণী শুনিয়া জীব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, এবং ভগবৎপ্রসাদে জ্ঞানযোগের গভীরতার মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল ছবিখানি দেখিতে লাগিলেন; আত্মদর্শনে তখন তাঁহার অন্তরাত্মা অতলস্পর্শ পরমানন্দ সাগরে ডুবিয়া গেল। অতঃপর যোগনেত্রে তিনি দেখিলেন, অনন্ত গগনে যেমন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সকল নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, অনন্ত চিদাকাশে অনন্ত পরমাত্মার বক্ষে তেমনি অমরবৃন্দের স্থিতি এবং বিচরণ।

তখন ভগবান পুনরায় বলিলেন, “জ্ঞানযোগ সোপানে যতই আরোহণ করিবে ততই নিজের ও অধ্যাত্ম রাজ্যের অধিবাসী অমরগণের প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখিতে পাইবে। শিশু যেমন স্তন্যপানে পরিবর্দ্ধিত হয় তেমনি তাঁহারা দেশ কালের অতীত অবস্থায় অনন্তের স্নেহবক্ষে লালিত পালিত এবং পরিপুষ্ট হইতেছেন। চর্ম্মচক্ষে যেমন নিজ শরীরের কোন্ অঙ্গ কিরূপ তাহা চিনিয়া লইয়াছ, তেমনি আত্মজ্ঞানালোকে অন্তর দৃষ্টিতে আপনার আত্মাকে প্রথমে চিনিয়া লইতে হইবে। তাহার পর আত্মদর্পণ তপস্যাবলে

যতই নির্ম্মল স্বচ্ছ হইবে ততই তন্মধ্যে আমাকে এবং আমার ভিতরে অমরাত্মাগণকে দেখিতে পাইবে। তোমরা দর্পণের সাহায্যে এবং চর্ম্মচক্ষে অগ্রে কেবল দেহের বাহ্য স্থূল অঙ্গগুলিই দেখিতে, ক্রমে অণুবীক্ষণ এবং বৈদ্যুতিক আলোকে এখন বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া নরদেহের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী এবং যন্ত্রাদি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছ। ভবিষ্যতে আরো অদৃশ্য সূক্ষ্ম বিষয় দেখিতে পাইবে। বিজ্ঞানজগতে এই সকল নব নব নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া যেমন এখন হইতেছে, যোগবলে বিশ্বাস ভক্তির উজ্জ্বল আলোকে তেমনি আত্মার স্বরূপ লক্ষণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে।

জীব। চিদাভাস চিদ্বিন্দু এই যে মানবের ব্যক্তিত্ব ইহা "আমি" "আমার" ইত্যাকার শব্দে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে বাল্যকাল হইতে বড়ই বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সব মায়ার খেলা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু এমন সত্যও আরত কিছু দেখি না! এই আমিত্ব জ্ঞান তোমাকে পর্য্যন্ত বিদায় করিয়া দিয়া কেবল "আমি" "আমি" করে। আবার স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া যখন অন্তরে প্রবেশ করি, আত্মজ্ঞানসম্ভূত একত্ব বোধ ভিন্ন তখন দ্বৈতজ্ঞান কিছুই উপলব্ধি হয় না। তুমি, আমি, বিশ্ব সমস্ত যেন তখন একাকার অখণ্ড হইয়া যায়।

ব্রহ্ম। দ্বৈতভাব কেমন স্পষ্ট সত্য তাহা অনুভব কর। ইহারই ভিতর আমার লীলা এবং তোমার মুক্তি দুই অবস্থিতি করিতেছে। এই অহংবোধের একত্ব যখন বিকল্পরহিত হয় তখনি মুক্তি। পাপের পথ একবারে যদি বন্ধ করিতে চাও, তবে এই একত্ব জ্ঞান সাধন কর। লীলার সঙ্গে পিতা পুত্র, সেব্য সেবক, আশ্রয় আশ্রিত ভাব গ্রথিত আছে। ইহাও অতি স্পষ্ট। কিন্তু "আমি আমার নই, তোমার আমি" এই জ্ঞানে জীবন্মুক্তি। অহং মমত্ব যাবতীয় স্বার্থ ও পাপের নিদান, অথচ তৎসঙ্গেই তুমি যে আমার একান্ত আশ্রিত অধীন ভক্ত সেবক এই জ্ঞান অনুস্যূত আছে।

জীব। সাধন করিতে করিতে আমি শেষ তুমি হইয়া যাইব, এ কথার অর্থ কি? আমি যে তোমার সেবক প্রতিপাল্য এরূপ ভেদজ্ঞান কি সে অবস্থায় থাকিবে না?

ব্রহ্ম। নিশ্চয়ই থাকিবে। অনন্ত উন্নতি, অনন্ত জীবনের অর্থই তাই। টাকার সঙ্গে সিকি দুয়ানীর যেমন ঐক্য এবং পার্থক্য, জীব ব্রহ্মের একত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য তদ্রূপ।

জীব। তবে অহংজ্ঞানকে একবারে মিথ্যা বা ভ্রম কিরূপে বলিব?

ব্রহ্ম। ক্ষুদ্র শিশুটীর পর্য্যন্ত যখন অহং বোধ আছে তখন একবারে উহা মিথ্যা কিরূপে হইবে? অহংজ্ঞান বা ব্যক্তিত্ব বোধ যদি প্রতিজনের না থাকিত, সত্যের সাক্ষ্য কে দিত? তদ্ভিন্ন বিশ্বপরিবার শূন্য অন্ধকার। দেহাদিতে আত্মাভিমান অবিদ্যার খেলা, কিন্তু অহংজ্ঞান আমার লীলা প্রকাশক নিত্য সত্য। জগৎ যেমন মিথ্যা নহে, প্রকৃতির গুণত্রয়ও সর্ব্বময় কর্ত্তা নহে, জীবাত্মাও তেমনি অকর্ত্তা বা নির্গুণ নহে। আমার নিত্য সত্তার আশ্রয়ে ইহারা লীলা করিতেছে। এই লীলা এবং তাহার উপকরণ সামগ্রী গুলি চিরপরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু অহংজ্ঞান অভিনেতা এবং আমার প্রতিনিধি ও নিত্য সহচর।

জ্ঞানযোগ—১২শ অধ্যায়।

—ঃ০—ঃ০—

ভগবত্তত্ত্ব।

শ্রীজীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, তোমার স্বরূপ বিষয়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও সাধক-মণ্ডলীমধ্যে বহু বিধ বিচিত্র মত প্রচারিত দেখিতে পাই কেন? কেহ বলেন, তুমি নির্গুণ সত্তামাত্র। আবার কেহ পিতা কেহ মাতা, কেহ রাজা কেহ বন্ধু সখা, কেহ কেহবা পতি পুত্র জামাতা সম্বন্ধও তোমাতে আরোপ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানের চক্ষে দেখিলে কোন প্রকার মানবীয় সম্বন্ধ তোমাতে সংলগ্ন হয় না; কেন না, তুমি অতীন্দ্রিয় নিরাকার অশরীরি পরমাত্মা এবং সর্ব্বাতীত;

অথচ স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয়বিবেক তোমাকে পিতা মাতা সখা রাজা বিচারপতি বলিয়া তোমার শরণাপন্ন হয়; এবং অনন্ত চিদাকাশ স্বরূপ যে তুমি, তোমার সহিত ব্যক্তিগত ব্যবহারিক সম্বন্ধ অনুভব করিয়া থাকে। তদনন্তর সেই ব্যক্তিত্বকে পুনরায় দর্শনীয় এবং স্পর্শনীয় বাহ্য রূপে নির্ম্মাণ করত অধিকাংশ লোক প্রেম ভক্তি চরিতার্থ করে। পরস্পরবিরোধী এই দ্বিবিধ মতের মীমাংসা কিরূপ হইবে?

ব্রহ্ম। ইহার সামঞ্জস্য সিদ্ধান্ত আছে। দ্বৈতাদ্বৈত, নিত্য লীলা, একটী অখণ্ড বিষয়। যেমন কাগজের দুইটী পৃষ্ঠা। এক অথচ ইহা দুই। কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনা ও মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই প্রথমে লোকে আমার স্বরূপ লক্ষণের পরিচয় পায়। তদ্ব্যতীত সূক্ষ্মদর্শী যোগীদিগের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আর একটী অন্তরমুখীন পথ আছে। সাধারণতঃ দেশভেদে, প্রাকৃতিক অবস্থা, শিক্ষা, এবং মানসিক গঠনের বিচিত্রতানুসারে আমার সহিত সম্বন্ধ অনুভবের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। সকলের মিলনে পূর্ণ ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব।

জীব। যাহারা জ্ঞানমার্গের পথিক, সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী তাঁহারা তোমাকে কেবল এক নির্গুণ সত্তামাত্র অজ্ঞেয় দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। আর কতকগুলি কর্ম্মী সাহসী বীর্য্যবান ব্যক্তি আছেন যাঁহারা তোমাকে পিতা বিচারপতি দণ্ডদাতা, প্রভু শাসনকর্ত্তা, মহাশক্তিমন্ত রাজা ভিন্ন অন্য কোন রূপে ভাবিতেই পারেন না। মাতা কিম্বা সখা সম্বোধন অথবা তোমার সহিত আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতার সহজ গ্রাম্য আলাপ শুনিলে তাঁহাদের কর্ণে বড় আঘাত লাগে। তুমি যেন কেবল ভয় দেখাইয়া কাঁদাইতেছ; যেন তোমার মূর্ত্তি সর্ব্বদাই ভীষণ গম্ভীর বিচারপতির ন্যায়,— একটী বারও হাস না। রাজদরবারে যেমন ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া প্রবেশ করিতে হয়, তোমার নিকট তেমনি আদব কায়দা, সাধু ভাষার ব্যাকরণ-শুদ্ধ সম্বোধন নিতান্ত প্রয়োজন। এক পা অগ্রসর হইয়া দশ পা পিছাইয়া আসিতে হইবে। তাঁদের মতে ভয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত তোমার সহিত নিকটতর মিষ্ট সম্পর্ক একবারে অসম্ভব। পক্ষান্তরে যাঁহাদের হৃদয় কোমল, প্রকৃতি ভাবপ্রবণ এবং স্বভাব নির্ভরশীল ভীরু তাঁহারা প্রাণপতি, হৃদয়-সখা, দীনবন্ধু, কাঙ্গালশরণ, অধমতারণ বলিয়া তোমায় ডাকেন।

স্ত্রীলোক বালকবৎ প্রকৃতি নিরীহ দুর্ব্বল আত্মার নিকট তোমার স্নেহবিগলিত মাতৃরূপ অতি সহজে আবির্ভূত হয়। আর যাহাদের ভয়াবহ উগ্র শক্তি ভিন্ন অন্য উচ্চতর কোন ঐশ্বরিক জ্ঞান নাই তাহারা ভয়ঙ্কর ভৌতিক ক্রিয়া, ভীষণ করাল মূর্ত্তিকে ইষ্ট দেবতা বলিয়া পূজা করে এবং তোমাকে মহাকালরূপিণী কালী বলিয়াই কেবল জানে।

ব্রহ্ম। এই সমস্ত গুলিই বিচ্ছিন্ন একদেশদর্শী জ্ঞান, কিন্তু প্রত্যেকটীই আমার স্বরূপের আভাস। সমুদয়ের সমষ্টিতে আমার পূর্ণস্বরূপ নিরূপিত হয়, এই জন্য কোনটীই পরিত্যাজ্য নহে। আমি অখণ্ড এবং পূর্ণ, খণ্ডরূপে অপূর্ণ আংশিক ভাবে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে যে দেখে সে মূলেতেই ভুল করে; আমার ক্রিয়া বিচিত্র হইলেও আমি কদাপি বহু খণ্ডে বিভাজ্য হইতে পারি না। মনুষ্য অপূর্ণ জীব, তাহার শিক্ষা সংস্কার ধারণা শক্তি, বুঝিবার ক্ষমতা সমস্তই আপেক্ষিক আংশিক। আংশিক জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সুতরাং সে আমাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিতে চায়, সব দিকে তাহার দৃষ্টি এক সঙ্গে পড়ে না। এই কারণে পৃথিবীতে উপাসনাভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু যাহারা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহারা আমাকে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়াই জানে এবং আমার স্বরূপ সকলকে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড এবং পূর্ণরূপে সর্ব্বত্র সকল ঘটে দর্শন করে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতগত বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাও তাহা আমার এক একটী বিশেষ বিশেষ স্বরূপের উপর সংস্থাপিত। তাহাদের শাস্ত্র বিধি, সাধনপ্রণালী নৈতিক ব্যবহার, বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস শিল্প সাহিত্য ঈশ্বরজ্ঞান-বৈচিত্র্য-সমুদ্ভূত। এইরূপ আংশিক ধারণায় যে কেবল বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসের নামে সাম্প্রদায়িকতা, বিদ্বেষ হিংসা উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, নিজ নিজ একদেশদর্শী মতের প্রতি অন্ধানুরাগ বশতঃ লোকে আমাকেও নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে; তজ্জন্য আমার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভে অনেকে বঞ্চিত। তাহারা আমাকে আপনাদের প্রবৃত্তির অনুরূপ গঠন করিয়া লয় এবং যুদ্ধ বিবাদ ক্রোধ পাপ হিংসা অত্যাচারের সহায় মনে করে।

জীব। পৃথিবীর প্রচলিত অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাকে

প্রেমস্বরূপ করুণাময় মঙ্গলদাতা পিতা, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু, অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ন্যায়বান্ বিচারপতি বলিলে কোন আপত্তি করে না, কিন্তু মা কিম্বা বন্ধু সখা নাম শুনিলে তাহারা উপহাস করে এবং বিরক্ত হয়। তাহাদের ধারণা যে এরূপ ঘনিষ্ঠ এবং সুমিষ্ট সম্বন্ধবাচক সম্বোধন তোমার পক্ষে অপমানজনক এবং ইহা জ্ঞান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ।

ব্রহ্ম। যে জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বীররসপ্রধান এবং উদ্যমশীল কর্ম্মঠ, তাহারা সেই প্রকৃতির দর্পণে আমাকে কেবল মহাপরাক্রমশালী রাজা এবং শক্তিমান প্রভুরূপেই দেখে, সুতরাং আমাতে মাতৃত্ব কিম্বা সখ্যভাব আরোপ করাকে কল্পনা কিম্বা ঈশ্বরাবমাননা মনে করে। অথচ তাহারা আমার প্রেম দয়া স্নেহ স্বরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন সংস্কার বশতঃ ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে মাতৃত্ব বা বন্ধুত্বের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এবং তাহার ব্যবহার ঐ নির্ব্বিশেষ প্রেম স্নেহের বিশেষ ঘনীভূত মূর্ত্তিমান অবস্থাতে আরোপিত হয়। পিতৃত্ব বা শাসনকর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক পিতা ও রাজা যদি আমি হই, তাহা হইলে স্নেহ মমতা বাৎসল্য প্রীতিব্যঞ্জক মাতা এবং বন্ধু আমি কেন হইব না? আমার বিচিত্র ব্যবহার ও গুণপ্রকাশক শব্দ সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধবাচক, বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া ভক্তেরা তাহা রচনা করিয়াছে; ইহা তাহাদের বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের ফল নহে, অবস্থোচিত হৃদ্গত বিশ্বাসের স্বাভাবিক সম্বোধন বাক্য। অতএব এক দিকে যেমন আমি কোন একটী বিশেষ শব্দ সংজ্ঞায় আবদ্ধ নহি, কারণ, আমার স্বভাব স্বরূপের অনুরূপ কোন ভাষাই নাই; তেমনি পিতা মাতা বন্ধু প্রভু রাজা প্রভৃতি যে কোন শব্দে আমাকে সম্বোধন করিবে তাহাই সঙ্গত হইবে। শব্দের অন্তর্গত যাবতীয় ভাবের ভিতরে আমি অশব্দ অস্পর্শ অখণ্ড অনন্তরূপে বর্ত্তমান আছি।

জীব। তাহা যদি হইল, তবে যখন তোমাকে অন্তরে বাহিরে যে ভাবে প্রকাশিত দেখিব তখন সেই ভাবের অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে আর আপত্তি কি? তোমার সঙ্গে আমাদের অনেক প্রকারের সম্বন্ধ, এবং সেই বিস্তৃত সম্বন্ধজালে তুমি সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। তুমি শাসনকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা পিতা, মহৈশ্বর্য্যশালী প্রতাপান্বিত রাজা ইহা

যেমন সত্য, সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী মাতা, প্রাণসখা, হৃদবন্ধু ইহাও তেমনি সত্য। কেন তবে লোকে তোমার নাম লইয়া বিবাদ করিবে? যে সময় তাহারা তোমাকে পিতা, বিচারপতি, রাজা প্রভু বলিয়া ভাবে তখন কি তোমার স্নেহ প্রেম দয়া মাতৃভাব ভুলিয়া যায়? না উহা তোমার নাই মনে করে? তাহা হইলে প্রেম স্নেহ করুণা স্বীকারের আর তাৎপর্য্য কি থাকে? তোমার স্নেহকরুণাই মাতৃস্বরূপ।

ব্রহ্ম। শিক্ষার দোষেই এই সব ঘটিয়াছে। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী ও ভ্রান্ত সংস্কারের পরিবর্ত্তে এখন বিশুদ্ধ সংস্কার এবং শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন; ভবিষ্যতে সেই সুশিক্ষাস্রোতঃ ক্রমে প্রসারিত হইয়া আমার পূর্ণ অনন্ত স্বরূপসাগরে আসিয়া মিশিবে। প্রতি জনের নিজ নিজ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে যখন আমার বিশেষ আবির্ভাব তাহারা অনুভব করে তখন ঐ মানবীয় সম্বন্ধ আরোপ না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। ইহা বিশ্বাস ভক্তির লক্ষণ। কিন্তু আমার কৃপালোকে যে আমাকে দেখে তাহার সেই দর্শনজনিত অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানই বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞান।

অনন্তর পরম গুরু অনন্ত আচার্য্য নিজ স্বরূপের গূঢ় গভীর তাৎপর্য্য বিষদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "আমি নামরূপবিহীন, নির্ব্বিশেষ স্বয়ম্ভু সনাতন স্বপ্রকাশ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। আমার স্বরূপ সকলকে বিভাগ করা যায় না, কেন না, তৎসমুদয় অবিভাজ্য, একীভূত;—কেহ আগে, কেহ পরে নহে। যোগসিদ্ধির উচ্চ ভূমিতে আমার বাহ্যৈশ্বর্য্য এবং স্বরূপ লক্ষণ আমার সহিত অভেদ অপরিচ্ছিন্ন একাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সাধন আরম্ভকালে বিয়োগ বিজ্ঞানের নিয়মে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, গুণ লক্ষণ গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে আমার সাধকেরা সত্য জ্ঞান প্রেম দয়া পবিত্রতা ন্যায়পরতা ইত্যাদি ব্রহ্ম স্বরূপ গুলিকে আরাধনা কালে পৃথক্ ভাবে উজ্জ্বল রূপে ধারণা করেন। কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মূলে যেমন সত্তার একত্ব আছে, বস্তুতঃ আমি তেমনি একই, প্রকাশ আমার বিচিত্র। অতএব আমার দয়াও যা, ন্যায়পরতাও তাই। কঠোর শাসন দণ্ডের ভিতরে যে প্রেম আছে, আদর যত্ন মিষ্ট ব্যবহারের ভিতরেও রূপান্তরে তাহাই আছে। আমার কোন শক্তি

জ্ঞান ছাড়া নয়, আবার জ্ঞানও শক্তি বা প্রেমহীন নহে। আমার প্রেম অপবিত্র হইতে পারে না, প্রেমের সহিত পবিত্রতা মিশিয়া পবিত্র প্রেম বা প্রেমময় পবিত্রতা সিদ্ধ হয়। প্রখর রবিকিরণ যেমন স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা রূপে প্রকাশ পায়, তেমনি আমার পিতৃত্ব-প্রভাবই মাতৃত্বের সাধুর্য্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহা যান্ত্রিক যোগ নহে, রাসায়নিক মিশ্রণ; পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। আমি রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডপতি পরব্রহ্ম, আমিই আবার দীনের বন্ধু, কাঙ্গালের সখা। আমি ন্যায়বান বিচারপতি দণ্ডবিধাতা, আমিই আবার মানবসন্তানের স্নেহময়ী মাতা, সেবিকা ধাত্রী, পরিচারিকা। যত প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ প্রেম এবং ভয়ের সম্বন্ধ মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার মূলে আমি। আমি রাজার রাজশক্তি, প্রভুর প্রভুতা, ধনীর সম্পদ্, পণ্ডিতের বিদ্যা, দয়াবানের দয়া; আমি তত্ত্বপিপাসুর চরম ও পরম তত্ত্ব, সাধকের সিদ্ধি, ভক্তের ভক্তি, বৈরাগীর বৈরাগ্য, গৃহীর গার্হস্থধর্ম্ম, নীতিপরায়ণের নীতি; আমি বলবানের বল, জ্ঞানীর জ্ঞান, পুণ্যাত্মার পুণ্য, সাধুর সাধুতা, সতীর সতীত্ব; আমি প্রতিভাশালীর প্রতিভা, সুন্দরের সৌন্দর্য্য, কবির কবিত্ব; আমি পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, ভ্রাতা ভগ্নির ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব; আমি ভদ্রের ভদ্রতা, সভ্যের সভ্যতা, মানীর মান, বীরের বীরত্ব; আমি বায়ুতে প্রাণ, জলেতে শৈত্য, অগ্নিতে উত্তাপ, সূর্য্যেতে তেজ, চন্দ্রেতে কমনিয়তা, আকাশে শূন্যতা; আমি কুসুমে গন্ধ, সঙ্গীতে সুর, বাদ্যে তাল মান; আমি জীবের জীবনী, ভূমির উৎপাদনী শক্তি, মানবহৃদয়ে প্রীতি, বিবেকে বেদবাণী, আত্মার পরমাত্মা, মনের মন, প্রাণের প্রাণ; আমি সর্ব্বমূলাধার, পরম কারণ, আদি শক্তি; আমি বিশ্বপ্রসবিনী, অখিলমাতা। অথচ আমি সর্ব্বাতীত নির্লিপ্ত।”

পরিশেষে পূর্ণ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ভগবান বলিলেন, “আমার এই স্বরূপ-সামঞ্জস্যের গভীর রহস্য তুমি ভালরূপে বুঝিয়া লও। হে আমার অনুগত প্রিয় ভক্ত, তুমি কদাপি অখণ্ডকে খণ্ড করিও না। পূর্ণ ব্রহ্মের সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞানাভাবে পৃথিবীর শাস্ত্র বিধি দর্শন বিজ্ঞান, নৈতিক আদর্শ, সাধ্য সাধন সিদ্ধি এবং ধর্ম্মজীবন সমস্তই অপূর্ণ অনুদার বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সময় নিকটবর্ত্তী, যখন অখণ্ড অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব আদি সত্য যে

আমি, এবং ইহপরলোক, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্তমধ্যে যে আমারই বিভূতি প্রকাশিত, তাহার দিকে মানবসমাজের দৃষ্টি প্রসারিত হইবে; ইতঃপূর্ব্বেই তাহা আরম্ভ হইয়াছে।”

জ্ঞানযোগ—১৩শ অধ্যায়।

—০ঃ—ঃ০—

সগুণ ব্রহ্মদর্শন।

অতঃপর শ্রীজীব নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দয়াময়, তোমার শরণাগত প্রেমিক ভক্ত যোগী মহাজনগণ দিব্য জ্ঞানালোকে যে তোমার অপ্রতিম অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে, অমৃত বাণী শ্রবণে এবং তোমার লীলারসপানে এত প্রমুগ্ধ ও উন্মত্ত হন, তাহার ধারণা কিরূপ? আমিত তাহা কিছুতেই আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি না।”

ভগবান। ভক্তিযোগের যাহা চরম ফল তাহা জ্ঞানযোগ শিক্ষাকালে আয়ত্তীকৃত হইবে না। সাধন দ্বারা জ্ঞান পরিপাক প্রাপ্ত হইলে পরে তাহার সহিত বিশুদ্ধ ভক্তির যখন মিলন হয় তখনই ভক্তগণ আমার দর্শন শ্রবণ এবং লীলা অনুশীলনপূর্ব্বক মত্ততা সম্ভোগ করেন।

জীব। তথাপি জ্ঞানের সহিত যে টুকুর যোগ সে অংশ কি এখন আমি বুঝিতে পারিব না?

ভগবান। বুঝিয়া কি করিবে? তাহার যথার্থ রসাস্বাদের অবস্থা এবং সময় আছে, সে অবস্থায় উপনীত না হইলে জ্ঞানের সিদ্ধান্ত কত ক্ষণ মনে থাকিবে?

জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, “ঠাকুর, তোমার কৃপাতে কি না হইতে পারে? তুমি মূর্খকেও জ্ঞানী এবং অভক্তকেও ভক্ত করিয়া থাক। তবে আর কেন আমায় সে সুখে বঞ্চিত রাখ।

জ্ঞানচর্চ্চায় সময়ে সময়ে আমার হৃদয় বড় শূন্য ও শুষ্ক বোধ হয়, তোমার আবির্ভাবের গুরুত্ব এবং মাধুর্য্য তখন অনুভব করিতে পারি না।

ভগবান। কৃপা লাভেরও সময় আছে। তোমাদের নিকট যদিও তাহা অহৈতুকী, কিন্তু আমি অনিয়মে কোন কার্য্য করি না। যে বিষয়ে যখন যে বিশেষ কৃপার প্রয়োজন হয় তখনই আমি কেবল তাহা প্রদান করিয়া থাকি, অন্য সময় সাধারণ করুণায় সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

জীব। আমি একটী বড় কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি। যখন তোমার নিত্য নির্ব্বিকার অপরিবর্ত্তনীয় বিজ্ঞানময় সত্তার ধ্যান করি, তখন দ্বৈত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এবং অনন্ত নির্ব্বিশেষের মধ্যে পড়িয়া আপনাকেও হারাইয়া ফেলি। শেষে ভয় পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তোমাকে বাহিরে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই এবং নিরাকার ছাড়িয়া কল্পিত ব্যক্তিত্ব, সাকার সৌন্দর্য্য কিম্বা জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ ধরিতে যাই। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তকাম হইতে পারি না। নির্ব্বিশেষ অনন্ত চৈতন্যে হৃদয় শুষ্ক এবং শূন্য হইয়া যায়, আবার বাহ্যাবলম্বন বা পরিমিত পদার্থে জ্ঞান চরিতার্থ হয় না, তাহাতে চিত্ত বহির্ম্মুখে গমন করে। সেই জন্য আমি উভয় শঙ্কটে পড়িয়া তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান। আমার ভগবৎ সত্তার যথার্থ ধারণা এবং লীলানুভূতি সম্বন্ধে প্রাচীন ভক্তদিগের উক্তি অনেক প্রত্যাদিষ্ট বাণী আছে তাহা ত তুমি শ্রবণ করিয়াছ।

জীব বলিলেন, "প্রভো! তাই শুনিয়াইত আমার বড় লোভ জন্মিয়াছে। আহা, ভক্তাত্মাগণের ভক্তিরসরঞ্জিত বচনাবলী কি সুমিষ্ট! সে সকলের ভাবার্থ বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু কথাগুলি শুনিলেই হৃদয় যেন উথলিয়া উঠে। না জানি এক একটী শব্দের ভিতর কি গভীর অর্থই আছে! আছে বলিয়াই তাই শুনিতে এত ভাল লাগে। সে এক ভাষাই স্বতন্ত্র! বাক্যগুলি যেন মধুর ভাণ্ডার। তাহার ঘ্রাণে প্রাণ প্রমত্ত হয়।"

ভগবান। তাঁহাদের সে সকল কথায় যদি তোমার এত উল্লাস, তবে তাহার ভাবার্থ উপলব্ধিতে তোমার কতই না মত্ততা জন্মিবে! মহাজন-বাক্যের তাৎপর্য্য তুমি কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাক?

জীব। জ্ঞানে ভাবে মিলাইয়া ঠিক করিতে পারি না। তাঁহাদের ধ্যান যোগ প্রেম ভক্তির কথাগুলি বড় মিষ্ট লাগে, তাহাতে হৃদয় শান্তিরসে যেন ডুবিয়া যায়; অথচ তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্যের ধারণা হয় না। ভক্তিরসাত্মক সুমধুর কবিতা গাথা ও সঙ্গীতে তোমাকে যেন তাঁহারা একেবারে মানবীয় স্বভাবে গঠন করিয়া ফেলিয়াছেন; তৎসঙ্গে আবার চিদাকাশ স্বরূপ বলিয়াও সম্বোধন করিয়া থাকেন। অমূর্ত্ত অনন্ত নিরাকারের প্রসন্ন মুখ, শীতল চরণকমল, স্নেহপূর্ণ মাতৃহস্ত, প্রেম-বিস্ফারিত বক্ষ, অমৃত বচন, কৃপানয়ন, এ সকল তো কবিত্বরসষিক্ত রূপক ভাষা? এ সমুদায়ের সারবত্তা এবং ধারণা কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারি না। আহা! প্রেমিক ভক্তেরা এই সব কথা বলিতেন আর ভাবে ভোর হইয়া নাচিতেন হাসিতেন কাঁদিতেন। তৎকালকার তাঁহাদের অন্তরের স্বরূপাবস্থা এবং প্রকৃত তত্ত্বানুভূতি কিরূপ তাহা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়।

ভগবান। শুধু কেবল ইচ্ছা হইলে কি তুমি সাধকের সিদ্ধাবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পার? তাহা পার না। মনে কর, কত ব্যাকুলতা, কত প্রকার শিক্ষা, কত ত্যাগ-স্বীকার এবং কৃচ্ছ্র সাধনের ভিতর দিয়া পরিণামে তাঁহারা সে অধিকার পাইয়াছেন!

জীব। তাহা সত্য, কিন্তু জ্ঞানের চক্ষে আমার যেন সময়ে সময়ে সে সব কবিকল্পনা মনে হয়। পিতা মাতা বন্ধুর ব্যবহার অতি সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী, তাই তোমার দুর্জ্ঞেয় নিগূঢ় সত্তার উপলব্ধি জন্য সে গুলির উপমাসাহায্য তাঁহারা গ্রহণ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ সে মানবীয় সম্বন্ধ এবং লৌকিক ব্যবহার কি তোমাতে সংলগ্ন হয়?

ভগবান। কেন হইবে না? মনুষ্যপরিবারে এ সকল সুকোমল মধুর ব্যবহার, এবং স্নেহের সম্বন্ধ আসিল কোথা হইতে? শূন্যেত এ সব জন্মে না। ইহার ভিতর আমার কি কর্ত্তৃত্ব এবং লীলাবিকাশ নাই? সর্ব্বভূতে সমস্ত ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে আমার নিত্য অবস্থান। সূক্ষ্ম কারণের ভিতর যেমন আমি মূল শক্তিরূপে থাকি, তেমনি অনন্ত লীলার

আধার এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্য বিপুল স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্তমধ্যে মূর্ত্তিমান আকারে আমি বাস করি।

জীব এই ভগবদ্বাণী শ্রবণে সচকিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "তাইত! এ ভাবে আমি এত দিন তোমায় ভক্তির চক্ষে ভাল করিয়াত কখন দেখি নাই! তবে তুমি কি বিশ্বরূপী ভগবান?"

তদুত্তরে পরমাত্মা সদ্‌গুরু বলিলেন, "সে ভাবে যদি দেখ, তাহাতেও আমার যাথার্থ্যের সম্যক উপলব্ধি হইবে না। আমি বিশ্বাত্মা চিৎস্বরূপ, আবার অব্যক্ত পরব্রহ্ম। "চিদাকাশ" আমার একটী নাম বটে, কিন্তু তাহার অর্থ কি শূন্য আকাশ? কত গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায়, বিচিত্র ভাব রসের লীলা তন্মধ্যে নিহিত আছে তাহাত তুমি তলাইয়া দেখ নাই; তাই জ্ঞানে ভাবে মিলাইতে পারিতেছ না। আমার ব্যক্তিত্বের ধারণার সহিত মানবীয় সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠ ব্যবহার সকল অনুস্যূত আছে। ভক্তহৃদয় কেবল তাহা জানে। ফলতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানসঙ্গত উজ্জ্বল বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল ভক্তির ভাবুকতা তাহা তোমার জানিবার এখনো সময় হয় নাই। এখন জ্ঞান সাধন কয়িয়া যাও, পরে ভক্তিযোগ শিক্ষা ও সাধনের সময় তাহা জানিতে পারিবে।"

সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ বচনে শ্রীজীবের হৃদয় সদ্য বিকসিত পদ্ম ফুলের ন্যায় আশা আনন্দে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি মহোল্লাসে প্রমত্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এই দিব্যজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ভক্তির সামঞ্জস্য তুমি যে বলিলে, ইহাতে আমার অতিশয় লোভ জন্মিল, এবং সকল সংশয় অপনীত হইল। জ্ঞানপথে বড় শুষ্কতা নির্জীবিতা, আবার ভক্তিপথে বহুল অজ্ঞানতা ভ্রান্তি কল্পনা ভাবান্ধতা; উভয়ের মিলনে কেবল তোমার প্রকৃত তত্ত্বের মীমাংসা। কিন্তু এ বড় গভীর নূতন তত্ত্ব। কবিত্ব কল্পনা রূপক এবং বুদ্ধি বিচারের অনেক নিম্নে, অধ্যাত্ম রাজ্যের বহু উচ্চ দেশে ইহার উপলব্ধি তাহা এখন আমি কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। যাহা হউক, তোমার সহিত নিকটতর প্রেমের সম্বন্ধের যে মাধুর্য্য রস তাহা বিজ্ঞানসঙ্গত অতি সুমিষ্ট। জীবাত্মার অন্তরালে বসিয়া যখন স্বয়ং তুমি তোমার বিচিত্র বিভূতি, সুমধুর লীলা প্রকাশ করিতেছ তখন বাহ্যাবলম্বন,

রূপক ভাষা, উপমাদি সে পথে কিছুই বাধা জন্মাইতে পারে না। উপমা স্বাভাবিক; সুরসিক ভক্ত কবিরা সুবহু বিষয়ের সহিত তোমার অনুপম স্বভাবকে উপমিত করেন।. আমি যখন তন্ময়, তখন সমস্ত দৃশ্যমান বিশ্বও তন্ময় দেখিব। অন্তরে বাহিরে 'তুমি পরিপূর্ণমানন্দম্। আমি ভাবি, অতি সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন জ্ঞানকৌশলে পূর্ণ এই বিশ্ব অবিদ্যা, আর তুমি নির্গুণ, এ কথা যে বলে নিশ্চয় সে নিজেই অবিদ্যা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাহারা সংসারকে মিথ্যা মায়া বলিয়া বেড়ায় তাহারাই আবার আসক্ত চিত্তে ইহাকে সত্য বলিয়া বিলক্ষণরূপে সম্ভোগ করিতেছে। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধে অন্ধ হইয়া জ্ঞান বিচার শাস্ত্রালোচনার সময় কেবল বলে, 'এ সব রজ্জুতে সর্পভ্রম।' যদি ভ্রমই হয়, তবে তাহার বিষের এত জ্বালা কেন? সৃষ্টির অব্যর্থ, কল্যাণকর নিয়ম সকল তোমার মুখ এবং বাণী স্বরূপ হইয়া অভ্রান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছে, "আমি আছি! আমি আছি! আমি আছি!" ইহা যদি মিথ্যা হয় এবং তুমি যদি নিষ্ক্রিয় নির্গুণ হও, তাহা হইলে সত্যও কিছু নাই, কর্তৃত্ব শক্তিও কল্পনা মাত্র। সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত তুমি নিত্য বিরাজমান রহিয়াছ, আবার আমার আত্মজ্ঞানের মূলেও তুমিই জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা; আমি যেন অনন্ত জলধিজলমগ্ন জলপূর্ণ একটী ঘটবিশেষ। হে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আমি তোমাকে বার বার প্রণিপাত করি।"

জ্ঞানযোগ—১৪শ অধ্যায়।

পাপের উৎপত্তি ও বিনাশ।

জীব বলিলেন, "হে ত্রিপাপহারী, কলুষভঞ্জন, মানুষ জানিয়া শুনিয়া কেন পুনঃ পুনঃ পাপে রত হয়? পাপের যে অনিষ্টকর ফল তাহা সে দেখিতেছে, তজ্জন্য গ্লানি ভোগ করিতেছে, তদ্বিষয়ে কত সদুপদেশ শুনিতেছে, পাপমুক্তির জন্য পূজানুষ্ঠান এবং কঠোর তপস্যা ও ব্রতাদি

সাধনও করিতেছে, তথাপি কেন পাপ ছাড়িতে পারে না? ইহা কি পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতির অপ্রতিবিধেয় ফল, না তাহার অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে?”

ব্রহ্ম। পাপ পূর্ব্ব জন্মের ফল নহে, বহু পরিমাণে জীবনসংগ্রাম এবং পূর্ব্ব জীবনের ফল। পাপের শত সহস্র দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, একটু অসাবধানতা কি আত্মবিস্মৃতি ঘটিলেই দৌর্ব্বল্য ও কর্ম্মফল বশতঃ অমনি হয় চিন্তা কল্পনায়, না হয় বাসনা লালসায় চিত্তাকাশে পাপমেঘ দেখা দিবে। কালের দীর্ঘতা এবং প্রবৃত্তির ঘনত্ব অনুসারে তাহা কার্য্য ব্যবহারেও প্রভূত অনিষ্ট ফল প্রসব করে। অদৃশ্য বাষ্পকণা হইতে যেমন ক্রমে অলক্ষিত ভাবে দৃশ্যমান ভীষণ ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে তুফান ঝটিকা উঠে, তেমনি পূর্ব্বাভ্যাস বা কর্ম্মফলে অথবা দুর্ব্বলতাজন্য সজ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অন্তরে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রলোভন সম্মুখীন হইলে, বাসনা চরিতার্থের সুযোগ সুবিধা ঘটিলে পাপপ্রবণ দুর্ব্বল মন আপনাকে আপনি আর স্থির রাখিতে পারে না। তাহা হইতে দূরে থাকিলেও পাপচিন্তা ও অপবিত্র কল্পনায় তাহার চিত্ত কলুষিত হয়। লোকলজ্জা, রাজদণ্ড, দৈহিক ক্লেশাশঙ্কা, সুযোগাভাব এবং অন্যবিধ প্রতিকূল অবস্থাজন্য নর নারী কার্য্যেতে অনেক সময় যদিও পাপাচরণে ক্ষান্ত থাকে, কিন্তু আকাশের অবস্থা এবং বায়ুর গতি যেমন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তসহ,—কখন নির্ম্মল প্রশান্ত, কখন মেঘ বিদ্যুৎ ঝড় বৃষ্টি,—মানবের চিত্তাকাশ ও বাসনা-বায়ু অবিকল তদ্রূপ। সতর্ক সাধকের অন্তরাকাশ কেবল বিকারবিহীন নিষ্কলঙ্ক। হঠাৎ দুর্গন্ধাঘ্রাণে যেমন লোকে তৎক্ষণাৎ নাসিকা বস্ত্রাবৃত করে, ঈদৃশ যাহাদের পাপবোধ তাহারা বার বার বিকারগ্রস্ত হইয়াও অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নশীল হয়। কিন্তু পাপাসক্তি সমূলে ধৌত হওয়া বহুসাধনসাপেক্ষ।

জীব। বাস্তবিক আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক রাখার মত কঠিন কার্য্য আর দেখি না। উপাসনা জপ তপ ধ্যান এবং নামগানের সময় চিত্তের গতি বেশ পবিত্র ও শান্ত থাকে, কিন্তু চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির সঙ্গে

যথন রূপ রস শব্দ গন্ধাদি বিষয়ের সংস্পর্শ হয়, তৎঙ্গে বাসনা ও প্রবৃত্তিগণ স্ব স্ব অভ্যস্ত কার্য্য আরম্ভ করে, তথন আর তাহাদিগকে তোমার প্রদর্শিত পথে ধরিয়া রাখিতে পারি না। একটু বিকার উপস্থিত হইলে কিছু সময়ের জন্য সমস্ত জীবনরাজ্যটা যেন একবারে অরাজক হইয়া উঠে। বাসনাধীন ইচ্ছাশক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া তথন বিবেকাধীন আত্মকর্ত্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান যুক্তি, এমন কি ধর্ম্মবিশ্বাস বিবেক বিজ্ঞান পর্য্যন্ত তথন সেই দুর্ব্বাসনাপরতন্ত্রা বিপথগামিনী ইচ্ছার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ পাপজ্ঞান আর পাপবোধশক্তি দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ।

ব্রহ্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান বিশ্বাস বিবেক এবং মদ্গতপ্রাণা যে সাত্ত্বিকী ভক্তি তদ্দ্বারা ঐ অন্ধবৎ দুর্দ্দমনীয়া ইচ্ছাশক্তি নিমেষমধ্যে দৈববলে আবার মহাবলশালিনী হয়। তথন সহস্র প্রকার বিপদ বাধা পরীক্ষা প্রলোভনেও তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি এক, কিন্তু তাহার গতি দুই দিকে ;—যেমন দ্বিধারবিশিষ্ট সাণিত অসি। তাহার অধোগতির সীমা আছে, কিন্তু ঊর্দ্ধগতি অসীম।

জীব। তাহাত ঠিক কথা, কিন্তু পাপস্রোতে নীয়মান বিকারগ্রস্ত ইচ্ছাশক্তির গতি ফিরাইবে কে? সে যে স্বয়ংই কর্ত্তৃত্ব শক্তি।

ব্রহ্ম। অবস্থাচক্রের সংঘর্ষণে এবং মৎপ্রতিষ্ঠিত অব্যর্থ নৈতিক নিয়মে তাহার গতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমার অলজ্ঘ্য শাসনে তাহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মনিয়মের পথে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। অবশ্য তৎপূর্ব্বে পাপাত্মা যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে, অনেক ধাক্কা খাইবে। জীবাত্মার ভিতরে আত্মরক্ষিণী যে অমর শক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে, সময়ে তাহা মোহ পাপে ম্লান এবং দুর্ব্বল হইলেও কদাপি ধ্বংস হইবার নহে।

জীব। এ কথা শুনিলে আশা হয় বটে, কিন্তু পাপ করিবার ক্ষমতা যেমন মানুষের থাকে, তাহা পরিত্যাগের ক্ষমতা তেমন কৈ? তোমার মঙ্গল সঙ্কল্প এবং পুণ্যের শাসনে জীবের পরিণামে সদ্গতি হইবেই, কিন্তু সেতো তোমার নিজগুণে; সে সম্বন্ধে তাহার নিজের কি কিছু করিবার নাই?

ব্রহ্ম। কেন থাকিবে না? কিয়ৎ পরিমাণে আছে। পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন সে পড়িবে তখন তাহার চেষ্টা অনুতাপ প্রতিজ্ঞা, পুরুষকার ও প্রার্থনার আদি অন্তে আমার পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ প্রেরণা অর্থাৎ কৃপাশক্তি কার্য্য করে। নরহন্তা, দস্যু, রাজদ্রোহীর জীবন যেমন সর্ব্বদা ভীত সঙ্কুচিত, পাপকলঙ্কিত জীবন তদ্রূপ। রাজশাসন, লোকভয়, রোগা-শঙ্কা, সাধু পবিত্রাত্মাদিগের উপদেশ দৃষ্টান্তের কশাঘাত, সর্ব্বোপরি বিবেকের দংশন এবং অনুতাপ আত্মগ্লানি লজ্জা ভয় তাহার পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে, এক বিন্দু আসক্তি কলঙ্ক থাকিতে তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জন ভর্ৎসনা করিতে ছাড়িবে না। পরিশেষে শেষকপর্দ্দক অপরাধী যখন বাহির করিয়া দিবে, তখন নিরাপদ; তদ্ভিন্ন কিছুতেই তাহার নিস্তার নাই।

জীব। পাপী পাপ ছাড়িতে চাহিলেও পাপ শেষ তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। এ জন্য কি যমালয়ে গিয়া নরকভোগ করিতে হইবে? না জন্মান্তর বা অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে?

ব্রহ্ম। পাপী পাপ ছাড়িতে চায়, অথচ পাপ তাহাকে ছাড়ে না, এই যে অবস্থাটীর কথা বলিলে, ইহা অপেক্ষা আর প্রায়শ্চিত্ত বিধি, নরকভোগ কি হইতে পারে? সে যখন দেখে যে দিন ফুরাইয়া আসিল, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখসেব্য বস্তুরাশি ধন মান সম্পৎ সকলি এখানে পড়িয়া থাকিবে, অথচ তৎপ্রতি ভোগাসক্তি তাহার অন্তরে অতিশয় প্রবল; অধিকন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে মতি নাই, যোগ ভক্তি ব্রহ্মধ্যানে অনাভ্যাস, অরুচি, তদ্বিষয়ে ক্ষণিক ইচ্ছা হইলেও পথ দেখিতে পাওয়া যায় না; অবিশ্বাস সংশয়, পাপ মোহে হৃদয় একবারে তাহার আচ্ছন্ন অবসন্ন অস্থির, আশাহীন এবং শক্তিহীন; সে অবস্থা কি নরকভোগ নহে? পাপীমাত্রেই অল্পাধিক সে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ভদ্রস্বভাব নীতিবান্ বিষয়াসক্ত কিম্বা দুষ্কৃতাধম পাপজীবনে কোন কালে সুখ শান্তি হয় না। ত্রিতাপ জ্বালায় সকলেই জ্বলিতেছে। কিন্তু ধন্য তাহারা যাহাদের পুণ্যের আদর্শ উজ্জ্বল, এবং পাপবোধ ও তাহার যন্ত্রণাবোধশক্তি সেই পরিমাণে সমধিক! পুণ্যে অনুরাগ না জন্মিলে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে না। সেই পুণ্যানুরাগ স্বভাবে নিহিত আছে, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিলে পাপকে ঘৃণার্হ বলিয়া ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

জীব। কিছু কিছু পাপ বোধশক্তি অনেকেরই আছে, এবং তাহারা শুদ্ধ হইতেও চায়, তজ্জন্য চেষ্টা সংগ্রাম এবং প্রার্থনাদিও করিয়া থাকে, তথাপি কেন তাহাদের পুণ্যবল বাড়ে না ?—আত্মগ্লানি যায় না ?

ব্রহ্ম। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? রোগের শেষ থাকিতে কি পথ্য ভাল লাগে?—না স্বাস্থ্য সম্ভোগ হয়? রোগী যদি স্বেচ্ছাচারী কুপথ্যসেবী হয়, এক বিন্দু ঔষধে তাহার কি করিবে? যেরূপ আসক্তি অনুরাগ উৎসাহের সহিত পাপ সঞ্চয় করা হইয়াছে, ততোধিক আগ্রহ যত্নের সহিত উহা ছাড়িবার জন্য চেষ্টা পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। সামান্য একটু ইচ্ছার কর্ম্ম নয়, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। সাধুতা সম্ভোগের জন্য কার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু সে জন্য আত্মবলিদান আবশ্যক। যে সকল দৃশ্য স্পৃশ্য পদার্থ এবং চিন্তা কল্পনা ভাবযোগ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক এবং পরিপোষক তাহাদিগের সহিত আমার পবিত্র আবির্ভাব নিয়ত বর্ত্তমান, এই জ্ঞানের ধারণা ব্যতীত পাপের মূল উৎপাটিত হয় না। পাপের দিকে ঝোঁক্ অর্থাৎ রুচি যত দিন ইচ্ছা-পূর্ব্বক পোষণ করিবে তত দিন বার বার চিত্তবিকার উপস্থিত হইবে। চিত্তবিকার আবার আসক্তির কারণ। পাপনাশের একটী মহামন্ত্র বলিতেছি, তাহা স্মরণে রাখিও। "কি! আমি বিশুদ্ধ চৈতন্যের অংশ, দেবতনয় হইয়া পাপ করিব? কখন না!" পাপকে যে দৈত্য দানব জানিয়া ভয় করে কিম্বা ভালবাসিয়া প্রশ্রয় দেয় সেই মরে।

জীব। সে সৎসাহস ক্ষমতা তাহার যে তখন থাকে না। সে অবস্থা আনিয়া দিবে কে?

হরি নিরঞ্জন আশা বচনে বলিলেন, "আমি প্রতি জনকে সময়ে সময়ে বিশেষ কৃপালোক জ্ঞানালোক প্রদর্শন করিয়া থাকি; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাহা ধরিয়া যে আশার সহিত প্রতীক্ষা এবং প্রার্থনা করে, পরিণামে সে পাপমুক্ত হয় এবং নবজীবন পায়। আরো জানিও, পাপ মানবপ্রকৃতির কোন মৌলিক উপাদান নহে। উহা দুর্ব্বলতা অপূর্ণতা এবং অভাবাত্মক বিষয়। কোন একটী শুভ্র নির্ম্মল রজত পাত্র বাহিরে মুক্ত স্থানে কিছু দিন রাখিয়া দিলে, জল বাতাস শিশির এবং রবিকিরণে তাহা লৌহের

ন্যায় কলঙ্কিত হইয়া যায়; কিন্তু পুনরায় ঘর্ষণ করিলে আবার সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়। কারণ, সে কলঙ্ক কালিমা তাহার অন্তরস্থ মৌলিক উপাদানসম্ভূত নহে। পাপ কলঙ্ককে তেমনি জানিতে হইবে। উন্নতির পথে, নিয়তির উচ্চ স্থানে আরোহণ কালে যে জীবনসংগ্রামক্ষেত্র আছে, তাহার মধ্যে পড়িয়া প্রতি জনকেই বৃষ্টি বাত শীতাতপ এবং আঘাত প্রতিঘাতে বিকৃত কলঙ্কিত হইতে হয়। কিন্তু সে সকল অবস্থামূলক বাহ্য কলঙ্ক, তাহাকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সে রূপ একটী কোন রঙ্গের দাগ নহে, তাহা ধুইলে ধোয়া যায় না। কেন না, আমি স্বয়ং ধর্ম্মাবহ পবিত্রস্বরূপ। জীবাত্মার মূলে আমার নিত্য বাস। আমি যখন তাহার মনুষ্যত্ব ভেদ করিয়া দেবত্বের চির সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করি তখন তাহা মৌলিক উপাদানের বিকাশরূপে প্রকাশ পায়। যাবতীয় কলঙ্ক জঞ্জাল বাসনাকষায় অপসারিত করিয়া পরিণামে আমি জীবের জীবনে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিব। যে পরিমাণে আমার প্রকাশ বা বিকাশ সেই পরিমাণে পাপের বিনাশ এবং পুণ্যের জয়।"

এই সারগর্ভ ভগবদ্বাক্য শ্রবণে জীব আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, পাপ মৌলিক গুণ হউক আর না হউক, কার্য্যতঃ ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে সেই রূপই দেখিতে পাই। আবার কোন কোন ব্যক্তির স্বভাবতঃ বাল্য কাল হইতে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি অনুরাগ প্রবলতর থাকে। ইহা কি দৈহিক ও আত্মিক প্রকৃতির অন্তর্গত সত্ব রজ তমোগুণের নিদর্শন? অথবা তাহার সঙ্গে জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি দুষ্কৃতির কোন সম্বন্ধ আছে?"

ব্রহ্ম। প্রত্যেক আত্মার উদ্দেশ্য সতন্ত্র; প্রতি জনেরই স্বাভাবিক সুবিধা অসুবিধা, বিবিধ অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা আছে। তজ্জন্য কোন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন একটী পাপের প্রতি আসক্তি কিংবা ঘৃণা অধিক থাকে। কিন্তু যাহার কোন একটী পাপপ্রবৃত্তি প্রবল তাহার চরিত্রে পুরুষকার বলের বীরত্ব প্রমাণীত হয়। সেই একটী প্রবল পাপাসক্তি বা রিপুপরতন্ত্রতা জন্য যদিও সে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিবে এবং তজ্জন্য বার বার পরীক্ষিত হইবে, কিন্তু অন্য দিকে ভক্তি

বৈরাগ্য তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক। জীবশিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা-প্রণালী আছে। আমার শেষ উদ্দেশ্য স্থলে যাবতীয় বিচিত্রতার মিলন দেখিতে পাইবে। এই যে অবস্থাবৈচিত্র্য তাহার মীমাংসার জন্য পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহাতে কি জীবনগত পার্থক্যের কোন নিরাকরণ হয়? সুবহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পাপপুণ্যজনক দুষ্কৃতি সুকৃতি আরোপ করিলেও যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে, এক জন্মেও তাই হইবে। কারণ, মূলে একটী জন্ম শেষ ধরিয়া লইতেই হইবে যাহাতে কোন প্রভেদ ছিল। এই প্রভেদ বা বৈচিত্র্য প্রথম জন্মেই যদি থাকে, তাহা হইলে তখন আর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল কোথায়? দেহী আপনার অন্তরনিহিত প্রবৃত্তির বীজানুসারে প্রকৃতি হইতে যদি তদনুরূপ সত্বাদি গুণপ্রধান দেহেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপনিই আপনার অর্দ্ধেক বিধাতা হইল! সামর্থ্যাকারে তাহার ভিতর যে বিভিন্ন দোষগুণ বীজরূপে ছিল তাহারই বা পার্থক্যের হেতু কি? কাজেই এ প্রশ্ন মূলেতে শেষ আমাতে গিয়াই ঠেকিবে। প্রকৃতি পুরুষের জন্ম কর্ম্ম, মিলন বিচ্ছেদ, এবং পারস্পারিক সম্বন্ধ অনন্ত রহস্যে আবৃত। সত্ব রজ তম এই তিন গুণের বিভিন্ন যোগাযোগ প্রক্রিয়াই যাবতীয় পার্থক্যের মূল বটে, কিন্তু বিচিত্রতার অন্তরালে একত্ব এবং তাহার পরিণামে পূর্ণত্ব ও সমন্বয় আমার যাবতীয় সৃষ্টি-কার্য্যের অভিপ্রায়। প্রত্যেক ভৌতিক এবং মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে আবর্ত্তন এবং বিবর্ত্তনচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে; এক হইতে বহু এবং বহু হইতে এক, ইহাই আমার লীলা; এক সমান যদি সব হইত, তাহা হইলে কি আমি নিরপেক্ষ হইতাম? সৃষ্টি মানেই লীলা, এবং লীলা মানেই বিচিত্রতা। পৃথক পৃথক অবস্থানুসারে পাপ পুণ্যের বিচারাদর্শ বিভিন্ন, তদনুসারে দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। নির্জ্জন তপোবনবাসী কিম্বা নিরাপদেস্থিত সাধক এবং সংসারসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত কর্ম্মীর অবস্থা এক নহে, সুতরাং বিচারও এক হইতে পারে না। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা।

জীব। যাই হউক, মানুষকে যদি আজীবন পাপসংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়, তবে আর সে খাঁটি হইবে কবে? এবং সাধুর সঙ্গে পাপীর প্রভেদই বা কি রহিল? এখানে যিনি ধর্ম্মাত্মা সাধু বলিয়া পূজিত, তোমার

পবিত্র সন্নিধানে গিয়া শুনিয়াছি তাঁহাকেও অপূর্ণতা জন্য আত্মগ্লানি সহ্য করিতে হয়। তাহা হইলে এক অর্থে পাপেরই জয় হইল।

ব্রহ্ম। পাপী সাধু কিম্বা বদ্ধ ও মুক্ত আত্মার মধ্যে তথাপি স্বর্গ নরকের প্রভেদ আছে। সাধুর মুক্ত জীবন ঊর্দ্ধগামী; যদিও তাহা অপূর্ণ, কিন্তু উন্নতির দিকে তাহার অপ্রতিহত গতি। আর পাপীর আত্মা ঊর্দ্ধে উঠিবার অধিকারী হইয়াও ক্রমাগত নরকের দিকে নামিতেছে। সে পাপকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া তাহার ক্রীতদাস হয়।

জীব। পাপ সকল বড়ই প্রতারক। এমন দিন নাই যে দিন বলিতে পারি তাহার ফাঁদে না পড়িয়া আমি তোমার দৃষ্টিতে নির্দ্দোষ ভাবে কাটাইয়াছি।

অন্তর্য্যামী সর্ব্বদেবময় হরি তদুত্তরে বলিলেন, "পাপ প্রতারক বটে, কিন্তু মনুষ্যও বড় আত্মপ্রবঞ্চিত। উপাসনা, সাধুসঙ্গের সময় অন্তরে যে উচ্চ পবিত্র ভাবের উচ্ছ্বাস হয় তাহার ভিতর অনেক কল্পনা কবিত্ব ভাবান্ধতা অবস্থিতি করে। কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষা স্থলে তাহার সত্যতা প্রমাণীত হয়। যে যে অবস্থায় পাপানুষ্ঠিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সেখানে যদি ইচ্ছা-পূর্ব্বক কুযুক্তির সাহায্যে শিথিল হও, তাহা হইলে কেমন করিয়া আশা করিবে যে চিত্ত নির্ব্বিকার পরিশুদ্ধ থাকিবে? যোগানন্দ এবং সেবানন্দের সামঞ্জস্যে পাপ অসম্ভব। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মসাধন রঙ্গভূমির নাট্য ক্রীড়াবিশেষ। মানুষ যখন বিষয় কার্য্যে অতিশয় প্রমত্ত থাকে, তখন আমি নিজে যদি গিয়া বলি, "বাপু হে, হরি বল, হরিস্মরণ কর।" শিষ্য বলে, "যাও! যাও! কাজের সময় এখন বিরক্ত করিও না, মাথায় আগুন জ্বলছে।" যিনি বড় কাজের লোক, সর্ব্বদা যিনি বিষয়ে বিব্রত তাঁর যেন সাত খুন মাপ। এ প্রকার যদি বিশ্বাস সংস্কার থাকে, তবে পাপের পথত খুলিয়াই রাখা হইল। মহা গুরুতর লাভ ক্ষতির কাজ হউক, কিম্বা জমিদারি লাটেই উঠুক, চিত্ত-বিকার যাহাতে না ঘটে, মনের সাম্য, হৃদয়ের শান্তি যাহাতে রক্ষা পায় তাহাই পরমপুরুষার্থ।"

জ্ঞানযোগ—১৫শ অধ্যায়।

—০ঃ—ঃ০—

মঙ্গলামঙ্গল।

সদ্‌গুরু পরব্রহ্মের প্রতি অনন্য দৃষ্টে চাহিয়া বিনীত এবং ভীত চিত্তে জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পরমাত্মন্! এই যে সকল ঘোরতর অমঙ্গলজনক হৃদয়বিদারক ঘটনা চারিদিকে সচরাচর দেখিতে পাই, ইহার অভিপ্রায় কি? কোথাও দেখি, ভূমিকম্প ঝটিকা জলপ্লাবন এবং অগ্নিদাহে এক রাত্রির মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; কোথাও সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আক্রমণে গ্রাম নগর জনপদ অরণ্য সমান; অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পেষণে নরনারী কঙ্কালবিশিষ্ট। কোথায় বা নরপতি সেনাপতি রাজপুরুষেরা পরস্পর রণে মত্ত হইয়া হতাহত অগণ্য প্রজা-পুঞ্জের খণ্ড মুণ্ডে ও শোণিত ধারায় বিস্তীর্ণ রাজ্য সকল শ্মশান মশানবৎ করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত ভীষণ রোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিলে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? ইহা কি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা এবং অমঙ্গলের পরি-চায়ক নহে? কেহ জন্মাবধি উৎকট রোগে ভুগিতেছে, কেহ অন্ধ খঞ্জ অঙ্গহীন, কেহ বা গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত কীটদষ্ট দেহে দিন যাপন করিতেছে, কেহ শোকে ভগ্ন হৃদয়। তোমার এমন সুখের সংসারে এ সব দুঃখের ব্যাপার কেন? প্রচুর সৌভাগ্য সম্পদ দিয়া পিতা মাতার ন্যায় যদি আমাদিগকে তুমি এত ভাল না বাসিতে, তাহা হইলে এ সব কথা উঠিত না। কিন্তু মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল দেখিলে প্রাণে বড় লাগে। জীবের সুখ সুবিধা তুমি যেমন বুঝ, এবং তুমি যেমন তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এমন আর কে আছে? তথাপি কেন এ বিপরীত দৃশ্য? এ সকল দুঃখ ক্লেশ রোগ দারিদ্র্য অনাহার অত্যাচার উৎপীড়ন দেখিলে যখন আমাদের চক্ষে জল পড়ে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, এবং ধর্ম্মক্রোধ উদ্দীপিত হয় তখন সেটাত অবশ্য ন্যায় এবং দয়ারই নিদর্শন বলিতে হইবে? কিন্তু ক্ষমতায় কুলায় না বলিয়া

আমরা কিছু করিতে পারি না। তুমি সব পার; কারণ, তোমার দয়া এবং শক্তি উভয়ই অসীম। তবে জীবের দুঃখ দুর্গতিতে কি তোমার প্রাণে ব্যথা লাগে না? যদি না লাগিত, তাহা হইলে আমরা এই পরদুঃখ-কাতরতা ন্যায় দয়া স্নেহ মমতা কোথায় পাইলাম? • মনুষ্য কখন তোমা অপেক্ষা বেশী ন্যায়বান বা দয়ালু নহে। আমার মনে হয়, এ সব দেখিয়া যদি তোমার অনন্ত প্রেম, উদার হৃদয় আর্দ্র হইত এবং ন্যায়ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিত, জীবের দুঃখ বিপদ দূর হইতেই বা কত ক্ষণ লাগিত? ইচ্ছা হইলে এমন কি, তুমি মূলেতেই তাহাত বন্ধ করিয়া দিতে পারিতে? এ তোমার কি বিষম লীলা খেলা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। বিচক্ষণ বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা এই জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছে, হয় তোমার দয়া অনেক, শক্তি কম; না হয় শক্তি অনন্ত, দয়া অল্প। তোমার উপর এ কলঙ্কের কথা শুনিলে আমার হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। পক্ষান্তরে বিপদ কষ্ট রোগ বেদনা শুল ভ্রম কল্পনাও নহে; অতি প্রকাণ্ড জীবন্ত মর্ম্মস্পর্শী সত্য। রোগ বিপদ সময়ে সময়ে এমনি করিয়া চাপিয়া ধরে যে মনে হয়, তোমার অপেক্ষা তাহাদের যেন শক্তি বেশী। অধিক কি বলিব, বিপদের তাড়নে কত সময় তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। দৈহিক নিদারুণ যন্ত্রণায় এক একবার চক্ষে যেন অন্ধকার দেখি। এ ভয়ানক সমস্যার তুমি ভিন্ন আর কে মীমাংসা করিয়া দিবে? মঙ্গলময় পিতা তুমি, তোমার রাজ্যে কেন এমন নির্দ্দয়তা থাকিবে? ইহা ব্যতীত লোক-সমাজে পাপ দুষ্টতা অজ্ঞানতা অন্ধতা ভ্রান্তি কল্পনাও যথেষ্ট দেখিতে পাই।”

মধুরভাষী পরমাত্মা মৃদু স্বরে সহাস্য আস্যে জীবানন্দের বিবেককর্ণে এই রূপে ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন;—“পার্থিব ভোগ সুখ কিম্বা সুস্থ সবল দীর্ঘ জীবন সম্ভোগ মঙ্গলের আদর্শ নহে, ব্যাধি মৃত্যু অনাহার আজন্ম রোগভোগ অকাল মৃত্যু এবং দৈহিক যন্ত্রণাকেও অমঙ্গলের পরাকাষ্ঠা মনে করিতে পার না। যাবতীয় দুঃখ দারিদ্র্য অভাব বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্যই জীবনসংগ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শিক্ষা এবং উন্নতি হইতে পারে না। সুখ সৌভাগ্য, জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি, স্বাস্থ্য সভ্যতার প্রচুর উন্নতির সঙ্গেও ঈদৃশ সংগ্রাম চিরদিন থাকিবে। কেবল যাহা কিছু মানবীয় অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত নির্দ্দয়তা স্বার্থপরতা এবং পশুপ্রবৃত্তির নিদর্শন

এখন চারিদিকে দেখিতেছ সেই গুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিবে। কিন্তু লোকের অজ্ঞানতা অপূর্ণতা অক্ষমতা অথবা আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অসাধারণ ঘটনাজন্য যে সকল দৃশ্যতঃ দুঃখ বেদনা উপস্থিত হয় তাহা উন্নতির উপায় স্বরূপ জানিও। শারীরিক দুঃখ ব্যাধি প্রধানতঃ অদূরদর্শী জীবদিগের চক্ষে মহা অমঙ্গলের নিদান বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর জরামরণশীল ভৌতিক দেহ চির দিন সুস্থ সবল থাকিতে পারে না। ক্ষয়শীল এবং মরণশীলতা তাহার স্বভাব। শরীরের ধর্ম্ম যথাযথরূপে পরিপালিত না হইলে উহা শৈশবেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ "আমার" "আমার" এই অহংজ্ঞান হইতেই মঙ্গলামঙ্গল বোধ জন্মে, এবং এই খানেই যত কিছু ভ্রম প্রমাদ নিহিত আছে। যে যে অমঙ্গল ঘটনার কথা তুমি উল্লেখ করিলে তাহা এক স্থানে রাখিলে কিম্বা আপনাতে আরোপ করিলে যেমন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, বস্তুতঃ তাহা তেমন নহে। তোমাদের শৈশব হৃদয়ের দয়া সহানুভূতি অপক্ক নীতির স্নায়ুবীয় তরলোচ্ছ্বাসের বিচার সিদ্ধান্তের দ্বারা কোন বিষয়ের বাস্তবিকতা নির্দ্ধারিত হয় না। সুতরাং তাহার সহিত আমার ভাবগত একতা থাকিলেও সকল সময় জ্ঞানগত একতা থাকে না। উপর উল্লিখিত অসাধারণ ঘটনার মধ্যে কতকগুলি মনুষ্যের দোষ দুর্ব্বলতার ফল। লোভী স্বার্থপর অর্থবণিক এবং রাজা রাজপুরুষেরা যদি অভাবের অতিরিক্ত বিষয় উপার্জ্জন, সঞ্চয় ও ভোগ করে, ধনী ব্যবসায়ীরা যদি বহু অর্থের লালসায় শস্য খাদ্য এক স্থানে বহু দিন আবদ্ধ রাখে, ইহারা অর্থ এবং শস্যাদি যথা পরিমাণে সর্ব্বত্র বিভাগ করিয়া যদি না দেয়, রাজ্যের কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্ট রাজবিপ্লব চুরি ডাকাতি ঘটিবেই। আমি যদিও মানুষের নৈতিক কর্ত্তব্যের এবং দয়াবৃত্তির ভিতর দিয়া এই উপলক্ষে বার বার বুঝাইয়া দিতেছি যে সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার, তথাপি স্বার্থান্ধ অর্থপিশাচ আত্মম্ভরী রাজা ধনী সওদাগর ও রাজপুরুষেরা এরূপ বিষয়ে দায়িত্ব অনুভব করে না, এবং পূর্ব্ব হইতে সে জন্য সাবধানতাও লয় না। তাহারা নিজ নিজ সুখ ভোগেই উন্মত্ত। জনসাধারণ প্রজামণ্ডলীর অকাল মৃত্যু রোগ অনাহারের জন্য ইহারা জ্ঞানে অজ্ঞানে বহু পরিমাণে অপরাধী।

বহু অঙ্গের সমষ্টি মানবসমাজকে যখন আমি একটী শরীরের ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়াছি তখন একাঙ্গের বা পূর্ব্ববর্ত্তী বংশের পাপাপরাধ সুখ দুঃখের তরঙ্গাঘাত অপর অঙ্গে এবং পরবর্ত্তী বংশে লাগিবে ইহা সহজ সিদ্ধ কথা। কি আধ্যাত্মিক কি শারীরিক কোন বিষয়েই আমি কাহাকেও স্বতন্ত্র পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ স্বাধীন করিয়া রাখি নাই। আমার বিশ্বরাজ্য এক অখণ্ড দুশ্ছেদ্য।

জীব। অকাল মৃত্যু, রোগ দারিদ্র্য প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে প্রতি জনের অনবধানতা স্বার্থপরতা এবং সামাজিক কর্ত্তব্যবিমুখতার ফল তাহা মানিলাম; কিন্তু তাহা ব্যতীত সাধ্যাতীত কারণে যে অনিষ্ট ঘটে সে জন্য মানুষ ত দায়ী নহে। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব সব সময় চলে না। তাহা ছাড়া সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। অধিকন্তু মানুষ যদি মরিয়াই গেল, তাহা হইলে সে সংগ্রাম করিবে কিরূপে?

ব্রহ্ম। মানবের পূর্ণতা লাভের পথে যে যে বিঘ্ন বাধা ক্লেশ যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, তাহা অবশ্য আমারই শাসন কর্ত্তৃত্বের একান্ত অধীন। অনেক মৃত্যু ঘটনাও তাহাতে হয়। কিন্তু জীবন যৌবন দৈহিক সুখ স্বাস্থ্য এবং মৃত্যুর অতীত কি তোমাদের কোন মহান্ উদ্দেশ্য কিছু নাই? এবং তোমাদের স্বভাবে যে কিছু দয়া স্নেহ সহানুভূতি আছে, বিপদ ক্লেশ নিবারণের জন্য তোমরা যে চেষ্টা যত্ন ত্যাগস্বীকার এবং বুদ্ধির চালনা কর তন্মধ্যে কি আমার মঙ্গলময়ী লীলা দেখিতে পাও না? কেবল তদ্বিষয়ে অনেক সময় যে মনুষ্য সফলকাম হয় না, তাহা লোক-শিক্ষা, চরিত্রোন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধির উপায়; এই জন্য এ স্থলে আমার সঙ্গে অদূরদর্শী আশুসুখপ্রিয় স্বার্থপর মানবাত্মার প্রভেদ জ্ঞান উপস্থিত হয়। তুমি হয়তো মনে কর, তুমি যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে, তাহা হইলে এ সকল দুঃখ কষ্ট অভাবের পথ বন্ধ করিয়া রাখিতে। আচ্ছা বল দেখি, তোমার উপর যদি সৃষ্টিক্রিয়ার ভার থাকিত তাহা হইলে দুঃখ বিপদ সম্বন্ধে তুমি কি করিতে?

এ কথায় জীব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন, কিন্তু পুত্রবাৎসল্য স্মরণ করত বিনম্র বচনে বলিলেন, "ঠাকুর, যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন তবে বলি। এ বিষয়ে আমার নিজের

মতামত কিম্বা বিচারের অধিকার বা প্রবৃত্তি কিছু নাই, কিন্তু জগতে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট না থাকে এটা ইচ্ছা হয়। যাহারা বিবাদবাদী অবিশ্বাসী পৃথিবীর চারিদিকে দুঃখ কষ্ট অন্যায় অবিচার স্বার্থপরতা দেখিয়া তাহারা বড় চটিয়া যায়, এবং তোমাকে মানিতে চায় না। তাহারা মনে করে, তোমা অপেক্ষা যেন দয়া ন্যায়পরতা তাহাদের অধিক। অথচ তাহাদের শুভ কামনা দয়া স্নেহ ভালমন্দবিচাররুচি তাহারা কোথায় পাইল তাহা ভাবে না। জ্ঞানচর্চ্চা বুদ্ধি বিচার দ্বারা এই রূপ তাহাদের একটা সংস্কার জন্মিয়াছে যে সৃষ্ট প্রকৃতির অভাব ত্রুটি যাহা তুমি মোচন করিতে পার নাই, বা কর নাই তাহারা নিজেরা জ্ঞান সভ্যতা প্রভাবে ক্রমে তাহা মোচন করিয়া তুলিবে এবং তুলিতেছে। তুমিই মানুষের স্বাধীন চিন্তা আত্মবল এবং স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান শক্তির ভিতর দিয়া প্রকৃতির অন্ধ শক্তির উপর যে স্বীয় মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া লইতেছ সেগুলি তাহারা আপনার বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে। ধৈর্য্য বিশ্বাসের সহিত ভবিষ্যতের সুদূর সময়ের উপরও তাহারা চাহিয়া থাকিতে পারে না, দীর্ঘকালসাপেক্ষ ক্রমোন্নতি ভাল বাসে না, দুই তিন পুরুষের মধ্যে মনঃকল্পিত সুখরাজ্য দেখিতে চায় এবং মনে করে, নিজেরা তাহা করিতে পারিবে। এক দিন এমন কি, সভ্যতার গুণে তাহারাই ঈশ্বরপদ লাভ করিবে;—যেন তুমি এখনো জন্ম গ্রহণ কর নাই! ঠাকুর, তুমি মানুষকে জ্ঞান দিয়া তাহাকে বড় বিপাকে ফেলিয়াছ। কোন্ খানে সে তোমার এবং কোথায় কত টুকু বা সে নিজের, এবং যে টুকু নিজের তাহাই বা কি এবং কাহার, ইহা ঠিক করিতে না পারিয়া আপনার সঙ্গে সে আপনি লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়। যাই হউক, তাহার মনের ভাব এই যে, যেমন তাহার অন্তরের শুভ কামনা মঙ্গলাদর্শ, তেমনি একটী সৃষ্টি ক্রমে তাহারা তৈয়ার করিতেছে। সেই নব সৃষ্টিতে সকলেই সমান; কোন রূপ অভাব দুঃখ ত্রুটি কিছু তাহাতে নাই; জল বাতাস সূর্য্যকিরণ গ্রীষ্ম শীত বর্ষা যেখানে যার জন্য যখন যত পরিমাণে প্রয়োজন ঠিক তত পরিমাণে হইবে। অতি বা অনতি গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে একটি লোকও কষ্ট পাইবে না। চির বসন্ত অনন্ত, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় নীরোগ শরীরে স্থির যৌবন প্রতিজন সম্ভোগ করিবে এই তাহাদের আদর্শ সৃষ্টি।"

ভগবান সচ্চিদানন্দ হরি আমোদচ্ছলে শিক্ষা দিবার জন্য বলিলেন, "তাহারা কিরূপ সৃষ্টি চায় তাহা নিজেই জানে না। যখন যে কোন একটা অভাব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কি বীভৎস দৃশ্য চক্ষে পড়ে তখন তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পরিণামফল এবং সমস্ত বিশ্বনিয়মের সহিত তাহার যোগাযোগ সম্বন্ধ অনুসন্ধান না করিয়া অস্ত্রচিকিৎসাদর্শক ভীরু ব্যক্তির ন্যায় কেবল স্নায়ুবীয় উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া আক্ষেপ করে এবং চমকিয়া উঠে। এরূপ বিষয়ের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি সমাজরক্ষা ও চরিত্র গঠনের একটী বিশেষ সহায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মোহবিকার প্রসূত সাময়িক কারুণ্য কিম্বা বীভৎস রসের আবেগ দ্বারা বিশ্বশাসনের বিচার চলিতে পারে না। তুমি জানিও, এ সব শ্রেণীর লোকের শরীরই সর্ব্বস্ব, এবং বাহ্য সভ্যতা এবং বিষয়বুদ্ধি ক্ষমতার উন্নতি সাধনই চরম লক্ষ্য। রোগে দুর্ভিক্ষে কিম্বা ভৌতিক নিয়মে বহু লোকের সময়ে সময়ে দুঃখ কষ্ট এবং মৃত্যু ঘটে তাহা দেখিয়া উহাদের হৃদয় কাঁদে। কিন্তু এ দিকে যে কোটী কোটী হৃষ্ট পুষ্ট সবল সুস্থ দীর্ঘজীবী বিদ্যা বুদ্ধি সমুন্নত ধনী জ্ঞানী বিলাসী নরনারীর আত্মা ধর্ম্মান্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, নৈতিক চিকিৎসাভাবে গলিত-কুষ্ঠাক্রান্ত প্রেত পিশাচবৎ কদাকার, পাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ, বিষয়বিষে জর্জ্জরিত, ষড়রিপুর দংশনে ক্ষত বিক্ষত, তাহা দেখিয়া চক্ষে কাহারো এক ফোঁটা জল পড়ে না। অমরাত্মার দুর্গতি দর্শনে কষ্ট হয় না, কিন্তু নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর শরীর ও বিষয়বুদ্ধির দুর্ব্বলতা ভাবিয়া যত কিছু দুঃখ। ইহারা আত্মজ্ঞানাভাবে এইরূপে শোক করিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়ের দাসেরা যে পৃথিবীর দুঃখ বৃদ্ধির এক প্রধান সহায় ইহা তাহাদের সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। আমি জানি, মানুষ সুখ সুবিধা ভালবাসে, এবং তাহা প্রধানতঃ স্বভাবোপযোগীও বটে; কিন্তু সে জন্য আমি কি তাহার প্রচুর আয়োজনও করিয়া রাখি নাই? তদ্ব্যতীত সে আপনি পরিশ্রম যত্ন এবং বুদ্ধি কৌশলে যে সেই সকল সুখ সুবিধাকে চিরস্থায়ী এবং আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে চায় এবং তাহাতে বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়, তন্মধ্যেও কি আমার মঙ্গল সঙ্কল্প এবং ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান নাই? তথাপি দৈহিক বা সামাজিক সুখ সুবিধা নিত্য মঙ্গলের পরাকাষ্ঠা নহে। তাহাতে এ কাল পর্য্যন্ত কেহ পরিতৃপ্ত

হয় নাই। তৎসঙ্গে নিরাশা রোগ শোক বেদনা. দুঃখ অবমাননার আবশ্যকতা আছে; তদ্ভিন্ন যথার্থ কল্যাণ, পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হয় না; ইহা আমার বিশ্বনিয়মের কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। এমন যে ভীষণ মৃত্যু, ভয় বিপদ তাহাও কি মঙ্গলের জন্য নহে? কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অশীতি বর্ষীয় প্রাচীন যে সেও মরিতে চাহে না। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, জরা বার্দ্ধক্য কি কেহ চায়? চিরযৌবন চিরসুস্থতা চিরকাল পার্থিব ভোগ বিলাস সুখই বদ্ধ জীব সকলের প্রার্থনীয়। শিয়রে শমন দেখিয়াও কত শত বৃদ্ধ সে জন্য নানা বিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসের জন্য তাহারা বড়ই ব্যাকুল।

"কেহ অসুস্থ রুগ্ন হইবে না, সকলে সুস্থ সবল থাকিবে; কেহ দুর্ব্বল মূর্খ পরাধীন নির্ধন থাকিবে না, সম পরিমাণে সকলে পরিশ্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে নিরাপদে সমভাবে পৃথিবী ভোগ করিবে; স্ত্রী পুরুষ রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, ধার্ম্মিক পাপী, দুর্ব্বল বলবান, দীর্ঘ খর্ব্ব, স্থূল ক্ষীণ, সুন্দর কুৎসিত, শ্বেত কৃষ্ণ সব একাকার হইয়া যাইবে—যাহাতে কেহ কাহাকে আর হিংসা করিতে না পারে! যদি মরেত সকলেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া এক সময়ে মরিয়া যাউক, বাঁচেত সকলে একাবস্থাপন্ন হইয়া বাঁচুক! এই কি তোমাদের সাম্যবাদ? মনে করিয়া দেখ, আলোক অন্ধকার, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, সম্পদ বিপদ, ছোট বড়, রাজা প্রজা ইত্যাদি বিচিত্র ব্যাপার যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই বিশ্ব কি প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিত। সর্ব্বাগ্রে একটি আদর্শ জগৎ ভাবিয়া ঠিক কর, তাহার পর বর্ত্তমান সৃষ্টির ভুল ধরিও।"

জীব হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, ক্ষুদ্রবুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হৃদয় মানুষ কি তোমার অভিপ্রায়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে? সাম্যবাদ অর্থে যদি সমতা একীকরণ হয় তাহার তো কোন মানে দেখি না। তবে একটী বিসদৃশ এই মনে হয়, কেহ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধাহারে রোগে ভুগিয়া মরিয়া যাইবে. কেহ রাশীকৃত ধন লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ধার্ম্মিক সত্যবাদী, কত পণ্ডিত গুণবান সাধু ব্যক্তির ঘরে অন্ন নাই, পক্ষান্তরে কত কত প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী উৎকোচগ্রাহী ধন সুখ সম্ভ্রমের উচ্চ মঞ্চে

বসিয়া আমোদার্থ কত অন্যায় ব্যয় করিতেছে। যাহাদের প্রচুর ধন, ক্ষমতা, শক্তি আছে তাহারা আপনাদের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট যদি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহা হইলে জগতের এত দারিদ্র্য কষ্ট অনাহার রোগ অজ্ঞানতা থাকে না। অধিক সুখবিলাসী স্বার্থপর না হইয়া পরের সুখে কেন লোকে সুখী হইবে না? যুদ্ধে জয় লাভের জন্য কত ব্যয়, কত পরিশ্রম, কতই দেহনাশ হইতেছে! লোকের হিতের জন্য এই রূপ ব্যয় যত্ন উৎসাহ ত্যাগস্বীকার করিলে পৃথিবীতে সুখ শান্তি কি বাড়িত না?"

ব্রহ্ম। এই জন্যইত আমি পরসুখে সুখী হইবার বিধান করিয়াছি, তদ্ভিন্ন সুখ কিছুতে হইবে না। মানুষের স্বাধীন রুচি এবং সুবুদ্ধির ভিতর দিয়া এই দিকে ক্রমে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, দিব্যচক্ষে তাহা দর্শন কর। উন্নতির সোপান আছে, ক্রম আছে এবং তাহার কার্য্যের মধ্যে বহু বিচিত্রতা আছে। কিন্তু সকলের শেষ গতি সামঞ্জস্যের দিকে। পৃথিবীর দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া বাস্তবিক যাহাদের দয়া সহানুভূতি এখন হইতেছে তাহাদের সংখ্যা যতই বাড়িবে ততই সে সব কমিয়া আসিবে। তথাপি মানুষ যখন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান নহে, তখন তাহার অপূর্ণতাজনিত যে সকল আপাততঃ শোকাবহ ক্লেশকর ঘটনা ঘটিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন। কোন জাতি বা দেশের সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের বাহ্য ফলাফল সম্পূর্ণরূপে কাহারো হস্তে নাই, যে পরিমাণে আছে তাহার জন্য লোকে কেবল যথাসাধ্য চেষ্টা করুক, তাহাতে তাহাদের শিক্ষা এবং উন্নতি হইবে; কিন্তু পরিণাম বিচার নিষ্পত্তি সামঞ্জস্য আমার হস্তে। আমি মানবনিয়তিকে কিয়ৎ পরিমাণে লোকের গোচরে স্বায়ত্তাধীনে এবং বহু পরিমাণে তাহাদের অগোচরে আমার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বে ঠিক লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছি, সে জন্য কোন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ব্যক্তির চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি আমাকে অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ গভীরদর্শী সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া আপনাপন জীবনকে সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল নিয়মের অধীন করিয়া রাখুক, এই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য; এবং এই খানে সমস্ত বিষয় মীমাংসিত হইবে। দুঃখ দুর্গতি দর্শনে যদি তাহার প্রাণ ক্রন্দন করে তাহাতে তাহার জীবন বিকসিত হইবে। কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য

ভুলিয়া জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায় কোন স্বার্থপর ব্যক্তি যদি আমার সৃষ্টির দোষগুণ সমালোচনা করে, তাহা হইলে তাহার মতামতের কোনই মূল্য নাই; এবং তাহা কেবল অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। আমার গূঢ় অভিপ্রায় জানিবার জন্য আশার সহিত প্রতীক্ষা এবং প্রার্থনা করা কেবল একমাত্র সুপথ।

জীব ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন এবং নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তবে কি সভ্যসমাজের উন্নতি অধোগতি বিনাশ এবং সাধারণ মানবসমাজের দুঃখ দুর্গতি, রোগ শোক মৃত্যু তোমার চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় রূপে গ্রহণ করিতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে পৃথিবীর আপাত সুখ স্বাস্থ্য শান্তি সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা বৃথা। কেন তবে আমরা পরের দুঃখ অভাব মোচনের জন্য ব্যস্ত হইব?"

ব্রহ্ম। তাহা তোমাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। দুঃখ দারিদ্র্য অভাব কষ্টে এক দিকে যেমন লোকের বিনয় দীনতা ধৈর্য্য অকিঞ্চনতা শিক্ষা হয়, তেমনি ধনী ক্ষমতাশালীর দয়াবৃত্তি তদ্দ্বারা কৃতার্থতা লাভ করে। দাতা ধনী ও দরিদ্র না থাকিলে দাতৃত্ব এবং দৈন্যের স্বর্গীয় ভাব কেহ দেখিতে পাইত না। ইহা ব্যতীত মানবাত্মার জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির অন্য উপায়ও আর নাই। অভাব দ্বারা তোমাদের স্বভাব নিয়তির পথে অগ্রসর হইবে এবং পরিণামে সিদ্ধ লাভ করিবে। এটাও কখন মনে করিও না, পৃথিবীতে কেবল সুখ সুবিধা বিলাস ভোগের জন্যই মানবের জন্ম হইয়াছে। এখানে যাহাতে আনন্দ শান্তি সুখ, তাহাতেই আবার ক্লেশ সন্তাপ মিশ্রিত। চিরমঙ্গল, অনন্ত কল্যাণ, পরম শান্তি নিত্য সুখের আধার একমাত্র কেবল আমি। যখন আমার স্বরূপত্ব তাহারা প্রাপ্ত হইবে তখন যাবতীয় দুঃখ অভাব ঘুচিয়া যাইবে। জ্ঞানকৃত পাপ ব্যতীত প্রকৃতার্থে দুঃখ অমঙ্গল বলিয়া কিছু নাই। মঙ্গলের ভিতর অমঙ্গল, আবার অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গলকর; অতএব আপাততঃ দুঃখ দুর্ভাগ্য বা সুখ সৌভাগ্যকে মঙ্গলামঙ্গলের চরমাবস্থা মনে না করিয়া আমার শেষ সঙ্কল্প এবং বিশ্বের সাধারণ নিয়তির প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখ। এবং মনুষ্যের অবস্থাবৈচিত্র্য দর্শনে অশেষ পূর্ব্বজন্ম কল্পনা না করিয়া, আমার অলঙ্ঘ্য নিয়ম এবং চরম অভিপ্রায় অবগত হও।"

জ্ঞানযোগ—১৬শ অধ্যায়।

শিক্ষালব্ধ এবং প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান।

বিজ্ঞানপিপাসু চিদানন্দ উপার্জ্জিত পরোক্ষ জ্ঞান এবং প্রত্যাদিষ্ট প্রত্যক্ষ দিব্যজ্ঞানের পৃথক লক্ষণ অবগতির জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! বাল্যাবধি অজ্ঞানে কিম্বা সজ্ঞানে আমি যাহা কিছু জ্ঞান সংস্কার লাভ করিয়াছি সমস্তই বাহ্য প্রকৃতি এবং মানবসমাজের সাহায্যে, পরে তাহা হইতে অন্তরে যে সকল জ্ঞানপ্রতিবিম্ব কিম্বা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত এবং চিন্তা ভাব বুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছে তাহা লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি, তদ্ভিন্ন জ্ঞান লাভের অন্য পন্থা কিছু কি আছে?

সদানন্দ। অবশ্য আছে। পরোক্ষ জ্ঞানের মূলে প্রথমে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান মানবস্বভাবে প্রকাশিত হয়; যদিও তাহা প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া সকলে অনুভব করিতে পারে না, এবং তাহার প্রকৃত লক্ষণ জানে না, কিন্তু সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানী মহাত্মাদিগের আবিষ্কৃত যে সকল তত্ত্ব গ্রন্থ পাঠে কিম্বা লোকমুখে শ্রুতিপরম্পরা অবগত হইয়াছ তাঁহারা সে জ্ঞান প্রথমে কোথায় পাইলেন? অবশ্য সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেরণাই জীবের আদি গুরু, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহার প্রধান উত্তেজক এবং প্রাকৃতিক ঘটনা ও অন্যদীয় পরোক্ষ জ্ঞান তাহার প্রমাণপ্রদ দৃঢ়তাসাধক সহায়।

চিদানন্দ। জনসমাজের আদিম অজ্ঞান অসভ্যাবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের বীজ এই রূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানবের চেষ্টাসম্ভূত এবং চিন্তাপ্রসূত যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি হইতে এখন আমরা প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত অবগত হইতে পারিতেছি। স্বভাবনিহিত ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তিই ইহার নিদান বটে, কিন্তু মানবজাতির যোপার্জ্জিত যত কিছু জ্ঞান ক্রমশঃ বংশের পর বংশ মানবীয় ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতর দিয়া বৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করিয়া পূর্ণতার দিকে যাইতেছে এবং

মৌলিক তত্ত্বও অনেক তৎসঙ্গে যাহা আবিষ্কৃত ও সংযুক্ত হইতেছে, আমার মনে হয়, এ সকল মানবীয় উদ্ভাবনী শক্তি এবং চিন্তা গবেষণার ফল। ইহার জন্য বারম্বার ভগবানের হস্তক্ষেপ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

পিতা দিব্যজ্ঞান-প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হইয়া গম্ভীর স্বরে তেজের সহিত বলিলেন, "এ বিষয়ে তুমি মহাভ্রান্তির মধ্যে বদ্ধভাবের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ এবং আপনাকে জ্ঞানপ্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছ; নিশ্চয় জানিও ইহা মৃত্যুর অবস্থা। ভগবানের ইচ্ছাশক্তি যাবতীয় জ্ঞানোন্নতির প্রতিপোষক বলিয়া যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তাহা মানবীয় উদ্ভাবনী শক্তি এবং গবেষণার মধ্যেও অপরিচ্ছিন্ন ভাবে চিরপ্রবাহিত আছে এ বিশ্বাস কেন করিবে না? সেই শক্তিপ্রভাবেই চিরদিন নব নব তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইতেছে।"

চিদানন্দ। আপনার ন্যায় তপস্বী এবং বিশ্বাসীর ইহা বিশ্বাসের কথা বটে, কিন্তু জ্ঞানীজগৎ ইহার কোন অনুসন্ধানও প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং বিশেষ দৈবপ্রেরণায় বিশ্বাসও করে না। অনেকানেক বড় বড় সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব ভার যাহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে তাহারা নিজের বুদ্ধিকৌশলের সাহায্যে তাহা অপেক্ষাকৃত সুচারুরূপেই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; এজন্য প্রার্থনা অথবা ভগবৎপ্রেরণা বা বিশেষ প্রত্যাদেশের কোনই প্রয়োজন হয় না।

সদানন্দ। তাঁহাদের কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত এবং প্রভুত্ব ক্ষমতায় স্বার্থপর সভ্যসমাজ সুখ সৌভাগ্যের লোভে অন্ধ হইয়া দিন দিন কি নরকের দিকে যাইতেছে না? উহা ধর্ম্মনীতির উচ্ছেদক, তুমি সে অসদ্দৃষ্টান্ত এবং কুশিক্ষা গ্রহণ করিও না। কারণ, রাজনীতিবিশারদ মহারথীরা সত্য ন্যায় দয়াধর্ম্মের প্রতি চাহেন না, তাঁহারা কেবল দেখেন, অধিকাংশের বেশী পরিমাণে আপাততঃ কিসে সুখ সুবিধা এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়; তজ্জন্য সাধারণের ভাবীকল্যাণ এবং অল্প সংখ্যকের আশু বিনাশও প্রার্থনীয়। তুমি যাহা সমবায়ের বা মিশ্রণের যৌগিক ফল বলিতেছ তাহার অভ্যন্তরেও জ্ঞানাধিপতির অভূতপূর্ব্ব প্রত্যাদেশ ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাইবে। জ্ঞানবিকাশ কিম্বা মৌলিক তত্ত্ব প্রকাশ রাসায়নিক কিম্বা যান্ত্রিকক্রিয়া-সম্ভূত ফল মনে করিও না।

চিদানন্দ। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান সংস্কার যাহা গ্রন্থে আবদ্ধ এবং স্মরণে থাকে এবং দৈনিক জীবনে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু দেখি শুনি, বুদ্ধি বিচার পরিচালনা দ্বারা তাহা হইতে চিন্তাপ্রতিবিম্ব সকল উজ্জ্বলালোকের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া উঠে, কেবল তাহারই সাহায্যে সাংসারিক অবস্থার কুটিল চক্র ভেদ করিয়া জীবনসংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিয়া থাকি।

বৃদ্ধ তপস্বী বলিলেন, "পুত্র, জীবসাধারণের অন্ধদৃষ্টিতে নিগূঢ় দৈবশক্তির কার্য্য প্রতিভাত হয় না। কিন্তু সর্ব্বান্তরাত্মা শ্রীহরির মহাশক্তির ক্রিয়া, তাঁহার ইচ্ছাপ্রবাহ বিকৃত বুদ্ধি চির দিন রুদ্ধ করিয়াও রাখিতে পারে না। তিনি অবিদ্যার স্তরসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আপনার জ্ঞানজ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করেন। তদ্ভিন্ন কখন কোন্ অবস্থায় তোমার কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া দিবে কে? প্রতি জীবনের পথ ভিন্ন ভিন্ন, সেই জন্য প্রত্যেকের অবস্থোপযোগী জ্ঞানও নূতন নূতন। জীবনসম্বল কি পুস্তকবদ্ধ শিক্ষালব্ধ মৃত জ্ঞান, না ভগবৎপ্রেরণা? বিজ্ঞানবিচার, জ্ঞানশাস্ত্রালোচনা অনেক স্থলে অসার কৌতূহল এবং আলস্য বৃত্তি চরিতার্থের উপলক্ষ্য। বালক বালিকারা যেমন গল্প উপকথা শুনিতে ভালবাসে, পরমার্থ তত্ত্বরস পানে বঞ্চিত ভগবদ্বিমুখ জ্ঞানান্বেষী বিদ্যাভিমানীদিগের অধ্যয়ন অধ্যাপন, বিচার চিন্তা যুক্তি তর্ক এবং সিদ্ধান্ত তেমনি একটী আকর্ষণের বিষয়। জ্ঞানী পণ্ডিত উপাধি সম্মান সনন্দপত্র, অভিনন্দন লইয়া যখন পরিবার, জনসমাজ, কার্য্য-ক্ষেত্রে রোগ শোক বিপদ প্রলোভন, সংশয় নিরাশা প্রতিবন্ধক, অনিশ্চয়তা, এবং দারিদ্র্য অপমান নির্য্যাতনের সম্মুখীন হইলেন, তখন কোথায় বা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি মান সম্ভ্রম রহিল, আর কোথায় বা রহিল তাঁহার চিন্তা বিচার যুক্তি তর্ক! রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধবিশিষ্ট বাসনার বিষয়সমূহ যখন ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত্ত প্রবৃত্তির করাল কবলে আসিয়া পড়ে তখন জ্ঞানী পণ্ডিত ত দূরের কথা, কত কত বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক এবং তপস্বী ঋষি মুনির মনও মোহমদিরাঘোরে উন্মত্ত হইয়া উঠে। সে অবস্থায় নৈতিক ভদ্রতা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীলতা কেহই পতন হইতে বাঁচাইতে পারে না। তখন কি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিবার অবসর থাকে?—না বিচার চিন্তার সময় পাওয়া যায়? সত্য কি, কর্ত্তব্য কি, মানুষ তাহা বুঝিয়াও স্বার্থানুরোধে, অভ্যাস-

দোষে মিথ্যা এবং অন্যায়ের শরণাপন্ন হয়। জ্ঞান পাণ্ডিত্য যাহাদের গৃহ-সজ্জার সামগ্রীবিশেষ, কিম্বা সম্মান লাভের মূল্যবান পরিচ্ছদ স্বরূপ ; এবং সুখ সুবিধা ফলাফলবিচার যাঁহাদের নীতির চরম আদর্শ তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমার ন্যায় মুমুক্ষু যুবার পক্ষে নিয়ত জীবন্ত প্রত্যাদেশের প্রয়োজন। জীবনপথে সুবহু বিঘ্ন বিপদ অভাব পরীক্ষা প্রলোভন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, অলক্ষিত ভাবে তাহারা কখন কোন্ অবস্থায় তোমাকে আক্রমণ করিবে তাহা জান না ; কিন্তু যখন যে অবস্থায় পতিত হও, জ্ঞানদাতা সদ্‌গুরু অন্তর্য্যামী পুরুষ তদবস্থার উপযোগী জ্ঞান তোমাকে প্রদান করিবেন। সে রূপ জ্ঞান যে না পায় তাহার বিদ্যা পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিবিধ গ্রন্থাধার আলমারির অতি অল্পই প্রভেদ। অতএব যে দিব্যজ্ঞান জীবনের অন্ন পান স্বরূপ এবং জীবন্মুক্তি লাভের উপায়, তাহার প্রতি তুমি কদাপি অবহেলা করিও না। তাহার নিতান্ত এবং বহুল প্রয়োজন জানিয়াই পরমগুরু জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর তোমার নিকটে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। মহাত্মা শ্রীজীবানন্দ ঈদৃশ দিব্যজ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্মের নিকট প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় এবং মনের অনুভূতি জ্ঞানে,—জ্ঞান বিশ্বাসে,—বিশ্বাস স্বাভাবিক সংস্কারে—এবং সংস্কার কার্য্যে ও চরিত্রে যে পর্য্যন্ত পরিণত না হয়, তাবৎ জ্ঞানের ধারণা সকল স্বপ্ন কল্পনা সমান জানিবে।”

পিতৃবাক্যের অবসানে জীব করপুটে অবনত মস্তকে তাঁহাকে বলিলেন, “আর্য্য, আমি বাস্তবিক জ্ঞানকে এত দিন দেহ এবং গেহসজ্জার সামগ্রী এবং আশু সুখ সুবিধার কৌশল মনে করিয়াছিলাম। ইহা যে আত্মার অন্ন পান স্বরূপ তাহা এখন বুঝিলাম।

যোগমগ্ন প্রশান্তাত্মা পিতা সদানন্দ পুত্রের সরলতা এবং সত্যানুরাগ দর্শনে অধিকতর উল্লসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “বৎস, লোকপরম্পরা উপার্জ্জিত জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গোচর ও স্বাধীন চিন্তোৎপন্ন স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান যদিও আমাদের পরম সহায়, কিন্তু তাহা মোহমিশ্র ; চক্ষুষ্মান এবং প্রাণপ্রদ নহে, এবং তাহার ভূমিও অতি সঙ্কীর্ণ ; প্রত্যাদিষ্ট দিব্যজ্ঞান ব্যতীত তদন্তর্গত নিগূঢ় মর্ম্ম কেহ কাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। অধিকন্তু পরোক্ষ জ্ঞান সীমাবদ্ধ ; পার্থিব স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধি বিচার যুক্তি তাহাকে

আপাততঃ কার্য্যকর করিয়া লয় বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের ভূত ভবিষ্যৎ মানচিত্রাঙ্কিত মৃত পৃথিবীর ন্যায়। ভবিষ্যতে কোন্ কারণের কি ফল, কোথায় কিরূপে ফলিবে তাহা বুদ্ধির আয়ত্তীকৃত বিষয়, তাহাতে অজানিত বিস্ময়কর নিত্য নূতনত্বের প্রস্রবণ থাকে না, সমস্তই জানা শুনার মধ্যে। ভগবান শ্রীহরি জীবকে যে দিব্যজ্ঞান মহিমার উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা অনন্ত রহস্যময় এক অনন্ত প্রস্রবণ বিশেষ। অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের জ্ঞান। ভক্তি বিশ্বাস, প্রার্থনা, নির্ভর ভয় নিরাশা একাগ্রতার ভিতর দিয়া সেই জীবন্ত জ্ঞানপ্রবাহ নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে। সময়োচিত, অবস্থার উপযোগী জ্ঞান এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যের অপূর্ণতা, ঘটনার বিচিত্রতা, অবস্থার জটিলতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার ঘন মেঘে তাহা আচ্ছন্ন থাকে, এবং চির দিন থাকিবে। পূর্ব্ব কালে লোকে যে সকল মানসিক শক্তি এবং ভৌতিক ক্রিয়াকে অলৌকিক বলিয়া বিস্মিত হইত, যদিও এক্ষণে তাহার অনেকাংশ বিজ্ঞানসিদ্ধ সহজবোধ্য বাষ্প বিদ্যুৎ জল বাতাসের মত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ব্যক্ত ব্রহ্মের অনন্ত অব্যক্ত মহা সত্তার যে অলৌকিকত্ব এবং অচিন্তনীয় রহস্য তাহা সমানই আছে এবং পরেও থাকিবে। অপূর্ণ অথচ উন্নতিশীল মানবাত্মার শিক্ষার জন্য এই অন্ধকারাবৃত বিস্ময়কর এবং ভক্তি প্রেমোদ্দীপক অব্যক্তাংশ নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা প্রতি ঘটনা, প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান সৃষ্ট পদার্থের অন্তরালে এক অনন্ত অব্যক্ত মহাসত্তার গভীরতা দর্শনে স্তম্ভিত, মোহিত এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিয়াছি। বহির্জ্জগতের বাহ্যাবরণ ও নিয়ম কৌশলের ভিতরে যতই প্রবেশ করিবে ততই উহার গভীরতা এবং বিস্তৃতি দেখিয়া অবাক্ হইবে। এই জন্য জ্ঞান বৃদ্ধির পরিমাণ অনুসারে জ্ঞানী ব্যক্তির শিক্ষাপিপাসা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইবেন, তিনিও চির কাল সক্রেটিশের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার সেই পুরাতন কথায় বলিবেন,—"আমি কিছু জানি না, কেবল এই জানি।"

— — —

জ্ঞানযোগ—১৭শ অধ্যায়।

—ঃ০—ঃ০—

বিশ্বজনীন নিয়ম এবং ব্যক্তিগত নিয়তি।

অতঃপর জীব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রজাবৎসল বিধাত! এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উপর তোমার যে সর্ব্বজনীন একাধিপত্য, অভ্রান্ত শাসন নিয়ম এবং তাহার সাধারণ মঙ্গলাভিপ্রায় ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এবং বিশ্বাসের অন্তর্গত একটী বিষয় বটে; কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত নিয়তি ও বিবিধ প্রকার অবস্থার সহিত ইহার সামঞ্জস্য কিরূপ? সার্ব্বভৌমিক নিয়মের বিধিবদ্ধ কার্য্যের সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কি স্থান পাইতে পারে? এক দিকে তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং অলঙ্ঘ্য সাধারণ নিয়ম, অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিশেষ নিয়তির স্বাধীন কর্ত্তব্য, উভয়ের মিলন কোথায়?

আচার্য্য। প্রত্যেক জীবের দৈহিক গঠন এবং আন্তরিক প্রকৃতি যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, তেমনি প্রতিজনের উন্নতির গতি, অবস্থা, সামর্থ্যও বিভিন্ন প্রকার; এবং তদনুসারে তাহার শিক্ষা শাসন দণ্ড পুরস্কার সুখ দুঃখ এবং পরিপোষণের নিয়মাদি ব্যবস্থিত আছে। আমার সার্ব্বভৌমিক শাসন বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধ বশতঃ আমি প্রতিজনের জন্য বিশেষ ব্যবহারের বিধান করিয়া থাকি। তদ্দ্বারা প্রতিজন যেমন আমার দেহ গেহ পরিবার, আমার অধিকৃত বল সামর্থ্য ইত্যাদিকে নিজস্ব বলিয়া জানে, তেমনি সাক্ষাৎ ভাবে আমাকেও "আমার মাতা পিতা, আমার সখা গুরু" বলিয়া বুঝিতে পারে। বিশ্বনিয়ন্তা এবং বিধাতা রূপে সমস্ত মানবজাতি এবং প্রত্যেকের জীবনকে আমি নিয়তির পথে লইয়া যাইতেছি। তোমাদের পরিজ্ঞাত নিয়মের অন্তরালে অপরিজ্ঞাত গূঢ় নিয়ম এবং তৎ পশ্চাতে গভীর প্রেমরহস্য আছে। তোমরা যাহাকে অদৃষ্ট বল তাহা আমার সর্ব্বজ্ঞত্বের দৃষ্ট বিষয় হইলেও বিচারপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে কর্ত্তব্য সাধনে কাহারো কোন অন্ধ বাধ্যতা নাই। মানবের প্রকৃতি যখন

গঠন করিয়াছি তখনই তাহার ভবিষ্যৎ নিয়তি আমি জানি, কিন্তু সে জন্য কি কেহ জড়বৎ পরিচালিত হইয়া থাকে? তাহা হয় না।

জীব। সুখ দুঃখের মধ্যে তোমার সাধারণ ব্যবস্থা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্তু কোন্ দুঃখী পাপী নগণ্য নরনারী কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, কীট পতঙ্গের ন্যায় প্রতিক্ষণে জন্মিয়া মরিয়া যাইতেছে, তুমি ব্রহ্মাণ্ডপতি হইয়া কি তাদের বিশেষ সংবাদ লও?

আচার্য্য। আমার সর্ব্বব্যাপিনী শুভ ইচ্ছাই যখন সকল প্রকার কার্য্য ও সম্বন্ধের হেতু তখন উহা অসম্ভব কেন হইবে? সমষ্টির সহিত যেমন, ব্যষ্টির সহিতও তেমনি আমার অপরোক্ষ নিকট সম্বন্ধ। তদ্ভিন্ন বিধাতৃত্ব শক্তির কোন অর্থই হয় না। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। কেবল দলের প্রতি সাধারণ সম্বন্ধ আমার নয়, অধিকাংশের বহু পরিমাণে সুখও আমার শাসনের উদ্দেশ্য নহে। তবে কোন্ অবস্থায় আমার কিরূপ বিধান তাহা ব্যক্তিগত স্বার্থকামনা এবং দৈহিক বা সামাজিক আশুসুখ সুবিধার চক্ষে সকল সময় প্রকাশিত হয় না। তজ্জন্য কেবল আমার বিধান প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।—অবশ্য অলসভাবে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কিম্বা নিজের যথাসাধ্য যত্ন পরিত্যাগ করিয়া নহে, কিন্তু তাহা নিঃশেষিত করিয়া। বিপদ এবং মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও আমি শান্তি ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার বল প্রদান করিয়া থাকি।

জীব। তোমার এই যে ব্যক্তিগত সন্তানবাৎসল্য, এটি কিন্তু বড়ই মিষ্ট এবং আশাপ্রদ। এইরূপে বিশেষভাবে যদি তুমি ভাল না বাসিতে, তাহা হইলে তোমার অনন্ত দয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। কিন্তু এই যে বিশেষ কৃপা এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ইহা কি আমাদের সুখ সুবিধা, সৌভাগ্য সম্পদের ভিতর দিয়া কেবল বুঝিব, না তদ্বিপরীত যাহা কিছু ঘটে তাহার মধ্যেও ইহা আছে? কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে কিম্বা সুখ সৌভাগ্য ঘটিলে যেমন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি বিশ্বাস উচ্ছ্সিত হয়, দুঃখ দুর্ভাগ্যের সময় সেরূপত হয় না; বরং তাহাতে হৃদয়ের ভাব শুকাইয়া বিশ্বাস কমিয়া যায়। ইহা কি অল্পবিশ্বাসের লক্ষণ?

আচার্য্য। আমার বিশেষ শিক্ষা পার্থিব জীবনের সুখ সম্পদে যেমন,

বিপদের মধ্যেও তেমনি জানিবে। আবার উভয়ের অতীত অবস্থাও তাহা বটে। আমি সুখ সৌভাগ্য দিয়া সন্তানদিগকে বিমোহিত প্রলুব্ধ করি এবং বিপদ ক্লেশ দ্বারা তাহাদিগকে শাসিত এবং সংশোধিত করিয়া থাকি। উভয়ের মধ্যে অভিপ্রায় মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অথচ সুখ দুঃখ দুইটাই অনিত্য ঘটনা। যে চতুর বিশ্বাসী ভক্ত সে এই ঘটনার অন্তরালে আমার চিরমঙ্গল প্রসন্ন মূর্ত্তিটী কেবল দেখিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হয়।

জীব। তবে মঙ্গল অমঙ্গল দুইটী কথা কেন প্রচলিত হইল? বিশেষ কৃপার দান কোন সুখ সৌভাগ্যের কালে কি তবে তোমাকে বিশেষ প্রেম ভক্তি দিব না? এবং শোক দুঃখের সময় কি কাঁদিয়া প্রার্থনা করিব না?

আচার্য্য। বিশ্বাসের উৎকর্ষ, চরিত্রের উন্নতির জন্য তাহা তুমি দিবে এবং দুঃখ বিপদেও তেমনি নত মস্তকে আমার প্রদত্ত সুশিক্ষা গ্রহণ করিবে। মঙ্গলের অর্দ্ধাংশ বিপদের অন্তর্গত বিষয়। এই জন্য বিশ্বাসী ভক্তেরা বিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষ নিত্য মঙ্গলের অনন্ত রহস্য মধ্যে অবতরণ করেন; তাঁহাদিগের লক্ষ্য সেই দিকেই নিবদ্ধ।

জীব। পৃথিবীর সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের ভিতর দিয়া তুমি যে স্বর্গরাজ্য গঠন করিতেছ, ক্ষণিক সুখ দুঃখ বাস্তবিক তাহার পরিমাপক হইতে পারে না। তোমার নিত্য সত্তা এবং স্থির মঙ্গলাভিপ্রায়টী যদি ধরিয়া রাখিতে না পারি, আর স্বার্থপরের ন্যায় কেবল নিজের ইহ জীবন সংক্রান্ত অভাব মোচন, বিশেষ সুখ সৌভাগ্যের ঘটনায় কেবল তোমার করুণা দেখি, তাহা হইলে দুঃখ বিপদ নিরাশা, রোগ মৃত্যু কষ্টের অবস্থায় বাঁচিব কিরূপে? বস্তুতঃ তুমিই একমাত্র নিত্য শান্তির স্থল। আচ্ছা, দৈনিক জীবনের সুখদুঃখবিমিশ্র কার্য্যের সহিত তোমার যে বিশেষ সম্বন্ধ, যদিও তাহার অবলম্বনেই মনুষ্য জ্ঞান শিক্ষা পায়, কিন্তু তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মঙ্গল ইচ্ছার সহিত কার্য্যতঃ তাহার সামঞ্জস্য কি প্রকার? যে সকল অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বজনীন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই আমাদের একমাত্র জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভূমি; তাহার যথাযথ ব্যবহার দ্বারা দুঃখ পরিহার সুখ বৃদ্ধি জীবের লক্ষ্য। কিন্তু তদ্ব্যতীত যাহা তোমার অব্যক্তাংশ, যাহার বিষয় আমি কিছু জানি না, তাহার উপরে নির্ভর রাখিয়া সে লক্ষ্য কি সাধন করা যায়?

আচার্য্য। আমার ব্যক্তাংশের সর্ব্বাঙ্গীন অভিপ্রায়, নিগূঢ় তত্ত্ব কি তুমি ভৌতিক, প্রাকৃতিক এবং মানসিক নিয়মের দ্বারা সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছ? প্রকট লীলার ক্ষেত্র এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের বাহ্যাভ্যন্তরে আমি কোথা কি ভাবে কি কার্য্য করিতেছি তাহার অনন্ত কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের আদ্যোপান্ত ইতিহাস, বর্ত্তমান, নিকট এবং সুদূর ভবিষ্যতের পরিণাম ফলের কি তোমার কোন জ্ঞান আছে? এক বার উর্দ্ধে অযুত অগণ্য সৌর ব্রহ্মাণ্ডের পানে চাহিয়া দেখ দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে আমার ব্যক্তাংশের কত টুকু তত্ত্ব তুমি অবগত হইয়াছ।

বিশ্ব-সৃষ্টির অনন্ত গাম্ভীর্য্যের মহিয়সী মহিমা সহসা অন্তরে প্রতিভাত হইবামাত্র জীবের মস্তিষ্ক বিলোড়িত এবং সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তখন ভাবে ভোর হইয়া তিনি বলিলেন, "হে বিশ্বদেব, তোমার ব্যক্তাংশের কণামাত্র জ্ঞানও আমি ধারণ করিতে পারি না। তাহা ভাবিলে আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়। এমন কি, তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহার বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহারও মর্ম্ম অবধারণে আমি সক্ষম নহি। তথাপি পরিজ্ঞাত মূল নিয়মের সাহায্যে তোমার ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাত অজানিত তত্ত্বের স্বভাব প্রকৃতি গতিক্রিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি; কেন না, তোমার বিধি নিয়ম সকল সার্ব্বভৌমিক, সুতরাং আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত, জ্ঞাত অজ্ঞাত বিষয়ে কোথাও তাহার ব্যভিচার ঘটে না। এই জন্যই জ্ঞানীসম্প্রদায় বলেন, বিশ্বনিয়ামক সাধারণ নিয়মাবলীর মধ্যে ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধের কোন স্থান নাই। তাঁদের মতে তোমার বিশেষ কৃপা, বিশেষ বিধি কিম্বা গুপ্ত ব্যবহারের কথা যাহা ভক্তসমাজে প্রচলিত আছে তাহা প্রেমকল্পনাসম্ভূত; যদি কিছু তাহাতে সত্য থাকে তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক নিয়মেরই অন্তর্গত; আপাততঃ আকস্মিক এবং বিশেষ বলিয়া মনে হইলেও উহা অখণ্ড শাসন বিধিরই অঙ্গীভূত।

আচার্য্য। সেত বাস্তবিকই বটে; কিন্তু জ্ঞানীরা যে ভাবে উহার ব্যাখ্যা করেন তাহাতে প্রকাশ পায়, আমার দৃশ্যমান নিয়মাদি ও ব্যক্ত সত্তা ব্যতীত গূঢ় অব্যক্ত শক্তি বা নিগূঢ় নিয়ম ব্যবহার আর যেন কিছু নাই; যাহা কিছু আমার দয়া প্রেম, গুণ ক্ষমতা সমস্ত যেন ঐ সকল জাগতিক

নিয়মে একবারে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। আমি যে নিয়মের অন্তরালে দুর্জ্ঞেয় নিয়ন্তা, কার্য্যের ভিতরে দুর্ব্বিগাহ্য পরম কারণ, ব্যক্তাংশের মূলে দয়া প্রেম পুণ্য ও জ্ঞান শক্তির অনন্ত অব্যক্ত আধার হইয়া রহিয়াছি ইহা কি অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত নহে? বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বরাজ্যের বিধিবদ্ধ সাধারণ নিয়মে যেমন জীবদিগকে আমি শিক্ষা দিয়া শাসন ও প্রতিপালন করি, তেমনি তাহার অতীত অবস্থায় মানবাধিকৃত জ্ঞানের অগম্য প্রদেশে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে গূঢ় ব্যক্তাব্যক্ত নিয়মে তাহাদের আত্মাকে আমি গঠন করি, এবং পূর্ণ পরিণতির দিকে লইয়া যাই। সাধারণ জ্ঞানও আমার দিব্যজ্ঞানালোক ভিন্ন সঞ্জীবিত এবং বিকসিত হয় না। জ্ঞানের আদি অন্তে সহজ এবং আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ বিশ্বাস, মধ্যস্থলে একটু কেবল তোমাদের বুদ্ধি বিজ্ঞানের রাজ্য। সহজে এইটী অবধারণ কর, তোমার সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানগণ্ডীর পরপারে আমার অসীম অপ্রকট অনন্ত মহাসত্তা গভীর জ্ঞানরহস্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে কেবল তাহা নহে, পরিব্যক্ত প্রকট লীলার ঐশ্বর্য্য বিভূতিও যথেষ্ট আছে। বহু কাল ধরিয়া জ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক বিচারে, তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিলেও তাহার অন্ত পাইবে না। বিশ্বতত্ত্বের কূটস্থ কার্য্যকারণের সূক্ষ্ম জ্ঞানক্রিয়া যত তাহারা দেখিতেছে, সেই পরিমাণে কি আমার প্রতি তাহাদের ভক্তি বিশ্বাস উজ্জ্বলতর হইতেছে? বরং আমার মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য ক্ষমতা শক্তির পরিচয় পাইয়া দিন দিন তাহাদের জ্ঞানের সিদ্ধান্ত আরো যেন সন্দেহাবৃত হইয়া উঠিতেছে। পণ্ডিতদিগের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কি আমি আশ্চর্য্য মহিমাশালী নই? জ্ঞানের সূক্ষ্ম কার্য্য যে যত দেখে তাহার নিকট জ্ঞানকৌতূহল তত পুরাতন চর্ব্বিতচর্ব্বণ হইয়া যায়; সমস্ত জানা হইল এই ভাবিয়া তাহারা তখন জীবনের শেষ সীমায় গিয়া উপনীত হয়। অথচ কত টুকু জ্ঞানই বা তাহাদের জন্মিল! পরিশেষে জ্ঞানশিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি যে আশ্চর্য্যকর্ম্মা মহান্ দেবতা, আমাকেও তাহারা বাষ্প বিদ্যুতের মত জানিয়া আমার সকল বিদ্যা তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে এই মনে করে। তথাপি এক একটী শাখা বিজ্ঞান কোটী কোটী জ্ঞানীবংশ জানিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না। আমি যেন এক জন চিত্রকর, বা গ্রন্থকার, শিল্পী, বা স্কুলমাষ্টার; আমার দুই পাঁচটী

কার্য্যের কিছু অংশ দেখিয়া প্রশংসা করিলেই যেন আমার সঙ্গে সম্বন্ধ সব ফুরাইয়া গেল। আমি যে পিতা মাতা আত্মীয়, প্রাণের প্রাণ, জ্ঞানের জ্ঞান, ইহা বলিয়া ভক্তি করা কি ভালবাসার কোন প্রয়োজন নাই। এই অপরাধে লোকে শেষ নাস্তিক অবিশ্বাসী হইয়া দুঃখ নিরাশায় আত্মহত্যা করে। আমি স্বয়ংই যে জ্ঞানশক্তি সদসৎ বিবেকবুদ্ধি জ্ঞানান্ধ মনুষ্য তাহা আগেই ভুলিয়া যায়, তাই এত ভুল বুঝে। তুমি যখন যে কোন বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হও, তখন তাহার মূল দেশে এক অজানিত অনন্ত জ্ঞানরহস্যের আভাস কি অনুভব কর না? মানবীয় চেষ্টা উদ্যম, বিচার সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা নিয়ম, এবং আশা প্রত্যাশা কত সময় বিপর্য্যস্ত হয় কেন? তাহার উপর আমার বিশ্বজনীন মঙ্গল শাসন আছে এবং তাহা দ্বারা যুগপৎ বিশেষ এবং সাধারণ হিত এবং শিক্ষা শাসন ব্যবস্থিত হয় এই জন্য।

জীব। বাল্যকাল হইতে সে অপ্রকট রহস্যে আমাকে বিস্মিত এবং বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান; ইচ্ছার উপর এক মহা ইচ্ছা আছে বেশ বুঝিতে পারি। তাই বুঝি আমার আয়ত্তাধীন জ্ঞানানুসারী কার্য্যে আশানুরূপ ফল সব সময় ফলে না?

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান বলিলেন, "বৎস, আমার বিশেষ কৃপা বিধান কাহার প্রতি কতবিধ জটিল ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া কখন কি আকারে আসিবে তাহা কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু যখন যাহা আসিবে তখন মৎপ্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিবে। দিব্যজ্ঞানে বিবেকালোকে যাবতীয় কর্ত্তব্য নিষ্কাম ভাবে সাধন করিয়া যাও, পরে তোমার নির্দ্দিষ্ট নিয়তির সহিত তাহা আমি মিলাইয়া লইব। শিশু কিম্বা বালক পিতা মাতা অভিভাবকের প্রেম যত টুকু বুঝে, আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান তোমার তদপেক্ষা অধিক নহে। তোমার অধিকৃত জ্ঞান কি তোমার নিজেরই পরিমাপক হইতে পারে? তুমি নিজে কি তাহাও তুমি জান না, আমিই কেবল তাহা জানি। কিন্তু এখন যাহা জান না, কিম্বা বুঝিতে পার না, ভবিষ্যতে তাহা বহু পরিমাণে অবশ্য জানিতে এবং বুঝিতে পারিবে; সেই অধিকার আছে বলিয়াই মানবাত্মার এত গৌরব। তথাপি এখন যেমন, পরেও চিরকাল তোমার জানিবার অবশিষ্ট বিষয় তেমনি পরিমাণে থাকিবে। অতএব শুন বলি, তোমার অর্জ্জিত যে বর্ত্তমান

জ্ঞান তাহা যখন তোমার পিতৃমাতৃতত্ত্ব এবং নিজতত্ত্বই তোমাকে বুঝাইতে পারে নাই, তখন তাহার ক্ষীণালোকে তুমি আমার জ্ঞান ও অভিপ্রায় একবারে কি রূপে বুঝিতে পারিবে? বিবেকলব্ধ জ্ঞানও ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ হয়। তাহা ছাড়া বিশুদ্ধ বিবেকানুগত কার্য্যেও সব সময় হাতে হাতে ফল ফলে না। এই অনিশ্চয়তার রহস্যমধ্যে তোমার জ্ঞান বিশ্বাস বিকসিত এবং পরিমার্জ্জিত হইবে।"

জীব এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব যখন শ্রবণ করিলেন তখন অবনত মস্তকে বলিতে লাগিলেন, "আমি এবং তুমি উভয়ই এক অতি আশ্চর্য্য রহস্যের অনন্ত ভাণ্ডার। তোমার ঐ অব্যক্ত অনন্ত রহস্যের মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ অবস্থিতি করিতেছে। চক্ষু দুটী অন্ধ, কর্ণ বধির, মস্তিষ্ক ও স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল রুগ্ন হইলেই আমার জ্ঞান ফুরাইল। এই ত আমার জ্ঞানের সীমা! আর আমি বেশী কি বলিব, বাহিরের দৃশ্যপট ও ঘটনা-বারণ অপসারিত করিয়া হে যবনিকার অন্তরালবাসিনী মাতঃ! তোমার প্রসন্নানন যেন অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আমি দেখিতে পাই এবং তোমাকর্ত্তৃক যেন আমি সর্ব্বদা পরিচালিত হই।"

প্রসন্নাত্মা ভগবান্ তখন বলিলেন, "দৃষ্টান্ত দ্বারা আরো পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন সম্রাট বা রাজমন্ত্রী, কিম্বা গৃহস্বামী যাঁহার হাতে অনেক গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত থাকে, বহু লোকের জীবিকা শিক্ষা শাসন ও প্রতিপালনের জন্য যিনি দায়ী, তিনি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বা বিষয়ের অধিপতি হইয়াও কি একটী দুঃখী প্রজা বা অনুগত ভৃত্যের অভাব দুঃখ মোচন করেন না? তুমি যদি তাঁহার নিকট চাকরী অথবা অর্থের প্রার্থী হও, তাহা প্রাপ্তির জন্য সুযোগ সুসময়ের কি প্রতীক্ষা কর না? সুবোধ শান্ত ব্যক্তি ঈদৃশ স্থলে কৌতূহলী না হইয়া সুসময়ের প্রতীক্ষা করে। এক্ষণে বিবেচনা কর, সামান্য এক জন রাজা বা রাজপুরুষের সঙ্গেও নিয়মাধীন হইয়া চলিতে হয়। আমি বিশ্বরাজ্যের রাজা, আমার কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে কি কোন গুপ্ত রহস্য এবং সুযোগ সুসময় নাই? তোমার কোন প্রার্থনা যদি বিলম্বে সফল হয় কিম্বা আপাততঃ যদি তাহা আমি শ্রবণযোগ্য মনে না করি, সে জন্য ইহা প্রমাণ হইতেছে না যে

তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধ নাই। আমি যদি দুঃখ বিপদ পরীক্ষার সময় আমার ভক্তকে আশা সান্ত্বনা না দিই এবং সুখ দুঃখ আশা নিরাশার মধ্য দিয়া তাহাকে শিক্ষিত সংশোধিত না করি, অন্যে আর কে তাহা করিবে? সাধারণ নিয়মাবলীর কি বিবেক বুদ্ধি, প্রেম সহৃদয়তা এবং সজ্ঞান কর্ত্তৃত্ব আছে যে তাহার হাতে আমি তোমাদের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত থাকিব? আমার ভক্তগণ স্বীয় স্বীয় জীবনেতিহাসের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আমার নাম সাক্ষর দেখিয়া আশা বিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত হন। প্রতিজনের অভাব পূরণ এবং পিপাসা আকাঙ্খার অপূর্ণতা উভয়ই আমার সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা দ্বারা ব্যক্তি ও জাতিগত বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী যাবতীয় অভাব স্বাভাবিক নিয়মে পরিপূর্ণ হয়। এক জন সম্রাট বা সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, নাবিক বা সারথির দোষে এবং ভুলে বহু বহু নির্দ্দোষ লোক অকালে মরিয়া যায় সত্য, কারণ আমার সাধারণ নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের মুখের প্রতি তখন চায় না; তথাপি আমি ব্যক্তিগত জীবনের কর্ম্মফলানুসারে দণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি। মরিয়াও কত লোকে এই জন্য নবজীবন পায়।”

জ্ঞানযোগ—১৮শ অধ্যায়।

—০:—:০—

সামাজিক সম্বন্ধ।

পরব্রহ্মের প্রমুখাৎ জীব যখন এই সকল গভীর তত্ত্ব কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে এই প্রশ্নের উদয় হইল, “তবেত জনসমাজ আমার দেহ স্বরূপ। দেহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ যেমন পাপ, সমাজবন্ধন ছিন্ন করাও তেমনি পাপ। অথচ অনেকানেক পুরাতন প্রথা, বদ্ধমূল কুসংস্কার

কুরুচি আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। ক্রমবিকাশ যদি হইল বিশ্বের স্বাভাবিক নিয়ম, তবে সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহারও সেই নিয়মের অন্তর্গত? কিন্তু পুরাতনের পরিবর্ত্তন দেখিলে রক্ষণশীল নরনারী প্রথমে চমকিয়া উঠে। কাল বিলম্বে অল্পে অল্পে আবার তাহারই অনুকরণ করে।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে লোকনাথ, প্রজাপতি, পুরাতন প্রচলিত প্রথার প্রবাহে আমি সকলের সহিত ভাসিয়া যাইব, না তাহার উন্নতি এবং সংস্কার করিব?"

ব্রহ্ম। যে যে স্থলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ধর্ম্মনীতিবিগর্হিত কোন পুরাতন আচার ব্যবহার প্রচলিত দেখিবে, কদাপি লোকভয়ে বা স্বার্থানুরোধে তাহার পক্ষ সমর্থন করিবে না।

জীব। তাহা হইলে যে সামাজিক এবং পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ হয়? সাধারণের সহিত যথাসাধ্য যোগ রক্ষা করিয়া সমাজকে সংস্কৃত এবং উন্নত করা ইহাইত তোমার আদেশ, কিন্তু পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে গেলে কাহারো সঙ্গে যোগ রাখা যায় না। ফলতঃ সমাজসংস্কার কার্য্য যেন একটা নূতন বিধ সৃষ্টি। যদি দলের সাহায্য না পাই, একা কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিব?

ব্রহ্ম। সৃষ্টিকার্য্য আমার কখন শেষ হয় না। কিন্তু জানিও, আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, সমাজসংস্কার কার্য্যে তুমি কেবল যন্ত্রস্বরূপ। মানবদেহের ন্যায় সমাজনীতিরও ক্রমবিকাশ হইতেছে। তাহার আরম্ভ সংস্কারকের ভিতর প্রথমে হয়। পুরাতন প্রথার সহিত সংগ্রাম করিয়া সে অগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

জীব। বড় কঠিন সমস্যা। মনুষ্যের রক্ষণশীল স্বভাব,—ভাল হউক মন্দ হউক,—পুরাতন প্রথা কেহ সহজে ছাড়িতে চাহে না। বিশেষতঃ প্রচলিত প্রথার সঙ্গে জীবন, সম্পত্তি এবং অনেক বিধ স্বার্থ সুবিধা জড়িত। কাজেই নূতনের যে মহোপকারিতা প্রথমে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না, বরং তাহার বিপরীত বুঝে; সুতরাং ভাল করিতে গেলে লোকে মন্দ মনে করে। অল্পে অল্পে যত টুকু সয় তাই করা কি ভাল নয়?

ব্রহ্ম। সব বিষয়ে তাহা খাটে না। যে গুলি পাপ অসত্য তাহা সমূলে

একবারেই ধ্বংস করিতে হইবে। শাখা প্রশাখা ছেদনে কোন ফল নাই। পুরাতন প্রথার মধ্যে নির্দ্দোষ রীতি ব্যবহারও অনেক থাকে, তৎসম্বন্ধে কতকটা সহিষ্ণুতা অবলম্বন শ্রেয়স্কর। তদ্ব্যতীত পুরাতনের মধ্যে অনেক নিত্য সত্য আছে, তদ্বিষয়ে চিরদিন রক্ষণশীলতা প্রয়োজন। কেন না, তাহা সত্যপ্রিয় রক্ষণশীলতা।

সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন প্রচলিত কুসংস্কারমিশ্র দূষিত দেশাচারে গ্রথিত সমাজ, তাহার অন্তর্গত এক একটী পরিবার, ইহাদের দোষ সংশোধন করা অতিশয় দুরূহ কার্য্য জানিয়া জীব সভয়ে বলিতে লাগিলেন, "আমি যদি প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে তোমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে যাই, এই দণ্ডেই আমাকে সমাজচ্যুত গৃহবহিষ্কৃত হইতে হইবে। বিধর্ম্মী সমাজদ্রোহী মনে করিয়া পিতা মাতা গুরু জনেরা কেহ আর আমার সেবা গ্রহণ করিবেন না, আমার দারা পুত্র পরিবার ভাবীবংশ সকল চণ্ডাল তুল্য বর্ণসঙ্কর বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিত হইবে; তাদৃশ অবস্থায় আমার সদুপদেশ শুনা দূরের কথা, পিপাসার্ত্ত হইলে এক পাত্র জলও কেহ দিবে না, রোগগ্রস্ত হইলে কেহ কাছে বসিবে না। এরূপ স্থলে তোমার আজ্ঞা পালনে আমারই বা কি উপকার হইবে, আর সমাজ পরিবারেরই বা আমি কি উপকার করিব? তাই মনে হয়, নিরাপদে থাকিয়া দোষগুলি যত দূর সংশোধন করিতে পারি তাহাই কর্ত্তব্য। একাকী আমি সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ীও নই। সময়ের গুণে স্বাভাবিক নিয়মে যখন যে পরিমাণে জনসমাজের রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইবার তাহা হইবে; কিন্তু অসময়ে তাড়াতাড়ি বলপূর্ব্বক তাহা সাধন করিতে গেলে সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত সমাজসংস্কার বা ধর্ম্মসংস্কার আমার একার জন্য নয়, সকলের জন্য; সুতরাং সকলের সহিত এক হইয়া তাহা না করিলে আমি স্বার্থপরের ন্যায় একাকী সে পথে গিয়া কি করিব? এই জন্য লোকে বলে যে "দশে মিলে করি কাজ, হারি যিনি নাহি লাজ।" একাকী এক উদ্ভট রকম জীব হইলে সব বিষয়েই ক্ষতি। তুমিই তো বলিয়াছ, নিঃসঙ্গ হইয়া একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তোমার লীলা দেখা যায় না, কর্ম্মযোগ সাধন হয় না। সামাজিক সাহায্য, এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনারাজীর ভিতর দিয়া আমি তোমার

দয়া প্রেম ন্যায়পরতা এবং মঙ্গলভাবের পরিচয় পাইয়া থাকি, সে গুলি যদি আমি হারাইয়া ফেলি, তাহা হইলে দাঁড়াব কোথা? করিব কি? হস্ত পদ যে সব বন্ধ হইয়া যাইবে?"

মৃদু হাস্যের সহিত পরব্রহ্ম বলিলেন, "সন্তান, এত ফলাফল ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আমার আদেশ কেহ পালন করিতে পারে? তুমি কি ইতিহাসে পড় নাই, কত কত স্বদেশহিতৈষী সাধু মহাপুরুষ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া জনসমাজকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন? ফল কি হবে না হবে তাহা তোমার ভাবিবার অধিকার নাই। আমার আদেশটী কেবল ঠিক করিয়া বুঝিয়া লইও। তার পর আমি জানি, তোমার দুঃখ বিপদে জগতের কত সুখ সম্পদ হইবে। আমার শত শত সুপুত্রের দ্বারা আমি নরকের গভীর গর্ত্ত বুজাইয়া তদুপরি অমৃত সেতু নির্ম্মাণ করিব, ভবিষ্যতের লোকেরা তাহার উপর দিয়া অনায়াসে অমৃতধামে চলিয়া যাইবে। কেন তুমি তোমার একটীমাত্র নশ্বর দেহ, একটী পরিবার বা সামান্য একটী জীবনের দুঃখ বিপদ পরীক্ষার বিষয় ভাবিতেছ? বিষয় ব্যবসায়ে সত্য রক্ষা করিতে গেলেও অনেক বিপদ পরীক্ষা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি তুমি সাধারণের সঙ্গে মিথ্যা পথ আশ্রয় করিবে? অতএব কি সামাজিক, কি বৈষয়িক, সত্য পালন সম্বন্ধে কাল বিলম্বের কোন ব্যবস্থা নাই। একটী সত্য পালন করিয়া, অন্ততঃ তজ্জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াও যদি তোমার জীবন শেষ হয় তাহাতেই তুমি ধন্য হইবে, ভবিষ্যৎ ফলাফলের জন্য তুমি দায়ী নহ। আমি তোমাকে পচাইয়া সার প্রস্তুত করিব এবং তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে ফলবান তরুসকল উৎপন্ন হইবে। তখন শত সহস্র জীবনে তোমার পুনরুত্থান দেখিতে পাইবে। এ সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞানই সুসময়ের অভ্যুদয় জানিবে।"

ব্রহ্মবাক্যে জীবের যখন ভ্রান্তি অপনীত হইল, তখন তিনি বুঝিলেন, ভবিষৎ শান্তিনিকেতনের ভিত্তি মূলে যদি আমি এক খণ্ড ইষ্টক হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার কৃতার্থতা। নরকের যে গভীর খাদ ভরাটের জন্য পূর্ব্বতন শত শত মহাজনের দেহ তন্মধ্যে পতিত হইয়াছে, আমি যদি তাহার এক পার্শ্বে একটু স্থান পাই ধন্য হইব। সংসারারণ্যে পরিবেষ্টিত

অমৃত তরু যখন উর্দ্ধদিকে উঠিতে চায়, পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র কণ্টক বনের অনুরোধে কি সে তখন মাটীতে মিশাইয়া থাকিতে পারে?

জীবের আশা উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য শ্রীভগবান বলিলেন, "সামাজিক নীতি ও দেশাচারের অনেক ব্যবহারিক কার্য্য সাময়িক অবস্থাগত, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। তন্মধ্যে যে সকল ভ্রান্তি কুসংস্কার আছে তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞান সংস্কার এবং উন্নতিশীল সুশিক্ষার আলোকে পরিশুদ্ধ হইতেছে এবং হইবে। তুমি আপাততঃ এ পথে যে সকল ক্লেশ প্রতিবন্ধক দেখিতেছ, উন্নতির প্রবাহমুখে তাহা বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারিবে না। সমাজসংশোধিনী শক্তিও আমারই, জনসমাজের উন্নতির জন্য তাহা আমি আমার পুত্রগণের জীবনে যুগে যুগে দেশে দেশে সঞ্চার করিয়া থাকি। যাহারা নিজের আরাম এবং সুখ সুবিধাকে জীবনাদর্শ করিয়া লইয়াছে তাহারা প্রচলিত কুসংস্কারপূর্ণ উপধর্ম্ম, দূষিত দেশাচার, দুর্নীতি অজ্ঞানতাকে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল। এই জন্য সত্য কি, কর্ত্তব্য কি তাহা জানিয়াও তাহারা উহার অনুসরণ করে না। তাহাতে তাহাদের বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমে মলিন হইয়া যায়। তুমি নিশ্চয় জানিও, আধ্যাত্মিক জীবনবৃক্ষ বিশুদ্ধ সমাজ এবং পবিত্র পরিবারের পুণ্যভূমি ভিন্ন অন্যত্র জন্মে না।"

জীব। আমি যে সামাজিক শত সহস্র বন্ধনে জন্মাবধি আবদ্ধ রহিয়াছি, তাহা ছিন্ন করা আর দেহের একটি অঙ্গ বাদ দেওয়া আমার পক্ষে দুই সমান। এ অবস্থায় আমি কুলধর্ম্ম, প্রাচীন প্রথার উচ্ছেদক সংস্কার কিরূপে প্রবর্ত্তিত করিব? ইহার বর্ণসঙ্করাদি ভবিষ্যৎ বিষময় ফলের বিষয় ভাবিলেও আমার হৃদয় কম্পিত হয়। পক্ষান্তরে যদি বিবেককে একটু সঙ্কোচ করিয়া—সঙ্কোচই বা কেন বলি?—তাহাকে যুক্তি সহকারে—এখনো সময় আসে নাই,—ইত্যাদি কথায় বুঝাইয়া যদি দশের সঙ্গে সঙ্গে চলি, তাহাতে অনেক লাভ।

জীবের সাংসারিক নীচ বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মবাণী জ্বলন্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গম্ভীর নাদে বলিতে লাগিল, "রে ভীরুস্বভাব! স্বার্থপর, তোমার এই কাপুরুষোচিত উক্তির নিম্নে কি পাটোয়ারি বুদ্ধি লুক্কায়িত নাই? কার

সম্মুখে তুমি এ সকল কুযুক্তিপূর্ণ কথা বলিতেছ তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ? স্বার্থই কি তোমার পরমপুরুষার্থ নহে ?”

মেঘগর্জ্জনবৎ সতেজ উপদেশ বচন শ্রবণে জীবের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি লজ্জাভয়ে তখন যেন মাটিতে মিশাইয়া গেলেন। অতঃপর মৃদু গম্ভীর স্বরে স্নেহবিগলিত আশা বাক্যে ভগবান বলিতে লাগিলেন, “তুমি বালকমতি, চঞ্চলবুদ্ধি, তাই কেবল চারিদিকে ভয়েরই লক্ষণ দেখিতেছ। স্বার্থকে বিষতুল্য জানিবে। আমার আদেশ সর্ব্বোপরি, তাহার নিকট কোন প্রবৃত্তি যেন কদাপি মস্তকোত্তোলন না করে, সাবধান! তোমার দুর্ব্বলতা অপূর্ণতা ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু ফলাফল-বিচার অতিশয় ঘৃণিত। দেশাচার লোকাচার সকল পরিবর্ত্তসহ; উন্নতিশীল ধর্ম্ম নীতি ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষানুসারে তাহা চির দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক যুগে যে সমস্ত ব্যবহারিক নীতি ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা এখন আর নাই। তবে আর প্রাচীন পদ্ধতির কথা কেন বার বার উল্লেখ করিতেছ? ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, ঋষিবাক্য বলিয়া পরিত্রাণের অনুরোধে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত প্রাচীন রীতি পালনজন্য তোমার চিত্ত ব্যাকুল, না কালসহকারে তৎ সঙ্গে পার্থিব সুখ স্বার্থ সুবিধা জড়িত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেই জন্য তাহার প্রতি তোমার মোহ আসক্তি? আমার আদেশে যে কার্য্য করে সে বর্ণসঙ্করের ভয়ে কখন ভীত হয় না। তাহার দ্বারা বংশ পরিবার দেশ উদ্ধার হইয়া যায়, পৃথিবীতে অভিনব আর্য্যকুল দেববংশ জন্মগ্রহণ করে।”

জীব। সে কথা সত্য, কিন্তু আমি যে দেশে, যে জাতি, বংশ এবং পরিবারে জন্মিয়া মানুষ হইয়াছি তাহার নিকট আমি অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ; এই জন্য ইচ্ছা হয় যে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে ক্রমে যদি আদর্শের দিকে অগ্রসর হই, তাহা হইলে অনর্থক আমারও কোন অসুবিধা ঘটে না, অথচ তাহাদেরও মঙ্গল হয়। এ প্রকার নির্দ্দোষ পথ অবলম্বনে কাজের ক্ষতি কি? লোকাচার ও প্রচলিত সামাজিক ধর্ম্মের মধ্যে কোন অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য সত্যও নাই। আমি মনে মনে অবশ্য জাতিভেদ, উপধর্ম্ম, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কারমূলক সামাজিক ক্রিয়া, এবং দুষিত

দেশাচারকে অজ্ঞানতার কার্য্য বিবেচনা করি,—আজ কালের দিনে কেই বা এ সব মানে?—কিন্তু মূর্ত্তিপূজার ভিতরে তোমার সর্ব্বব্যাপী আবির্ভাব অন্তরে দেখিয়া যদি দৃশ্যতঃ কেবল বাহিরে বাহিরে তাহাতে যোগ দিই, এবং পারিবারিক ও সামাজিক শান্তিরক্ষার্থ নির্লিপ্ত ভাবে যদি পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দেশাচারের অনুগত হইয়া চলি, তাহাতে ধর্ম্মতঃ কোন প্রত্যবায় আছে বলিয়াত মনে হয় না। আর এক কথা এই, সমাজের অনুরোধে ঐ সকলের সহিত বাহিরে ষোল আনা যোগ রাখিয়াও আমি উপাসনাদিতে যথেষ্ট শান্তি তৃপ্তি পাই, সে বিষয়ে কোনই ব্যাঘাত ঘটে না। পক্ষান্তরে দেখি, কত লোক বাহিরে সমাজসংস্কারক, কৌলিক আচারত্যাগী, কিন্তু ভজন পূজন সম্বন্ধে নাস্তিকবৎ, নীতি বিষয়ে জঘন্য চরিত্র। মুখে তাহারা বলে জাতিভেদ মানি না, অথচ ছোট বড় ভেদ জ্ঞানটী বিলক্ষণ প্রবল; দরিদ্র অশিক্ষিতদিগকে অস্পৃশ্য মনে করে।

ব্রহ্ম। কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কি অভিসন্ধিতে তুমি এ যুক্তির আশ্রয় লইতেছ?

জীব। কেন, নিজের প্রতি, তোমার প্রতি এবং সমাজের প্রতি সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি।

ব্রহ্ম। হা দুর্দ্দশা! এত দিন তবে কি বুঝিলে? লোকে দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তুমি তিন প্রভুর সেবা করিতে চাহিতেছ! যাহা মিথ্যা বলিয়া জান, কোন প্রকার স্বার্থের বশীভূত হইয়া লোকের অনুরোধে তাহা যখন সত্য বলিয়া ভান্ কর, তখন কি সত্যদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক কপটাচারী বলিয়া আপনাকে ঘৃণিত মনে হয় না? সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষা কি একটী বণিগবৃত্তি, না আমোদ উপহাসের বিষয়? লোকরঞ্জনের জন্য পিতা পুত্রে ঘরে ঘরে বিবাদ করিবে, তার পর শেষ দেখিবে কেহ কারো নয়; তখন কি আপনাকে আপনি মহা মূর্খ বলিয়া মনে হইবে না? এখনো কি সে জন্য আত্মগ্লানি হয় না?

জীব। আগে আগে হইত, এখন আর কৈ তেমন হয় না। বরং ভজনবিহীন বর্ণসঙ্কর ডিইষ্টিক রিফর্ম্মারদিগের অপেক্ষা নিজেকে ভালই মনে হয়। কারণ, তাহারা চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করে না। শুদ্ধাচারী ভক্ত হইয়া

তোমার নিকট আমি খাটি থাকিব, এইটী আমার অভিপ্রায় ; ব্যবহারিক জীবনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি আর সব দিক রক্ষা পায় তাহাতে দোষ কি ?

ব্রহ্ম। দোষ এই যে, তুমি সর্ব্বাগ্রে বিবিধ কৌশলে আপনার ষোল আনা স্বার্থ সাধনটী যাহাতে হয় তাহা ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছ, তদনন্তর আমাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ভক্ত ভাবুক হইতে চাও। কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইহা তোমার বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মপ্রতারণা, ভাবের ঘরে চুরি কি না তাহা ভাবিয়া দেখিও, তাহা হইলেই এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইবে।

জ্ঞানযোগ—১৯শ অধ্যায়।

—ঃ০—ঃ০—

রাজনীতি।

পরম পুরুষ অনন্ত দেবের সর্ব্বব্যাপী সত্তায় নিমগ্ন হইয়া জীব দিব্য জ্ঞানে বুঝিলেন, দেহ গেহ পরিবার এবং সমাজ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার যদিও ক্ষণ-স্থায়ী চিরপরিবর্ত্তশীল, দীর্ঘকালব্যাপী একটী বৃহৎ স্বপ্ন সমান, কিন্তু ইহাই অনন্ত জীবনের সোপান স্বরূপ। যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সশরীরে বাস করিতে হইবে তত দিন উহাদের অবলম্বন ব্যতীত জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবার কোন ব্যবস্থা নাই। যদি তাহাই হইল, তবে রাজনীতির সঙ্গেওত আমার গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে দেখিতেছি। দেহ মন বিবেক এবং তাহার প্রতিপোষক আত্মীয় পরিবার স্থাবরাস্থাবর বিষয়াদির উপর যদি আমার ধর্ম্মানুগত স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে আমার আত্মাওতো নীচ ভীরু পরাধীন মলিন হইয়া যাইতে পারে? তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিলে কর্ম্মযোগ তবে কেমনে সম্পন্ন হইবে? অতএব জাতীয় এবং রাজকীয় স্বাধীনতা আমার মুক্তির পক্ষে কি নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে? যে দেশে যে জাতির আমি অভেদাঙ্গ তাহা যদি ভিন্ন জাতির শাসনাধীনে দাসবৎ চির দিন অবস্থিতি করে, তাহা হইলে দৈহিক মানসিক পারিবারিক

সামাজিক এবং কৃষী শিল্প সাহিত্য বাণিজ্য, জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি কোন বিষয়েরই উন্নতি কখন হইতে পারে না। এই কারণে পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে, সব সময়ে এই রাজকীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য লোকে প্রাণপনে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ যাহারা সভ্য জাতি, এই স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বাধীনতাই তাহাদের পরম ধর্ম্ম। এমন কি, তাহাদের নৈতিক চরিত্র, বিশ্বাস বৈরাগ্য উপাসনা পর্য্যন্ত রাজকীয় কর্ত্তৃত্বের অন্তর্ভূত। এইরূপ বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "হে রাজাধিরাজ, বিশ্বপালক, রাজনীতিবিজ্ঞানের মর্ম্মও আমাকে কিছু বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে সংসারে আমি নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি।"

ব্রহ্ম। তোমাদের সভ্যজাতিও সুসভ্য নয়, তাহাদের রাজনীতিও ধর্ম্মনীতি নয়; লোকরক্ষার উপযোগী ন্যায় সত্যের একটু ছায়া মাত্র কেবল তাহাতে আছে। তাহার দোহাই দিয়া রাজা রাজপুরুষেরা পূর্ণমাত্রায় নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করেন। প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক ও জাতিগত বিশেষত্ব অনুসারে প্রত্যেক জাতির বিশেষ গুণ ক্ষমতা বিকসিত হয়, তদনন্তর তাহার বিস্তার ও পূর্ণতা সাধনই জাতীয় শাসনবিধি এবং সমাজবন্ধনের তাৎপর্য্য। ইহারা স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজ নিজ বল বুদ্ধির স্বাধীনতার বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক অহঙ্কার করিবে এবং এক জাতি ধন জন বল বুদ্ধি বিক্রমে প্রবল হইয়া অন্য জাতির সহিত রাক্ষসবৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিবে, কিম্বা দুর্ব্বলকে নাশ করিয়া কোন একটী বিশেষ জাতি ধরাতলে অদ্বিতীয় অধিপতি হইবে, আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাহা নহে। সকলেই স্বাধীন, অথচ সকলের সহায়, এবং পূরক; এই অভিপ্রায়ে আমি বিশেষ বিশেষ জাতি এবং তাহার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা শক্তি কর্ম্মদক্ষতা প্রদান করিয়াছি। ব্যক্তি কিম্বা দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে যে কেহ ন্যায়বান্ দয়ালু বিশ্বহিতৈষী সাধু চরিত্র সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, অপর সাধারণ মানবমাত্রের শাসনকর্ত্তা বা নেতা হইবে। এক দেশে বা এক জাতির মধ্যে যে গুণ ক্ষমতা নাই, অন্য দেশে অন্য জাতির ভিতর তাহা আছে; এক অপরের সহিত তদ্বিনিময়ে আমার মহতী ইচ্ছা পূর্ণ করিবে। কোন

মনুষ্যবিশেষ যদি অত্যাচারী স্বার্থপর লোভী নরহন্তা হইয়া আপনার দৈহিক বল এবং বুদ্ধি কৌশলের অপব্যবহার করে সে কি নিন্দনীয় ঘৃণিত হয় না? অবশ্যই হয়। মনে কর, ঈদৃশ নরাধম প্রধানেরা যদি লক্ষ লক্ষ প্রজার পশুবলসাহায্যে একটী শাসনকর্ত্তৃ দল বাঁধে, তাহা কি জীবন্ত নরক নহে? এবং তন্মধ্যে কি বিনাশের বীজ স্থিতি করিতেছে না? যে কাজ এক ব্যক্তি করিলে ঘৃণা নিন্দা এবং ঘোরতর অভিসম্পাতের বিষয় হয়, বহু লোকে সভা সমিতি করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা যদি বিধিপূর্ব্বক প্রকাশ্যে তাহা নির্ভয়ে সম্পাদন করে এবং ছলে বলে চাতুরী কৌশলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া জয়ধ্বজা উড়ায়, তাহা কি ভয়ানক নির্লজ্জতা, ভীরুতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা নহে?

বুদ্ধিমান চতুর এবং অধ্যবসায়শীল প্রতাপান্বিত রাজা রাজপুরুষেরা স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন রাজ্য বা দেশবিশেষের উপর কিছু দিন একাধিপত্য করে বটে, কিন্তু এক দিন না এক দিন তাহাদিগকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেই হয়। অন্যায় প্রভুত্ব নিবারণের ঔষধ আমার হাতে আছে, তাহার অজেয় প্রভাব ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ। শত শত দুরাচারী রাজা, পাতসা, নবাব সম্রাট কালস্রোতে পূর্ব্বে যেমন ভাসিয়া গিয়াছে এখনো তেমনি যাইবে: কিন্তু আমার অভ্রান্ত অমর ন্যায় নীতি দয়া প্রেম এবং তাহার পক্ষসমর্থনকারী আত্মত্যাগী বিশ্বহিতৈষীরা চিরকাল লোকসমাজের পরিচালক হইয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। অসার স্বাধীনতা, রাজকীয় অধিকার লইয়া তুমি কি করিবে? সেবাতেই মহত্ত্ব এবং অমরত্ব।

জীব। তাহাতে আর সন্দেহ কি। তোমার মত এবং তোমার প্রিয় ভক্তদিগের মত কেহই স্বাধীন নহে, অথচ তুমি এবং তাঁহারা সকলের বন্ধু এবং সেবক। বাস্তবিক ব্যক্তিগত পাপ লোভ স্বার্থপরতার জাতিগত সমষ্টিই অনন্ত নরক। এরূপ স্বাধীনতার বল বিক্রম পশুত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। হায়! মোহান্ধ গর্ব্বিত মনুষ্যেরা এই জন্য প্রাণ পাত করে। দয়া ধর্ম্ম নীতি পবিত্রতার স্বাধীনতা এবং বীরত্বই বিশ্ববিজয়ী পরমপূজ্য। তাহা দ্বারা লোকের হৃদয় চিরদিন বশীভূত ও রাজভক্ত থাকে। কিন্তু তুমি ভাল মানুষ দয়ালু সাধুচরিত্র ব্যক্তিরাই যে রাজ্য শাসন করিবে বলিলে,

তাহা কি সম্ভব? এক জন ভাল মানুষ দয়ালু লোকপ্রতিনিধি জনহিতৈষী হইলেই যে তিনি বিদ্যা বুদ্ধি রাজকার্য্যদক্ষতায় লোকপরিচালক হইতে পারিবেন তাহারতো কোন সম্ভাবনা দেখি না। ভাল লোক মাত্রেই প্রায় নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত। যদিও তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব ভাল, ইচ্ছা শুভ, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা বিষয় কার্য্যের অনুপযোগী। কেবল সাধুগুণ থাকিলে কাজ চলে না, বুদ্ধিচাতুর্য্য বৈষয়িক কৌশল ক্ষমতা কর্ম্মপটুতা ইহাতে বিশেষ দরকার। তদ্ভিন্ন কি বিস্তীর্ণ কোন রাজ্যের শান্তি রক্ষা হয়? অবশ্য রাজনীতিজ্ঞেরা অনেক মিথ্যা ছল কৌশলের সাহায্যে রাজ্য পালন বা শাসন করেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

ব্রহ্ম। ভাল লোকেরা অকর্ম্মণ্য নির্ব্বোধ, আর বুদ্ধিমান চতুর কর্ম্মঠ ব্যক্তিরা কপট ধূর্ত্ত, ইহা মনে করিও না। সুদক্ষ কর্ম্মঠ, অথচ সুবোধ শান্ত সচ্চরিত্র পরপ্রেমী ইহা অসম্ভব নহে। প্রেমিক জনেরা যেমন আত্মত্যাগী পরিশ্রমী ও সুচতুর এবং পরসুখে সুখী এমন আর কে হইতে পারে? জীবের প্রতি তাহাদের প্রেমই বল বুদ্ধির প্রস্রবণ। দেশের শাসনকার্য্যের জন্য মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক শঠ কুটিল রাজমন্ত্রী, নিষ্ঠুর সেনাপতি, ফলাফলবাদী বিধানকর্ত্তা এবং আত্মম্ভরী সম্রাটের একান্ত প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন বিষয়কার্য্য চলে না, এ সংস্কার একবারে উল্‌টিয়া যাওয়া উচিত। জাতীয় স্বার্থপূরক কুটিল কুমন্ত্রণা, বিষাক্ত আগ্নেয়াস্ত্র, দূরগামী কামান বন্দুক গুলি গোলা, বারুদ কিম্বা সৈন্যদলবলের দ্বারা যাহারা রাজ্য বিস্তার,—অধিকার এবং—জয় করে তাহারা যেমন প্রকৃত বীর পুরুষ নহে; তেমনি চাতুরী প্রবঞ্চনা দুষ্ট বুদ্ধি এবং কপট কৌশলে যে জাতি বা যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ তাহারাও প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা নহে। এরূপে যাহারা স্বদেশ স্বজাতির ধনৈশ্বর্য্য এবং প্রভুত্ব সম্ভ্রম উপার্জ্জন করে তাহারা স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বরং সুশিক্ষিত সুদক্ষ বলবান সমাজদ্রোহী গুণ্ডা তস্করের মধ্যে তাহাদিগকে গণ্য করিতে হইবে। মিথ্যা কথা বলিয়া, ফাঁকি দিয়া, বিজাতীয় কতকগুলি প্রজাকে সবংশে বিনাশ এবং সর্ব্বস্বান্ত করিয়া স্বজাতির পার্থিব ধন মান প্রভুত্ব এবং দৈহিক সুখ স্বাস্থ্য পশুবল বৃদ্ধির

জন্য কে তাহাদিগকে রাজত্ব পদ প্রদান করিয়াছে? পরের দুঃখ মোচন, এবং রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিব, এই কথা বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়া কি রাজধর্ম্ম? আমিত জানি কে কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করে।

জীব। অভিপ্রায় ভিতরে যাহাই থাকুক, বুদ্ধিমান বলবান সভ্যজাতির প্রভুত্ব শক্তির সাহায্যে দুর্ব্বল অসভ্যদিগের পরিণাম ফল মঙ্গলকর; ইহার ভিতর বিধাতৃত্ব মঙ্গলাভিপ্রায় আছে বলিয়াই শেষোক্তেরা রাজভক্ত হয়। কিন্তু রাজ্যের শান্তির জন্য শাসন পীড়ন একদিকে নিতান্ত অপরিহার্য্য।

ব্রহ্ম। এইরূপে আমি বিষ হইতে অমৃত উদ্ধার করি। কিন্তু কুঅভিপ্রায়প্রসূত সুফলের অনুরোধে কেহ নিজ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। দুষ্টের দমনজন্য উপযুক্ত দণ্ড বিধান মঙ্গলের জন্য, কিন্তু উৎপীড়ন উচ্ছেদ কখন অভিপ্রায় হইতে পারে না। তাহা প্রভুত্বের অপব্যবহার।

জীব। যাহাই হউক, পার্থিব সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্য আমার মনে হয়, এরূপ কোন স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজন। যাহারা পরাধীন, উদরান্নের জন্য গো মহিষ ঘোটকের ন্যায় যাহারা দিবা নিশি পরিশ্রম করে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অর্দ্ধাহারে অকালে মরিয়া যায়, তাহাদের দ্বারা নিজের বা অন্য কাহারো কোন উপকার হয় না। ঈদৃশ ভীরু কাপুরুষ অধীন জাতির ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধই বা কোথা? যাহারা স্বাধীন জাতি তাহারা যুদ্ধ রাজকার্য্য, বাণিজ্য শিল্প কৃষী, খনিজাবিষ্কার, দেশপর্য্যটন, জ্ঞান, বিজ্ঞান সাহিত্য গীত বাদ্য সমস্ত বিষয়েই দিন দিন কেমন উন্নত হইয়া উঠিতেছে! তৎসঙ্গে ঔদার্য্য, মহত্ত্ব, ত্যাগস্বীকার, সৎসাহস আপনাপনি জন্মে। আর পরাধীন জাতি অলস ভীরু দুর্ব্বল পরমুখাপেক্ষী নিরন্ন গণ্ড মূর্খ নীচাশয় হইয়া ক্রমে লয় পাইতেছে। উপযুক্ত যে সেই জীবিত থাকে, ইহাত তোমারই সার্ব্বভৌমিক বিধান। উন্নতির মুখে যে জাতি সবংশে উৎসন্ন হইয়া গেল, তাহাদের অস্তিত্ব আর রহিল কি?

ব্রহ্ম। বলবানেরা উপযুক্ত, সুতরাং তাহারাই জীবিত থাকিবে, আর দুর্ব্বলেরা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; কিন্তু ইহা কিরূপ বল? পশুবলের উপযুক্ততা আবার নৈতিক বলের নিকট পরাজিত হয়। মনুষ্যজাতি এক অখণ্ড অবিভক্ত; জল বাতাস স্থান কালের বিচিত্রতা বশতঃ তাহাদের

দৈহিক ও মানসিক বিকাশ এবং কার্য্যকারিতা বিচিত্র, তথাপি তাহারা আদি অন্তে একই। একের সাহায্য ব্যতীত অন্যের উন্নতি হয় না। পরস্পর বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ এবং সংবর্দ্ধনে পরিণামে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সমুৎপন্ন হইবে, তাহার ভিতর জাতীয় বা প্রদেশীয় স্বাধানতা এবং পশুবলের বীরত্বের বিশেষ অহঙ্কার করিবার কিছু থাকিবে না; পরস্পর বিনিময়ে বিচিত্রতার সহিত যে একতার সামঞ্জস্য সাধন তাহাই যথার্থ রাজধর্ম্ম। তখন যিনি কর্ত্তা রাজা বা রাজপ্রতিনিধি তিনি হইবেন পরিচারক; ধনী জ্ঞানী গুণী বলবান এবং সাধু ধার্ম্মিকেরা সাধারণ প্রজাপুঞ্জের অভিভাবক হইয়া তাহাদের সেবা করিবেন। এই জন্য কেবল তাঁহাদের স্বাধীনতা প্রভুত্ব থাকিবে। সে অবস্থায় যাহা কিছু জাতীয় সদ্‌গুণ বা বিশেষ ক্ষমতা তাহা প্রতি জনের নিজস্ব। তোমার আমার, এ অভিমানসূচক গুণের যে পার্থক্য তাহা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডপতি বিধাতা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "দুর্ব্বল অজ্ঞান দীন দরিদ্রদিগকে পদদলিত করিয়া তাহাদের উপর জীবিত কালের কয়েকটা বৎসর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন কিম্বা সমকক্ষ জাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহকে স্বাধীনতা বলে না; সেরূপ স্বাধীনতার যে বীরত্ব তাহা একটা বিশালবপু বন্যহস্তী বা তীক্ষ্ণদন্ত বরাহ ব্যাঘ্রের কি নাই? যাহার স্বার্থ অভি-মানে একটু আঘাত লাগিলে শরীরের সমস্ত শোণিত মস্তকে উঠে, সামান্য একটী প্রলোভন হস্তগত অথবা কবলচ্যুত হইলে যে আপনাকে ভুলিয়া গিয়া উন্মাদ প্রায় হয়, তাহার আবার স্বাধীনতা কোথায়? সেত রিপুর ক্রীতদাস, বাসনার ক্রীড়ামৃগ। তুমি যে জাতীয় স্বাধীনতার বহুল উপকারিতা বর্ণন করিলে, ভাবিয়া দেখ, তৎসমুদায় এক দিন এই পৃথিবীতেই পরিণাম প্রাপ্ত হইবে কি না। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ মুক্তজীবনের চির উন্নতি। জাতি সম্প্রদায় বা দেশবিশেষের দলবন্ধনে পৃথিবীতে অনেক কাজ হয় সত্য; কিন্তু এই দলবলসাহায্যে যদি ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া কিম্বা যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বিষয় বিত্ত অপহরণ করিয়া আপনাদের একাধিপত্য বিস্তারে তাহারা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকে এবং লুণ্ঠিত অপহৃত রাজ্যধন

স্বদলস্থ বলিষ্ঠ প্রধানদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়, তাহাদের সেই ঐক্যবন্ধনের সঙ্গে চোর ডাকাইতের একতা ষড়যন্ত্রের পার্থক্য কি? রাজার উপর প্রজা সাধারণের ধর্ম্ম অর্থ কাম, জীবন সম্পত্তি, পারিবারিক ও সামাজিক নীতি বহু পরিমাণে নির্ভর করে বটে, কিন্তু কয় জন রাজা সে দিকে চাহিয়া রাজকার্য্য করিতেছে? স্বজাতি কিম্বা বিজাতি যে কোন রাজশাসন হউক, উহা যদি কেবল বলবান বুদ্ধিমান প্রধানদিগের ব্যবসায় স্বরূপ হয়, তাহা হইলে রাজশাসনের নামে উহা ঘোরতর প্রবঞ্চনা। বিধবা নাবালগ এবং দীন দুঃখীর অভিভাবক হইয়া যদি কেহ তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক আত্মোদর পূর্ণ করে তাহার অপরাধ যেমন অমার্জ্জনীয় ইহাও তদ্রূপ জানিবে।”

“মনে কর, কোন এক সভ্য জাতি স্বীয় স্বাধীনতার প্রভাবে প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা যথন ধন জন বল বুদ্ধির চরম উন্নতিতে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইবে তখন তাহারাই কেবল বাঁচিবে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অনুপযুক্ত জাতিরা সুতরাং কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বাঁচিয়া রহিল কেবল সেই প্রবল একটী জাতি। তাহাদের ভাষা ধর্ম্মমত সামাজিক রীতি গায়ের রং মন ও দেহের গঠন এক প্রকার, পৃথিবীতে আর তাহাদের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ নাই, যাহারা ছিল তাহারা ক্রমে উহাদের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে; কোন বিষয়ে কোন রূপ ছোট বড় ভিন্নতা আর রহিল না। পূর্ব্বে ছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতি এখন সমস্ত নরনারী এক পরিবারের অন্তর্গত। এই সর্ব্বগ্রাসী জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়ে স্ব স্ব স্বাধীন। যাহার অংশে একটু কম পড়িবে সেই বিদ্রোহী হইবে। কাজেই সাম্যনীতি তখন প্রয়োজন।

তার পর এই এক অখণ্ড স্বাধীন জাতি পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্রের অন্তর্গত যত দেশ আছে তাহার সমস্ত পতিত ও জঙ্গল মরুভূমিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিল। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে রেলরোড তারবিহীন টেলিগ্রাফ টেলিফোঁ; নগর উপনগর পল্লীতে ড্রেন জলের কল বিদ্যুতের আলো কলেজ স্কুল ভজনালয় হাসপাতাল পাঠাগার দরিদ্রভবন অনাথাশ্রম; নদ নদী হ্রদের উপর সেতু, গিরিশৃঙ্গে মহাসমুদ্র-বক্ষে জলে স্থলে বাষ্পীয় যান, অন্তরীক্ষে ব্যোমযান, ভূগর্ভে জলতলে রেলওয়ে,

টেলিগ্রাফ। কয়লা লৌহ তাম্র হীরক স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থের খনি যেখানে যত ছিল সব বাহির হইয়া পড়িল। আকাশের গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য্য ছায়াপথস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড, তাহাদের গতি বিধি স্থিতি যাবতীয় ক্রিয়া এবং পৃথিবীর সঙ্গে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ নির্ণিত হইল। শরীরের সূক্ষ্ম টিশু এবং স্নায়ু হইতে অস্থি মাংস মেধ মজ্জা পর্য্যন্ত; এবং মনের যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি ও বৃত্তির বিজ্ঞান দর্শন দর্পণের ন্যায় রচিত হইল। এবং অগ্নি বায়ু জল বিদ্যুৎ গ্যাস ইথার প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ মানবের বশীভূত হইয়া গেল। অতঃপর তোমার স্বাধীন মানব জাতির আর বাকী কি থাকিবে? এই কি উন্নতির শেষ সীমা নয়? এই অত্যুন্নত সভ্য মানবজগতে পার্থিব মহাসুখের চরমাবস্থায় ষড়রিপুর কুভোগ্য এবং রাজস্বপ্রসূ মাদকাদি পঞ্চমকার অবশ্য পূর্ণমাত্রায় থাকিবে, বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা যত দূর পরিমার্জ্জিত সুবিধাজনক এবং সুখকর হইতে পারে তাহা হইবে; এখন ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর প্রচলিত রাজকীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় প্রভুত্বের শেষ গতি কোথায়? এ অবস্থায় আর কাহারো কিছু অভাব নাই, সমস্ত বিষয়ে কেবলই সুখ সুবিধা। কারণ, সকলেই ধনী জ্ঞানী সবল সুস্থ কর্ম্মদক্ষ। এই মহাভোগের চরম সীমায় যখন ঐ ভুবনবিজয়ী আদর্শ মানবজাতি সমুত্থিত হইবে তখন অবশ্য যাহা কিছু আশা পিপাসা সমস্ত নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং সৃষ্টিলীলার এই খানেই পরিসমাপ্তি। কিন্তু পাপ অধর্ম্ম এই অবস্থাতেও থাকিবে, কিছুই কমিবে না। ঈদৃশ স্বাধীনতা কি মৃত্যুর কারণ নহে? ভাষা, ধর্ম্ম, গায়ের রং সামাজিক রীতি এক হইলেও পরস্পরে কি বিবাদ করিবে না? স্বজাতি সমধর্ম্মী স্বগোত্র, জ্ঞাতিবর্গ কেন ঘরে ঘরে কাটাকাটি করিয়া মরে?

জীব অবাক হইয়া ব্রহ্মবাক্যের গভীর অর্থ কথঞ্চিত অবধারণ করত শেষ হাসিয়া বলিলেন, "প্রভো! এই খানেই উহার শেষ বটে। এ প্রকার জাতীয় স্বাধীনতা এক দিকে মায়ামরীচিবৎ, অপর দিকে জীবশিক্ষা ও তোমার বিশ্বপরিবার নির্ম্মাণের উহা একটী সাময়িক উপায় মাত্র। আচ্ছা, ইহা অপেক্ষা আরো কি মানুষের উন্নতি আছে? যদি থাকে, তাহার পন্থা কি, ভোগ্য উপকরণ কি?"

ব্রহ্ম। আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞান প্রেম পবিত্রতার অনন্ত উন্নতি আছে তাহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পার্থিব জ্ঞান সভ্যতা উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। তদ্ভিন্ন মনুষ্যের আর এত মাহাত্ম্য কিসে? তাহারা ছলে বলে কৌশলে ইহকালের কয়টা বৎসর অপরকে ফাঁকি দিয়া নিজের সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য আসে নাই। ভাবীবংশকে পার্থিব সুখ সম্পদের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়া আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় রাখাও তাহাদের পারলৌকিক কৃতার্থতা নহে। অসৎ যাহা কিছু সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে, যাহা সৎ তাহাই ইহ পরলোকের সম্বল। এই যে অনন্ত উন্নতি, আমিই তাহার পন্থা, আমিই গম্য, এবং নিত্য উপভোগ্য উপকরণ। মানবাত্মা ভৌতিক দেহে বদ্ধ নহে, পার্থিব রাজ্যভোগেও সে জীবিত থাকে না, এ পৃথিবীও তাহার রাজ্য নহে। আমাতে সে চিরজীবিত থাকিয়া চির দিন উন্নত হইবে ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মবাণী নীরব হইল। তখন জীব বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিলেন এবং নিজ অভ্যন্তরে অনন্ত আশাপথ অবলোকনপূর্ব্বক ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরে কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন, "ঠাকুর, জাতীয় কর্তৃত্ব এবং রাজ্যশাসনের যে স্বর্গীয় উদ্দেশ্য এবং চরম আদর্শের কথা তুমি বলিলে, এ দিকে যাহাদের দৃষ্টি নাই তাহারা রাজ্যভার লওয়া দূরের কথা, নিজের ও পরিবারের ভার লইবারও অনুপযুক্ত। পৃথিবীতে ধনবলসম্পন্ন সভ্য দেশ, জাতীয় একতা এবং রাজকীয় স্বাধীনতা অনেকইত আছে; যদি আমরাও সেই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হই, তাহাতে কি দেশের দুঃখ দারিদ্র্য অহঙ্কার নীচতা, ছল চাতরী, দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের উৎপীড়ন, অবিচার একবারে চলিয়া যাইবে? কৈ স্বাধীন রাজ্যে সভ্যসমাজে, তাহাত যায় নাই? তাহাদের কর্ত্তৃক নরহত্যা, রক্তপাত, যুদ্ধ বিবাদ, লুণ্ঠন, পরপীড়নের ফল শেষ কেবল কতকগুলি প্রধান লোকের ভোগ সুখ এবং পশুবল বৃদ্ধিতে পরিসমাপ্তি। এরূপ যাহার পরিণাম এবং যদ্দ্বারা আমার আত্মা বিনষ্ট হইবে, এবং যাহাতে আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব? স্বদেশ

স্বজাতি স্বধর্ম্মী মানে কি স্বার্থপরের দল? জ্ঞানে ভাবে ইচ্ছায় যে একাত্মতা সেই অবস্থাকে প্রকৃত স্বজাতিত্ব বলা যাইতে পারে। "আমরা স্বাধীন জাতি" "আমাদের দেশ স্বাধীন দেশ" এই শব্দ পরাধীন এবং বিজাতির অত্যাচারে উৎপীড়িত অবস্থায় অতি শ্রুতিমধুর গৌরবাস্পদ হইলেও সে স্বাধীনতা ও স্বজাতীয় কর্ত্তৃত্বের শাসন নরকের দ্বার স্বরূপ। যত ক্ষণ দৈন্যাবস্থা ততক্ষণ সাম্যবাদ, একটু উচ্চ পদে উঠিলেই প্রধানতন্ত্র; পৃথিবীর রাজ্যশাসনের এই মূল মন্ত্র। এখন আমি পরিষ্কার বুঝিলাম, রাজ্যোদ্ধার, দেশোদ্ধার স্বায়ত্ব শাসন পাপের আবরণ, মায়ার ভ্রম; আত্মোদ্ধার আত্মশাসন এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্ভোগ আর জীবসেবা, ইহাই পরম প্রার্থনীয়।

জ্ঞানযোগ—২০শ অধ্যায়।

মুক্তি ও অমরত্ব।

জ্ঞানযোগের বিবিধ তত্ত্ব শিক্ষার পর পরিশেষে জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পরমাত্মন্! মুক্তির অর্থ কি একবারে লয় প্রাপ্তি এবং জন্মরহিত অভাবত্মক একটী বিষয়?

ব্রহ্ম। যাহাতে মদীয় ইচ্ছাবিরোধী স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা বিনষ্ট হয় তাহাই মুক্তি। জীবন্মুক্তির কথা অবশ্য শুনিয়াছ। ধ্বংস হইয়া গেলে মুক্তি আর কাহার হইবে? বদ্ধ আর মুক্ত দুইটী কথা এক সঙ্গে মিলাইয়া দেখ, আপনিই সব বুঝিতে পারিবে।

জীব। ইহকালে সশরীরে বিবিধ প্রকার বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া জীবন্মুক্তি কি রূপে সম্ভব হইবে? যত দিন দেহ আছে, তত দিন তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ শীতোষ্ণ, রোগযন্ত্রণা ও বেদনার অনুভূতি থাকিবেই থাকিবে। এই জন্যই বোধ হয় লয় প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম। এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম তাই বটে ; কিন্তু সে কেবল বুদ্ধির আনুমানিক সিদ্ধান্ত। মুক্তি অনুভবের জন্য সাধকের সজ্ঞানে সহৃদয়ে জীবিত থাকা প্রয়োজন। দুঃখনিবৃত্তিকেও মুক্তি বলা যায় না। কারণ, দুঃখাভাব কি রোগমুক্ত, জীবনে অনেক সময়ই ঘটে ; তাহাকে কি মুক্তির অবস্থা বলিবে ? মুক্তি অভাবাত্মক কথা নহে, একটী সত্য অবস্থা। ইহা অস্তিত্বের বিলয়ও নহে, অনন্ত জীবনের আরম্ভ। ইহারও ক্রমোন্নতি আছে। আমার অভিমুখে যে নিরন্তর গতি, যে অবস্থায় তুমি বিমুক্তবন্ধ হইয়া আমার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইবে, তাহাকেই মুক্তজীবন বলিয়া জানিবে।

জীব। তবে ইহাও ত এক প্রকার সংগ্রামের অবস্থা। অন্যান্য বদ্ধ জীবনের সহিত তবে ইহার আর প্রভেদ কি রহিল ? জীবনসংগ্রামের কি কোন কালে নিবৃত্তি নাই ?

ব্রহ্ম। সংগ্রামই যখন জীবন বলিয়াছি তখন নিবৃত্তি কেন হইবে ? কিন্তু মুক্তি জয়যুক্ত সংগ্রাম, তাহাতে পরাজয় নাই, কেবলই অগ্রসর, আর জয় লাভ। বাসনার নির্ব্বাণে কদাপি জ্ঞান ভক্তির ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় না। স্রোতস্বতীর গতির কি বিরাম হইতে পারে ? মুক্ত জীবনের প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। পর্ব্বত পাহাড় পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়। যতই প্রতিবন্ধক ততই তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন ভীম পরাক্রম। মহাবীর সেনা-পতি যেমন বিপক্ষের সুদৃঢ় সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া রণরঙ্গে মাতিয়া বিদ্যুতের গতিতে প্রধাবিত হয় তদ্রূপ সে জীবন। এখানে প্রলোভন প্রতিবন্ধক কেবল তাহার স্বর্গীয় বল প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র। বদ্ধ জীবের সহিত মুক্ত জীবগণের গভীর প্রভেদ। মুক্তজীবনের গতি অধোদিকে কখন প্রধাবিত হয় না, তাহা কেবল ঊর্দ্ধদিকেই যায়। বদ্ধ জীবের গতি কেবল নরকাবর্ত্তের দিকে। যখন যখন সেই আবর্ত্তের বিঘূর্ণিত তরঙ্গ তুফানে পড়িয়া সে নিমগ্ন প্রায় হয় তখন এক একবার হস্ত পদ সঞ্চালন করে, কিন্তু তদ্দ্বারা জীবনের গতি ফিরাইতে পারে না ; পুনঃপুনঃ কেবল লাঞ্ছিত এবং বিড়ম্বিত হয়। তাহার স্বাধীনতার মুক্ত ভাব কেবল বিনাশের কারণ। মুক্তির আর এক অর্থ বন্ধন, অর্থাৎ আমার সর্ব্বাঙ্গীন অধীনতার দাসত্ব। সুপুত্র যেমন পিতার,

সতী স্ত্রী যেমন সৎপতির পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে, অথচ তাহাতেই তাহাদের পরমানন্দ; মুক্তিপথের পথিক সেই রূপ আমার ইঙ্গিতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে; কিন্তু আমার অধীনতা এবং দাসত্বেই তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ। সে নির্লিপ্ত ভাবে ব্রহ্মসহবাসকবচে আবৃত হইয়া এই পাপ প্রলোভনপূর্ণ সংসারের কুটিল চক্র ভেদ করিয়া নির্ভয়ে চলিয়া যায়, কোন অবস্থা তাহার চিত্তবিকার জন্মাইতে পারে না। পাপেচ্ছার মুখ বন্ধ করিতে পারিলেই সমস্ত জগৎ আমার আবির্ভাবে স্বর্গ তুল্য হইয়া পড়ে। এই স্বর্গ এবং নরক মানবাত্মার আভ্যন্তরীণ একটী অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুক্তিও অন্তরে, বাহিরে নহে।

জীব বলিলেন, "বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া যদি মুক্ত জীবনের স্রোত নিরন্তর তোমার অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং বন্ধন যদি মুক্তির আনুসঙ্গিক একটী অবস্থা হইল, তবে দেহ বিনাশের পর সে বদ্ধভাবত কিছু থাকিবে না। যে অবস্থায় শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক, ক্ষুধা পিপাসা ইত্যাদি দ্বন্দ্ব কিছুই নাই সেই মৃত্যুর অবস্থা কি শান্তিপ্রদ নহে?

ব্রহ্ম। অমৃতের পুত্র অমরাত্মার মৃত্যু নাই। মৃত্যুজনিত শান্তি প্রস্তর মৃত্তিকার শান্তি, তাহার ভোক্তা কেহ নাই; মুক্তাত্মা মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করিয়া অনন্ত কাল অমরলোকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

জীব। অশরীরী আত্মার স্থান কালের অতীত অবস্থায় অগ্রসরের অর্থ কিছু বুঝিতে পারি না। আমার দৃষ্টি মৃত্যু পার হইয়া আর অগ্রসর হয় না। ঈদৃশ মুক্তির প্রার্থীই বা কয় জন?

ব্রহ্ম। ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেই মুক্তির জন্য লালায়িত। সংসারবন্ধনে চির দিন বদ্ধ থাকিতে তাহারা চায় না। তীর্থযাত্রীদিগের এ জন্য কতই ব্যাকুলতা! দেশকালে বদ্ধ তোমার পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা ইহার মর্ম্ম তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না। দেহে অবস্থিতি কালে পাপ ছাড়িবার জন্য যেমন, নব জীবনে সৎবৃত্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তেমনি সংগ্রামের আবশ্যকতা আছে। আমি জীবের পূর্ণ আদর্শ, আমার দেবগুণ উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে আশা ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা এবং চেষ্টা যত্ন চিরকালই করিতে হইবে। কিন্তু অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে জীবাত্মার এই যে গতি, ইহা চিরচঞ্চল

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল স্রোতস্বিনীর তরঙ্গমালার ন্যায় নহে। জ্ঞানের যতই কেন বিকাশ এবং আত্মার যতই কেন উন্নতি হউক না, আদি অন্ত মধ্যে আমি সাধকের বিশ্বাসগত নিত্য অভ্রান্ত অপরিবর্ত্তনীয় সত্যাশ্রয়। উন্নতির সোপান পরম্পরায় যদিও সে আমার অব্যক্ত সত্তা এবং ব্যক্তলীলার বিচিত্র বিভূতির অনেক পরিচয় ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু স্বরূপতঃ আমি যে এক আশ্চর্য্য রহস্য, অনন্ত মঙ্গল, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ পবিত্র, নিত্য, অখণ্ড, ইহার আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

তদনন্তর পরম পুরুষ নিত্য পরব্রহ্ম স্বর্গীয় বাগ্মিতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ বিষয়ে আরো গভীররূপে অনুধ্যান কর। তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম, জ্ঞানপিপাসা এবং আশা তাহা শরীরের ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তাহা শরীরের সঙ্গে অন্তর্দ্ধান বা শেষও হইবে না। দেহভঙ্গের পরবর্ত্তী সময়ের নাম পরকাল। উহা একটী অবস্থা মাত্র। আমি যদি তোমার প্রেমিক পিতা হই, তবে তাহা নিত্য কালের জন্য জানিবে। এখন যদি তুমি আমাতে জীবিত আছ ইহা সত্য হয়, তবে জানিও ইহা অনন্ত কালের সত্য। আমি নিত্য অনন্ত, আমার সঙ্গে জীবাত্মার যে সকল মধুর পবিত্র সম্বন্ধানুভূতি দৈহিক জীবনে আরম্ভ হয় তাহাও নিত্য অনন্ত। অজ্ঞানে সজ্ঞানে সে আমারই। যখন তাহার বিশ্বাস ভক্তি দিব্যজ্ঞানামৃতে অভিষিক্ত হইবে তখন সে বলিবে, "আমিও তোমার, তুমিও আমার।" ইহাই অমরত্ব, মুক্ত জীবগণ ইহপর-লোকে ইহা সম্ভোগ করেন।"

জীবানন্দ ব্রহ্মবাণীর গভীর অর্থ ভাবিতে ভাবিতে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমার মুখে মুক্তি এবং পরলোকের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আচ্ছা, যাহারা আমাদের নয়নের পুতুল, কণ্ঠের হার স্বরূপ, দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ফুরাইয়া যাইবে? পরকালে গিয়া আর কি পরস্পরে দেখা শুনা হইবে না?"

ব্রহ্ম। কাহাকে তোমরা ভাল বাস? শরীরকে, না আত্মাকে? শরীরের সাহায্যে যদি আত্মীয় প্রিয়জনের আত্মাকে না ভালবাসিতে পার, তাহা হইলে

বিদেহ অবস্থায় কাহার সহিত মিলিবে? এখানকার ও সব ভালবাসার মধ্যে শারীরিক মোহই অনেক, সুতরাং তাহা শরীরের সহিত ধ্বংস হইয়া যায়।

জীব। তাহা সত্য। মৃত শরীরকেত আমরা জলে অনলে মৃত্তিকায় বিসর্জ্জন দিয়া থাকি, আত্মিক চরিত্রের জন্যই অবশ্য তাহাকে ভালবাসি।

ব্রহ্ম। শরীর ধ্বংসের পরও সে ভালবাসা যদি আত্মার প্রতি থাকে, এবং জীবিত কালে যদি সেই আধ্যাত্মিক প্রেমমিলন সাধন করিয়া থাক, তাহা চিরকালই আছে জানিও। তদ্ভিন্ন শোকার্ত্তের সান্ত্বনা জন্য সশরীরে পুনর্ম্মিলনের আশা দেওয়া বৃথা। দৈহিক প্রেম, দৈহিক শোক দেহ অদৃশ্য হইলে ক্রমে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যায়।

জীব। তবে কি পরলোকে পুনরায় পতি পুত্র, স্বামী ভ্রাতা, স্ত্রী ভগ্নী পিতা মাতার সঙ্গে আর দেখা শুনা হইবে না?

ব্রহ্ম। যখন তোমার ও তাহাদের শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন কে কাহার সহিত দেখা শুনা করিবে? আধ্যাত্মিক মিলন হইবে। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেশকালেবদ্ধ দেহের ভিতর দিয়া আত্মীয়-দিগকে দেখিতে, দেহান্তে অব্যবধানে যখন তখন প্রেমচক্ষে তাহাদিগকে আমার যোগে আত্মস্থ দেখিতে পাইবে।

জ্ঞানযোগ—২১শ অধ্যায়।

—০ঃ—ঃ০—

পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি।

শ্রীমান্ চিদানন্দ ব্রহ্মগীতোক্ত জ্ঞানযোগের বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিষয়গুলির আদ্যোপান্ত সমুদায় আলোচনাপূর্ব্বক বিপুল চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। অনন্তর অতীব ব্যগ্রতা সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, আমি এত ক্ষণ যাহা কিছু আপনার নিকট শিক্ষা পাইলাম সমস্ত গুলিই অতি-শয় সারগর্ভ, প্রত্যেকটীর ব্যাখ্যা আমার নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হইল।

এ সকল তত্ত্ব এক দিকে যেমন যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞানসঙ্গত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী ভক্তিরসাত্মক। ইহাতে বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়ই সম্যক চরিতার্থতা লাভ করে। মানবসমাজ এক্ষণে যে বিশুদ্ধ উন্নত জ্ঞানের অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, ঠিক তাহার উপযোগী সর্ব্ববাদীসম্মত তত্ত্ববিদ্যা লোকগুরু ভগবান শ্রীজীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এতাধিক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তৃত মহাজ্ঞান সবতো আমি মনে রাখিতে পারিব না, ইহার ঘনীভূত সার ও চরম ফল জীবনে যাহাতে পরিণত হয়, প্রতি সময়ে, সকল অবস্থাতে যাহাতে আমি তাহা সম্ভোগ করিতে পারি এমন সদুপায় আমাকে বলিয়া দিন। যাহা আমার প্রার্থনীয় এবং প্রাপ্য তাহা পাইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি; কি কি লক্ষণ দ্বারা আমি এইটী বুঝিতে পারিব? অপূর্ণমনোরথ নিরাশ অকৃতার্থের ন্যায় বদ্ধভাবের মধ্যে মুহ্যমান হইয়া না থাকি, অথচ কল্পিত আনন্দ শান্তিতে আত্মপ্রতারিতও না হই, ইহাই এখন আমার একান্ত প্রার্থনা। কোন রূপ বাহ্যিক কিংবা দেহেন্দ্রিয় ঘটিত উল্লাস প্রমত্ততার সহিত ব্রহ্মানন্দের তুলনা হয় না। যদিও পার্থিব উপাদেয় প্রীতিকর ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে অনেক সময় তাহার উপমা দিয়া ভাবরস চরিতার্থ করি, কিন্তু এমন কোন নিত্য সুখকর অবস্থা নাই যাহার সঙ্গে ঠিক ভাবে ব্রহ্মানন্দের উপমা হয়। ঈদৃশ অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক যোগ-জীবনের নিত্য শান্তির লক্ষণ যত দূর ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে তাহা আমায় বলুন, আমি জীবনে তাহা বার বার মিলাইয়া দেখিব; এবং যত ক্ষণ না মিলিবে তত ক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকিব না।”

সুবিজ্ঞ সিদ্ধাত্মা সদানন্দ বলিলেন, জীব আপনার চরম ধর্ম্ম বা পরমপুরুষার্থ সিদ্ধির বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান সচ্চিদানন্দ হরি তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন;—“সবিশেষ খণ্ডজ্ঞানের চরম ফলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ অভেদ এবং নিত্যজ্ঞানে জাগ্রত থাকিয়া নির্ব্বিকার শান্তি অর্থাৎ কেবল আমাতে সন্তোষ লাভ ও পূর্ণকাম হওয়াই পরম পুরুষার্থ। তুমি আমাকে একমাত্র স্পৃহনীয় জানিয়া যখন চির উন্নতির সহিত নিত্য তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে থাকিবে তখনই কৃতার্থ হইতে পারিবে। অতএব তুমি আমার সুখে সুখী, আমার ধনে ধনী এবং আমার

জ্ঞানে জ্ঞানী হও, অন্য বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সজ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ আমাতে অবস্থিতি কর।”

জীব। সে অবস্থা কি তাহারত আমার কোন ধারণা নাই। বাহ্য জগতে দৈহিক ইন্দ্রিয়, সামাজিক সম্বন্ধ এবং মানসিক প্রবৃত্তি নিচয়ের চরিতার্থতা এবং ক্ষুধা নিদ্রাদির অভাব মোচন এবং স্বাস্থ্য সম্ভোগের উপর আমার যাবতীয় সুখ শান্তি আনন্দ এখন নির্ভর করিতেছে, দিনের পর দিন ক্রমাগত এই সকল বিচিত্র অনিত্য ঘটনাতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া আসিয়াছি, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া কেবল তোমাতে সর্ব্বক্ষণ সন্তোষ সম্ভোগ কিরূপ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। দেহ, পরিবার, সমাজ এবং বাহ্য জগতের ভিতর দিয়াই আমি এ যাবৎ তোমার প্রেম জ্ঞান ও কৃপাসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাহা দ্বারাই আমার সঙ্গে যে তোমার নানা প্রকার সুকোমল, সুমিষ্ট ও ন্যায় ব্যবহার তাহা বুঝিতে পারি; তদ্ব্যতীত আর কোন উপায়ে তাহা ত উপলব্ধি করিতে শিখি নাই।

ব্রহ্ম। আধ্যাত্মিক প্রেম ও যোগানন্দ এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানানন্দরস কি কখন পান কর নাই?

জীব। করিয়াছি বটে, কিন্তু বাহ্য প্রকৃতির অনুকূলতায়, মনোবৃত্তি এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ভিন্ন তাহা যে কখন ভোগ করিয়াছি, কিম্বা করিতে পারি তাহা ত বোধ হয় না। যখন স্নানান্তে স্নিগ্ধ এবং সুস্থ শরীরে একান্তে তোমার ভজন সাধনে নিযুক্ত হই, যে সময় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা এবং কোন পীড়াদির উৎপীড়ন বা বাসনা পিপাসা থাকে না; যেখানে চন্দ্রের বিমল কিরণ, মলয়ানিলের সুশীতল সুমন্দ হিল্লোল, নির্ম্মল প্রমুক্ত আকাশে পাখীর গান, ফুলের আঘ্রাণ, নদীর মৃদু কলধ্বনি, তৎকালে সেখানে যেমন তোমার ধ্যানে দর্শনে চিত্ত প্রসন্ন হয়, আত্মা শান্তি সম্ভোগ করে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আক্রান্ত গলদঘর্ম্ম ব্যাধিক্লিষ্ট শরীরে কোলাহলময় উত্তপ্ত স্থানে তেমন কিছুতেই হয় না। ইহাতেই বুঝিতে পারি শারীরিক স্বাস্থ্য এবং বাহ্য প্রকৃতির অনুকূলতা নিতান্ত প্রয়োজন। তপস্বী সাধকগণ সেই জন্যই শরীর সাধনপূর্ব্বক অরণ্য গিরিগুহা নদীতট আশ্রয় করেন। আমি চিত্তবিভ্রান্তকারী সংসারের সহস্র প্রকার বিকারের মধ্যে থাকিয়া তোমাতে

তবে কিরূপে নিত্য সন্তোষ লাভ করিব? দেহ থাকিতে তাহারতো কোন সম্ভাবনা দেখি না।

ব্রহ্ম। প্রাকৃতিক এবং শারীরিক অনুকূল অবস্থাসাপেক্ষ যে আধ্যাত্মিক আনন্দ সম্ভোগের কথা বলিলে সেটা সাধকের প্রথমাবস্থার লক্ষণ। অবশ্য তাহা সুলক্ষণ বটে। সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রকৃতিকে শারীরিক সুখের অনুকূল করিয়া দিয়াছি। কিন্তু নিরবলম্ব নিত্য শান্তি সে অবস্থায় সম্ভোগ হয় না। সাধন করিতে করিতে ক্রমে ঐকান্তিক ভক্তি প্রভাবে এবং যোগাকর্ষণে আমার সর্ব্বগত জীবন্ত বর্ত্তমানতার প্রতি তোমার এমনি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিবে যে, নিবিড় অন্ধকারময় অনন্ত শূন্য আকাশও তখন আনন্দের মহাসমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে। তদবস্থায় আমিই জীবের পরম শান্তি নিত্যানন্দ হইয়া তাহার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের ভিতর দিয়া প্রস্রবণের ন্যায় নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকি। তৎকালে বাহ্য প্রতিবন্ধক কিম্বা দৈহিক ক্লেশের অনুভবশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। এইরূপ আত্মানন্দ শান্তিময় মুক্ত জীবনকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানিবে। ইহা প্রাকৃতিক অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা এবং শারীরিক স্বাস্থ্য কিম্বা আরাম অসুস্থতার অতীত।

জীব। এরূপ স্বর্গীয় নিত্য শান্তিত সম্পূর্ণরূপে তোমারই কৃপার ফল। মানুষ এ জন্য কি কিছু করিতে পারে? দৈনিক জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সাহায্যে অন্তরস্থ জ্ঞানবীজের উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক সে কোন রূপে তোমার কিছু কিছু প্রিয় কার্য্য সাধন এবং ভজনা করিয়া পাপ হইতে দূরে দূরে সাবধানে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু সাধারণতঃ সাধক জীবন সকল তেমন সুখের হয় কৈ? সিদ্ধ অথচ সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় সরল প্রফুল্লাত্মা এ পৃথিবীতে অতি বিরল। যে সকল ধর্ম্মজীবন সচরাচর দেখি তন্মধ্যে অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ আনন্দময় দেবজীবন ত বড় একটা দেখিতে পাই না। তবে আমি কার মত হইব?

পরব্রহ্ম সদ্গুরু তদুত্তরে বলিলেন, "পুত্র, আমিই জীবের পূর্ণ আদর্শ। ভক্তসমাজে ও প্রতি জীবনে আংশিকভাবে তাহা দেখিতে পাইবে। যে বস্তু যত মহৎ উন্নতিশীল তাহার পূর্ণতা তত সময়সাপেক্ষ। সর্ব্বদা প্রত্যাদেশস্রোতে যে সকল মহাত্মার জীবন প্রবাহিত থাকিত তাঁহারা

বিয়োগ বিজ্ঞানের আলোচনায় এ মহোচ্চ অধিকার কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। জড়ের জড়ত্ব, চৈতন্যের নির্গুণ গতিশক্তি বিজ্ঞানীর চক্ষের আবরণ স্বরূপ। আত্মজ্ঞান পরম জ্ঞান, তন্মধ্যে জ্ঞানময়ের নিত্য বাস; তাঁহাকে লইয়া সেই স্থান হইতে জ্ঞানরাজ্য পরিভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। চক্ষু, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, কর্ণ নাসিকা মস্তিষ্ক, বুদ্ধি যুক্তিকে জ্ঞান লাভের এক মাত্র উপায় মনে করিও না। সহজজ্ঞান, বিবেক, ভক্তি, বিশ্বাস নির্ভর, আত্মজ্ঞান ভিন্ন পরম তত্ত্ব দিব্যজ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ নিজেই জীবের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করেন।"

"অতঃপর তুমি যে ব্রহ্মের সহিত শ্রীজীবের মানুষের মত ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ, সে কেবল তোমার অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ভক্তিযোগ বিভাগে আরো ঘনিষ্ঠতর মধুর সখ্য প্রেমের কথা শুনিতে পাইবে। এ যুগের লোকেরা শুষ্ক জ্ঞানবাদী, তাহারা পাছে স্বাধীনতা লোপ হয়, এই ভয়ে ভগবানের সঙ্গে মাখামাখি মিশামিশি এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধ ভালবাসে না; তাঁহা হইতে দূরে দূরে সাধারণের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চায়। ভগবানের সঙ্গে কেবল যেন ঐতিহাসিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। তুমি জ্ঞানযোগ আলোচনায় এখন যাঁহার গুণের পরিচয় পাইলে, ভক্তিতে তাঁহার সহিত নিকটতর মধুর সম্পর্ক অনুভব করিতে পারিবে। কুতর্ক, সংশয়, অবিশ্বাস ছাড়িয়া, এক্ষণে ভক্তিযোগ শিক্ষার্থ হৃদয়কে বিনম্র এবং সরল কর। দীন অকিঞ্চন শরণাগত আর্ত্ত জনকে ভগবান ভক্তবৎসল যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাহা অতীব সুমিষ্ট। মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃবক্ষস্থ শিশু জননীর নিকট সহজে যেরূপ চিরস্থায়ী শিক্ষা সংস্কার লাভ করে, অখিলমাতা ভগবতীর নিকট ভক্তের শিক্ষা তদ্রূপ। বিধাতা পুরুষ স্বয়ং জীবের হৃদয়পটে তাহার অজ্ঞাতসারে তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কিত করিয়া দেন। তিনি আপনিই জ্ঞান জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা।"

পরিশেষে বহুদর্শী শ্রীমদ্ সদানন্দস্বামী সংক্ষেপে স্বীয় তনয়কে এই কয়টী কথা বলিয়া জ্ঞানযোগ সমাপ্ত করিলেন। বলিলেন, "তিনটী মূল সত্যের উপর জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত;—ব্রহ্ম, জগৎ এবং জীবাত্মা। এই তিনের স্বভাব স্বরূপ, একের সহিত অপরের অকাট্য সম্বন্ধ, তিনের যোগাযোগের ফলাফল

যত জানিতে পারিবে ততই জ্ঞানী হইবে। কিন্তু জগদ্রূপে যাহা কিছু প্রকটি হইয়াছে তাহাই কেবল জগদীশ্বরের গুণ শক্তির সীমা নহে; তাহার অন্তরালে অনন্ত অব্যক্ত মহাতত্ত্ব রূপে বিভু বিশ্বনাথ বিরাজ করিতেছেন। স্থূলের সহিত সূক্ষ্ম, জড়ের সহিত চৈতন্য, সাকারের সহিত নিরাকার, বাহ্য ও অন্তর জগৎ এক সঙ্গে মিলিয়া তাঁহারই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছে। প্রাকৃতিক ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনা ও নিয়মরাজী, মন এবং অধ্যাত্ম জগতের বৃত্তিনিচয়ের ভিতর দিয়া তিনি নিয়ত জ্ঞান প্রচার করিতেছেন। [illegible] দেহাত্মার সহিত নিখিল জড় ও অধ্যাত্ম ব্রহ্মাণ্ডের যোগ আছে [illegible] সারভূত চরম ফল। প্রকৃতির সাহায্যে শম দম সাধনপূ[illegible] জীবাত্মা জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা করিয়া পরিণামে সে আত্মরাম হইবে ইহাই বি[illegible] বিধান।"

[জ্ঞানযোগ সমাপ্ত।]